দ্বারকা ও প্রভাসে

(শ্রীকৃষ্ণের যৌবন ও অন্তিমলীলার কথা এবং দ্বারকা,
বেট-দ্বারকা, প্রভাস ও সোমনাথের ভ্রমণকাহিনী)

শঙ্কু মহারাজ

আমার ভাই

শম্ভু

বিশু

ও

শিবু-কে

লেখকের কয়েকখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ :

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব)

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

রাজভূমি-রাজস্থান

পঞ্চবটী

লীলাভূমি-লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে

গঙ্গাসাগর

তমসার তীরে তীরে

মানালীর মালঞ্চে

অমরতীর্থ অমরনাথ

কুম্ভমেলায়

রূপতীর্থ-খাজুরাহো

ও

সুন্দরের অভিসারে

(সিকিম-হিমালয় অভিযান)

ভূমিকা

আমি একজন ভক্তিহীন অবৈষ্ণব। তবু কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করে সাত বছর বসে পাঁচখণ্ডে দু'খানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছি— 'মধু-বৃন্দাবনে' এবং 'দ্বারকা ও প্রভাসে'। কারণ পূজারী ও পাণ্ডাদের অবিশ্বাস্য গল্প বিশ্বাস না করেও আমি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করি। ভক্তরা যাঁকে বলেন ভগবান, আমি তাঁকে বলি পরমপুরুষ। ধার্মিকদের দৃষ্টিতে যিনি বিষ্ণু, আমার চোখে তিনি নারায়ণ। বৈষ্ণবের কাছে যিনি মানুষরূপী ভগবান, আমার কাছে তিনি ভগবানের মতো মানুষ এবং বিশ্ব-ইতিহাসের মহোত্তম মহামানব। তিনি ভারতীয় জীবনধারার উৎস, ভারতের আদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে পাঁচ বছর বসে তিনখানি খণ্ডে 'মধু-বৃন্দাবনে' রচনা করার পরেও মন ভরল না। মনে হল—যাঁর শৈশব ও বাল্যলীলা পাঠক-পাঠিকার এত প্রিয়, তাঁর যৌবন ও অন্তিমলীলাস্থল দর্শন করে সেই কথা ও কাহিনী আমার অবশ্যই কীর্তন করা উচিত। আর তা করতে পারলে আমি শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র মহাজীবনকে মোটামুটিভাবে ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে গ্রথিত করতে সক্ষম হব। তাই দ্বারকা ও প্রভাসে ছুটে গিয়েছি! ফিরে এসে দুটি বছর বসে 'মন-দ্বারকায়' ও 'পুণ্যতীর্থ-প্রভাসে' রচনা করেছি। এবারে সেই দু'খানি গ্রন্থ একখণ্ডে প্রকাশিত হল।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। 'মধু-বৃন্দাবনে' রচনায় আমি শ্রীমদ্‌ভাগবতের আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু 'দ্বারকা ও প্রভাসে' রচনার সময় মহাভারতকে অবলম্বন করেছি। কারণ দ্বারকার কৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সকল পুরাণের মধ্যে মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস।

তাই বলে 'দ্বারকা ও প্রভাসে' কিন্তু ইতিহাস নয়। যাঁরা তীর্থভ্রমণ করতে চান কিংবা ঐ দুটি তীর্থের কথা জানতে চান, তাঁদের

জন্যই এ ভ্রমণকাহিনী। তাঁদের ভাল লাগলেই আমার এ গ্রন্থ রচনা সার্থক হবে।

তাহলেও তরুণ ঐতিহাসিকদের আহ্বান করে বলি—আপনারা দ্বারকা ও প্রভাসের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে উদ্ধার করুন, শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের ওপরে আপনাদের গবেষণার আলোকপাত করুন। কারণ তাঁর জীবন আলোময় না হয়ে উঠলে আমাদের জীবনের আঁধার ঘুচবে না। ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং আদর্শ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কর্মময় মহাজীবনের অনুধ্যান আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অতএব ভাবীকালের সেই সব গবেষক ও আবিষ্কারকদের উদ্দেশে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আর আপনারা আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিনীত

লেখক

দ্বারকা

'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥'

উত্তম-অধম যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাকো না কেন, পরাভক্তির সঙ্গে পরমভাবকে হৃদয়ে রেখে আমার আশ্রয়ে এলে, আমার কৃপায় শাশ্বত এবং পরম-পদ লাভ করবে।

শঙ্করী হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল অহীন, পূর্ণিমা এবং শ্রী। সাত বছরের সেই সরল শিশুটি জানতেই পারল না যে, তার মামু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেল রাজভূমি-রাজস্থান থেকে।

ওরা পড়ে রইল আবু-রোডে, আমরা এগিয়ে চললাম মন-দ্বারকার পথে—দেবদুর্লভ দ্বারকা।

চলেছি কুশস্থলীতে কিন্তু তাকিয়ে রয়েছি আবু-রোডের দিকে। অথচ শঙ্করীদের মতো সে-ও গিয়েছে হারিয়ে, তার সঙ্গেও আমার দূরত্ব ক্রমেই চলেছে বেড়ে। জানি বিচ্ছেদকে মেনে নেবার মধ্যে বেদনা যতই থাক্, অবাস্তবতা নেই। তবু মন বাস্তব অবস্থাটি মেনে নিতে চাইছে না। কারণ মন মানুষের, কিন্তু মন যে বড় একটা মানুষের কথা শোনে না।

"আর ভেবে কি হবে বল? যা হবার তো হয়েই গেছে।"

দাদার কথায় মুখ ঘোরাই, ভেতরে তাকাই। দাদা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে সান্ত্বনার পরশ। একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয় দাদা আবার বললেন, "ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে মনটাকে শান্ত করে তোল।"

দাদা হয়তো ঠিকই বলেছেন। তিনি তো শুধু বয়সে প্রবীণ নন, বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ। তবু আমি তাঁর কথা মেনে নিতে পারি না। কেমন করে পারব? সেদিন পুষ্করে পূর্ণিমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যদি শ্রীকে ঐ রোদের মধ্যে সাবিত্রী পাহাড়ে না নিয়ে যেতাম, তাহলে হয়তো সে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ত না। আর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল বলেই তো তার মা পূর্ণিমার সঙ্গে মাসি শঙ্করীকেও পড়ে থাকতে হল আবু-রোডে। ওরা যেতে পারল না দেবভূমি-দ্বারকায়, দর্শন করতে পারল না রণছোড়জীকে।

অথচ ওরা কত আশা করেই না সেদিন হাওড়ায় গাড়িতে চড়ে বসেছিল। আমারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আজ একটি অবুঝ ও অসুস্থ শিশুকে নিয়ে দুজন যুবতীকে অজানা জায়গায় অপরিচিতদের মাঝে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পড়ে থাকতে হল। এতবড় মানসিক গ্লানিকে আমি কেমন করে মন থেকে মুছে ফেলব?

সরকারদা ও বৌদি পাশের খোপ থেকে উঠে এলেন আমাদের খোপে। আমরা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টু-টীয়ার কোচে ভ্রমণ করছি। মিটারগেজ রেল, গাড়িগুলো চওড়ায় কম। একটি খোপে দুটি লোয়ার ও দুটি আপার বার্থ। লোয়ার বার্থ দুটিব মাঝে কুণ্ডু স্পেশাল নিজেদের ষ্টীল-বেঞ্চ বিছিয়ে দিয়েছেন। ফলে নিচে তিনটি এবং ওপরে দুটি বার্থ নিয়ে একটি খোপ হয়েছে। প্রতি সীটে ডানলোপিলো বিছানা। বেশ আরামদায়ক শয্যা।

আমাদের খোপটি এক প্রান্তের দ্বিতীয়। এ প্রান্তের শেষ খোপটিতেই শঙ্করীরা ছিল। ওরা তিনজন নেমে যাবার পরে এখন সেটিতে ওদের পরিবারের মাত্র তিনজন রয়েছেন—মাসিমা, সেজদি ও বিউটি। মাসিমা মানে শঙ্করীর মা। সেজদি মানে মিসেস সাহা এবং শঙ্করীর সেজদি। আর বিউটি নিঃসন্তান মিষ্টার সাহার ষোড়শী ভাইঝি—বি. এ. পড়ে।

শঙ্করীরা নেমে যাবার পরেও মিঃ সাহা মানে গোরাচাঁদবাবু আমাদের খোপেই রয়ে গিয়েছেন। তবে সুরমাদি ও উমাদি চলে গিয়েছেন শঙ্করীদেব জায়গায়। আমাদের পরের খোপে রয়েছেন সত্যেনদা, তাঁর মা, অমিয়বাবু ও সরকারদারা।

এই রকম আটটি খোপ ও তিনটি বাথরুম নিয়ে আমাদের গাড়ি। চারটি খোপের পরে দরজা ও বাথরুম তারপরে আবার চারটি খোপ। শেষের খোপটি রান্না ও ষ্টাফের জন্য নির্দিষ্ট। বাকি সাতটি খোপে আমরা পঁয়ত্রিশজন ও শ্রী রওনা হয়েছিলাম আগ্রাফোর্ট থেকে। ভৌমিকবাবু নামে জনৈক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সস্ত্রীক তাঁকে নিয়ে সহকারী ম্যানেজার তপন জয়পুর থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েছে। শ্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় পূর্ণিমা ও শঙ্করী রয়ে গেল আবু-রোডে।

অর্থাৎ এখন আমরা একত্রিশ জন যাত্রী রয়েছি গাড়িতে।

অন্যান্য সহযাত্রীর কথা পরে বলা যাবে, আগে সরকারদা ও বৌদির কথা বলে নিই। সরকারদা মানে মোহিতকুমার সরকার ব্যবহারিক জীবনে একটি প্রেসের মালিক। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হলেও পাঁচের ঘরে পৌঁছতে এখনও বছর কয়েক বাকি। সরকারদা স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ও বন্ধুবৎসল, অমায়িক ও ভক্ত-বৈষ্ণব। তিনি কাঠিয়াবাবার শিষ্য। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক ও তিলকসেবা করেন। স্ত্রী শ্যামলী বৌদিও সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং ধর্মপরায়ণা।

বৌদি আমাকে বলেন, "ঘোষদা, আপনি পর্যটক। আপনিই তো সেদিন বলেছেন—পর্যটকের যাত্রাপথ বড়ই নিষ্ঠুর। এপথে কেউ কারও জন্য থেমে থাকতে পারে না।"

একটু হেসে জবাব দিই, "আমরা তো থেমে নেই বৌদি! পথের সাথীকে পথের পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছি।"

"তাহলে এমন মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছেন কেন?"

"বৌদি ঠিকই বলেছেন ঘোষদা!" সাহাবাবুও তাঁকে সমর্থন করেন। "আপনি এমন চুপ করে থাকলে, আমরাও যে মনমরা হয়ে পড়ি।"

সত্যই তো! সাহাবাবু যদি নিজেকে সকল দুর্ভাবনামুক্ত করে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারছি না? আমি তো ওদের কেউ নই, গাড়িতে পরিচয় হয়েছে। আর সাহাবাবু ওদের জামাইবাবু। তিনিই সস্ত্রীক, দুই শালী, শাশুড়ী, ভাইঝি ও শ্রীকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন। আজ তাদের তিনজনকে আবু-রোডে রেখে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।*

বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "না, মনমরা হবার কি আছে? পূর্ণিমা ও শঙ্করী দুজনেই শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। সঙ্গে অহীন রয়েছে। রয়েছেন আবু-রোড স্টেশনের দুজন বাঙালী কর্মী বিমলবাবু ও সরোজবাবু। সদ্যপরিচিত হলেও তাঁরা ওদের সব দায়িত্ব নিজেরা নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্তে তীর্থভ্রমণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।" অনেকটা আপন মনেই বলে যাই কথাগুলি, হয়তো বা নিজের মনের

সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

"তাহলে আপনি এমন গোমড়ামুখো হয়ে রয়েছেন কেন?" আমি থামতেই উমাদি অভিযোগ করেন। সরকারদাকে দেখেই বোধহয় উমাদি ও সুরমাদি আমাদের খোপে এসেছেন।

উমাদি মানে শ্রীমতী উমা মিত্র। বয়সে আমার চেয়ে হয়তো একটু বড়ই হবেন, কিন্তু বুঝবার উপায় নেই। বেশ ছিমছাম স্মার্ট চেহারা। বহু তীর্থভ্রমণ করেছেন। মনে হয় সংসারে তাঁর খুব আপনজন কেউ নেই এবং তিনি বিয়ে করেন নি। তাই বলে তাঁর দিন কাটাতে অসুবিধে হয় না কোন, তাঁর যে গোপাল রয়েছেন। সারাদিন তিনি তাঁকে মাতৃস্নেহে সেবা করেন -- সকালে গোপালকে ঘুম থেকে তোলা, তাঁর মুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—অনেক কাজ উমাদির। একটি পেতলের বাক্সে সেই গোপালমূর্তি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে। তাই অনেকে উমাদিকে 'গোপালদি' বলে ডাকেন। তিনিও সে-ডাকে সানন্দে সাড়া দেন।

শ্রীমান গোপালের প্রতি উমাদির এই পক্ষপাত আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করে নি। কারণ আমরা দু-বেলা গোপালের প্রসাদ পাচ্ছি এবং গোপালসেবার পরে উমাদি যে সামান্য সময়টুকু পাচ্ছেন, সেটুকু তিনি আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করছেন। তিনি অভিজ্ঞ তীর্থযাত্রী।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখেই বোধহয় উমাদি আবার বলেন, "সরকারদা বরং এক কাজ করুন।"

"কি?" জিজ্ঞেস করেন সরকারদা।

"আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় চলেছি। আপনি শ্রীকৃষ্ণের মহা-জীবনের কিছু কথা বলুন—দ্বারকার কৃষ্ণের কথা।"

"উত্তম প্রস্তাব।" দাদা সমর্থন করেন উমাদিকে। বিউটি, সেজদি, কল্পনাদি ও সত্যেনদাকে ডাক দেন তিনি। বলেন, "এখানে কৃষ্ণ-কথা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

বিউটি এসে আমার পাশে বসতে চায়। দাদা বলেন, "না। মামুর কাছে নয়, আমার পাশে এসে বসো।"

নাতনীর প্রতি সত্তর বছরের দাছুর এই রসিকতায় আমরা সবাই হেসে উঠি।

সরকারদা শুরু করেন, "আপনারা জানেন মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণে কৃষ্ণ-কথা রয়েছে। তবে আঠারোখানি পুরাণের প্রত্যেকটিতে কৃষ্ণ-কথা নেই, আছে নয়খানিতে।"

"যেমন ?" কল্পনাদি প্রশ্ন করেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু-পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ ও কূর্মপুরাণ। কিন্তু আমরা আজ পুরাণের কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করব না।"

"কেন ?"

"আমরা দ্বারকায় চলেছি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা ও কুরুক্ষেত্র-লীলা একই সময়ে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে মহাভারত থাকতে আমরা কেন পুরাণের আশ্রয় নেব ? মহাভারত পুরাণের চেয়ে শুধু প্রাচীনতর নয়, অনেক বেশি মৌলিক। ইতিহাস হিসেবে মহাভারতের স্থান পুরাণের ওপরে। সুতরাং আসুন, মহাভারতের কৃষ্ণ-কথাই আলোচনা করা যাক্।"

"বেশ। শুরু করুন।"

"কিন্তু আমি বৈষ্ণব, সুতরাং শুরুতে আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি কথা বলে নিতে হবে।"

"বলুন।"

"শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবন তিনটি লীলায় বিভক্ত—ব্রজলীলা, মথুরা-লীলা ও দ্বারকালীলা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই লীলাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। দশম স্কন্ধে মোট নব্বুইটি অধ্যায়। প্রথম চার অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর পাপ-মোচনের জন্য মথুরার কারাকক্ষে কৃষ্ণের জন্ম। পঞ্চম থেকে উনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা। চল্লিশ অধ্যায়ে যমুনার জলে অক্রূরের স্তুতি। একচল্লিশ থেকে একান্ন অধ্যায় পর্যন্ত মথুরালীলা। আর বাহান্ন থেকে নব্বুই অর্থাৎ শেষ উনচল্লিশ অধ্যায়ে দ্বারকালীলা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন—বৃন্দাবনে কেবলা রতি আর মথুরা ও

দ্বারকায় ঐশ্বর্যমিশ্রা রতি।"

"রতি কাকে বলে দাদা?" সাহাবাবু প্রশ্ন করেন।

"সংক্ষেপে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগ।" সাহাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সরকারদা একবার থামেন। তারপর আবার বলতে থাকেন, "বৃন্দাবনেও ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু সেখানে মাধুর্যই প্রধান। মথুরায় ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য সমান সমান। আর দ্বারকায় ঐশ্বর্য প্রধান। ঐশ্বর্য মাধুর্যকে ঢেকে রাখে বলে ভক্ত-বৈষ্ণবদের কাছে বৃন্দাবনের স্থান দ্বারকার ওপরে। তাহলেও আমরা যেহেতু দ্বারকায় চলেছি, আমাদের কাছে দ্বারকা এখন মন-দ্বারকা।

"আপনারা জানেন, কংসকে বধ করার পরে তাঁর শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ-বলরামের হাতে সতেরো বার পরাজিত হবার পরেও তাঁর প্রতিহিংসা শান্ত হয় না। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণের প্রতীক্ষা করছেন, তখন অতর্কিতে কালযবন নামে এক দুর্দান্ত মহাবীর নারদের পরামর্শে মথুরা আক্রমণ করলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, এখন যদি জরাসন্ধ কালযবনের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে যাদবদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি সমুদ্রের মধ্যে এক সুরক্ষিত পুরী নির্মাণ করে আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুরীই দ্বারকাপুরী, আমরা এখন সেখানেই চলেছি।"

"যাদবদের দ্বারকায় পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে কালযবনকে বধ করেন। কিন্তু তারপরেই জরাসন্ধ অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করলেন। স্বজনহীন কৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত না হয়ে বলরামকে নিয়ে দ্বারকায় পালিয়ে এলেন। রণ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রণছোড়জীরূপে পূজিত।"

"ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের দুটি রূপ—নন্দনন্দন ও বাসুদেব, গোপ এবং যাদব। বৃন্দাবনে যিনি বেণুকর নটবর, মথুরা ও দ্বারকায় তিনিই যাদব। তবে দ্বারকালীলায় দন্তবক্র-বধের পরে কৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজে এসেছিলেন। তখন তিনি আবার গোপেন্দ্রনন্দন।

"আপনারা জানেন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বৈশ্য, জাতিতে গোয়ালা। গো গোপ গোপী গোষ্ঠ গোকুল ও গোবর্ধন তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ব্রজের বাইরে তিনি ক্ষত্রিয়। সেখানে তাঁর ক্ষত্রিয় বেশ এবং আবেশ। রাজা-রাজা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, আদেশ-নির্দেশ, কর্তব্য-দায়িত্ব, রক্ষণ এবং পালনই তাঁর নিত্যকার্য। সেই পাণ্ডবপ্রিয়, মহিষীপ্রিয় এবং যাদবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় চলেছি আমরা। ব্রজনাথ নয়, যদুনাথের দ্বারকায়।"

"ভাগবতের মতে কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারকালীলাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। কারণ রাসলীলার মতো সেখানেও নাকি তাঁর ষোড়শসহস্র গৃহাশ্রম। রাস-রজনীতে যেমন যত গোপী তত গোবিন্দ, তেমনি দ্বারকারও ষোল হাজার গৃহে যত প্রেয়সী তত দয়িত। ব্রজের মতো দ্বারকায়ও যিনিই তাঁকে আত্মদান করেছেন, তাঁকেই তিনি নিজজন করে নিয়ে কৃতার্থ করেছেন। এখানেও সেই বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ।"

একবার থামেন সরকারদা। মেহসানা প্যাসেঞ্জার ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে। সেখান থেকে আমরা দ্বারকার ট্রেন পাবো। আমরা এখন সেই মন-দ্বারকার কৃষ্ণকথা শুনছি।

সরকারদা আবার আরম্ভ করেন, "আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব, সুতরাং আমার কাছে শ্রীমদ্ভাগবত পবিত্রতম পুঁথি। কিন্তু একটু আগেই আমি বলেছি যে, ইতিহাস হিসেবে মহাভারতের স্থান ভাগবতের ওপরে। আর যেহেতু আমরা এখন দ্বারকায় চলেছি, সেইহেতু আমি এখন মহাভারতের কৃষ্ণ-কথা বলব।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলে চলেন, "মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ-যোগ্যভাবে প্রথম দেখতে পাই আদিপর্বের একশো ছিয়াশী অধ্যায়ে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায়। দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ শকুনি অশ্বত্থামা জয়দ্রথ চিত্রাঙ্গদ শিশুপাল ও জরাসন্ধ প্রভৃতি তৎকালীন ভারতবর্ষের [illegible] নরপতিরা লক্ষ্যভেদ করবার জন্য সেখানে উপস্থিত [illegible] [illegible] অক্রূর উদ্ধব শম্ভু ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে নিয়ে বলরামের [illegible] দ্বারকা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য,

তিনি লক্ষ্যভেদ করবার জন্য যান নি, গিয়েছিলেন দর্শক হিসেবে, যেমন সেদিন সেই দ্রুপদ রাজসভায় সমবেত হয়েছিলেন অসংখ্য দৈত্য দেবর্ষি ঋষি গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ। কিন্তু আমার ধারণা, শ্রীকৃষ্ণের সেখানে যাবার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল।"

"কি ?" সরকারদা থামতেই উমাদি জিজ্ঞেস করেন।

সরকারদা জবাব দেন, "জতুগৃহদাহের পর থেকে তিনি পাণ্ডবদের খবর পাচ্ছিলেন না অথচ কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা পুড়ে মরেন নি। তিনি জানতেন, পাণ্ডবরা যখানে যেভাবেই থাকুন, তাঁরা স্বয়ংবর-সভায় নিশ্চয়ই আসবেন। তাই কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য দেখে অভ্যাগতরা যখন কন্দর্পবাণে নিপীড়িত, কৃষ্ণ তখন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মাঝে পঞ্চপাণ্ডবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণবেশী ভস্মাবৃত পাণ্ডবদের চিনতে তাঁর কোন অসুবিধে হল না। তবে তিনি সেকথা শুধু বলরামকে জানালেন।"

"তারপরেই আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাই মধ্যস্থ রূপে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরে তাঁরই মধ্যস্থতায় উপস্থিত নৃপতিমণ্ডলীর সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধবিরতি ঘটল। তিনি পাণ্ডবদের দেখিয়ে বললেন— ভূপালবৃন্দ! এঁরাই ধর্মত রাজকুমারীকে লাভ করেছেন। তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই।

"রাজারা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ উপেক্ষা করলেন না। তাঁরা সংগ্রামে বিরত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।"

থামলেন সরকারদা। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই তিনি আবার শুরু করলেন, "যুদ্ধ থেমে যাবার পরে পাণ্ডবরা বিজয় গৌরবে ভার্গব-কর্মশালায় মায়ের কাছে ফিরে এলেন। মা তখন ঘরের ভেতরে ছিলেন। ভীমার্জুন বাইরে থেকে বললেন—মা আজ এক রমণীয় জিনিস ভিক্ষা পেয়েছি।"

"মা দ্রৌপদীকে না দেখেই ভেতর থেকেই উত্তর দিলেন—যা পেয়েছ, সকলে সমবেত হয়ে ভোগ কর। তারপরেই তিনি বাইরে বেরিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—এখন একটা উপায় কর, যাতে আমার কথাও মিথ্যে না হয়,

আবার দ্রুপদকুমারীও কষ্ট না পায়।

"যুধিষ্ঠির তখন অর্জনকে বললেন—যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু। তুমি তাকে বিয়ে কর।

"অর্জন আপত্তি করলেন আপনি ও মেজদা অবিবাহিত থাকতে আমি কেমন করে বিয়ে কবব ?

"তখন যুধিষ্ঠির বললেন—তাহলে তো মায়ের আদেশই রক্ষা করতে হয়, পাঞ্চালীকে আমাদেব সকলেরই সহধর্মিণী হতে হয়।

"এই সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলরাম ও কৃষ্ণ ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিবকে প্রণাম করে আত্মপরিচয় দিলেন। রাম-কৃষ্ণেব সঙ্গে মিলিত হতে পরে পাণ্ডবরা পুলকিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন---আমরা যে এখানে গোপনে বাস করছি, তা তোমরা জানতে পারলে কেমন করে ?

"বাসুদেব সহাস্যে উত্তর দিলেন—আগুন ছাইচাপা থাকলেও তার উত্তাপ পাওয়া যায়। অর্জন ছাড়া যে আর কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পাবে না এবং পাণ্ডবরা ছাড় যে আর কেউ সমবেত নৃপমণ্ডলীর সঙ্গে ওভাবে যুদ্ধ করতে পারে না, তা বুঝবার জন্য খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যাক্‌গে, আপনারা যে সেই ভয়ঙ্কর আগুনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন এবং দুযোধনেব দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হয় নি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

"তারপরে রাম-কৃষ্ণ পিসীমা কুন্তীদেবীকে প্রণাম করে দ্বারকার পথে রওনা হলেন। অর্থাৎ দ্রৌপদীর বিয়ের সময় কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এই অনুপস্থিতি অকারণে নয়। কৃষ্ণ চান নি যে, পাণ্ডবরা ভিখারীর বেশে রাজকন্যা দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি দ্বারকায় ফিরে গিয়ে পাণ্ডবদের প্রচুর উপহার পাঠিয়ে দিলেন।"

"কি কি পাঠালেন ?" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞাসা করে।

"সে অনেক কিছু।"

"যেমন ?"

"বিচিত্র বৈদুর্যমণি, স্বর্ণালঙ্কার, নানাদেশীয় মূল্যবান পোশাক এবং

শয্যাদ্রব্য, বিবিধ গৃহসামগ্রী, হাতি ঘোড়া রথ এবং প্রচুর টাকা-পয়সা।"

"তারপরে আমরা মহাভারতে আবার কোথায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই?" এবারে সত্যেনদা প্রশ্ন করেন।

সরকারদা উত্তর দিলেন, "প্রভাসে।"

"কখন?"

"অর্জুন তাঁর একক বনবাসের সময় যখন প্রভাসে এসেছিলেন।"

"একটু খুলে বলুন না।" এবারে সুরমাদি সরকারদাকে অনুরোধ করেন।

সরকারদা মৃদু হেসে বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন যে, দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পরে পাঁচ ভাইয়েব মধ্যে একটা ব্যবস্থা হয়েছিল যে, তাঁদের একজন যখন কৃষ্ণার কাছে থাকবেন, তখন অন্য কেউ সেখানে যেতে পারবেন না। কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ করলে, তাঁকে বারো বছরের জন্য বনবাসী হতে হবে।

"কিছুকাল পরে একদিন যুধিষ্ঠির যখন আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাসে ছিলেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ এসে অর্জুনকে জানালেন যে, চোর তাঁর গোধন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় অর্জুনকে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতেই হল। গোধন উদ্ধার করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে বনবাসী হলেন। এই বনবাসের সময় অর্জুন নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি তিনবছর মণিপুরে বাস করেন। তখনই বভ্রুবাহনের জন্ম হয়।

"মণিপুর থেকে বিভিন্ন তীর্থদর্শন করে অর্জুন এলেন প্রভাসতীর্থে। খবর পেয়ে কৃষ্ণ ছুটে গেলেন সেখানে। তারপরে দুজনে প্রভাস-ভ্রমণ সেরে রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হলেন। বাসুদেব সেখানে আগের থেকেই সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে নাচ-গানের আসর বসল।

"পরদিন সকালে কৃষ্ণের সঙ্গে পার্থ এলেন দ্বারকায়। শত শত দ্বারকাবাসী পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। মেয়েরা গবাক্ষদ্বার থেকে অর্জুনকে অভিনন্দিত করলেন।

"কয়েকদিন দ্বারকায় কাটিয়ে অর্জুন আবার যাদবদের সঙ্গে রৈবতকে এলেন। সেখানে তখন মহোৎসব চলছে। সেই মহোৎসবেই ধনঞ্জয় প্রথম সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন। তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

"সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ সহাস্যে সুভদ্রার পরিচয় দিয়ে বললেন—পছন্দ হলে বল, বাবার কাছে প্রস্তাব করি।

"লজ্জিত অর্জন বললেন—একে তোমার বোন, তার ওপরে এমন রূপসম্পন্না, পছন্দ হবে না কেন? তোমার আপত্তি না থাকলে বল, কিভাবে আমি সুভদ্রাকে পেতে পারি?

"বাসুদেব উত্তর দিলেন- স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয়, কিন্তু মেয়েদের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলেন, বিবাহের উদ্দেশে বলপূর্বক নারীহরণ ক্ষত্রিয়দের প্রশংসনীয় কর্ম। অতএব তুমি আমার বোনকে হরণ করে নিয়ে যাও।

"অর্জুন সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রা যখন দেবার্চনা শেষ করে রৈবতক থেকে দ্বারকায় ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি জোর করে সুভদ্রাকে রথে তুলে নিলেন।

"সুভদ্রার দেহরক্ষীরা দ্বারকায় এসে সুভদ্রা-হরণের সংবাদ দিলেন। অকৃতজ্ঞ অর্জুনকে শাস্তি দেবার জন্য সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হলেন বলরাম। তিনি ছুটে এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাকে বললেন—তোমার প্রাণ-প্রিয় সখা অর্জুনের কীর্তি শুনেছ? সে যে-পাত্রে ভোজন করেছে, সেই পাত্রই চূর্ণ করেছে। কুলপাংশুলটা আমাদের চরম অপমান করেছে। তুমি এখনও চুপ করে রয়েছ!"

"এক মিনিট সরকারদা!" সাহাবাবু বলে ওঠেন, "শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বৈমাত্রেয় ভাই। কাজেই অর্জুন তো তাঁদের দুজনেরই পিসতুত ভাই?"

"হ্যাঁ।" সরকারদা উত্তর দেন, "তাহলেও বলরাম এতই রেগে গিয়েছিলেন যে, তিনি ভাই শব্দটা ব্যবহার করলেন না।"

"কিন্তু অর্জুন নিজের মামাতো বোনকে হরণ করলেন?"

"না।" সরকারদা মৃদু হেসে সাহাবাবুর প্রশ্নের উত্তর দেন।

বলেন, "সুভদ্রা বসুদেবের পালিতা কন্যা।"

একটু থেমে তিনি আবার শুরু করেন, "যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাব মুখে ফুটিয়ে শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন—কেন, কি করেছে অর্জুন ?

"—কি করে নি সে ? ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলরাম বললেন, সে সমস্ত যদুবংশকে অপমান করেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয়া সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

"—তাই বল। শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন—কিন্তু অর্জুন তো আমাদের বংশকে অপমান করে নি।

"—তাহলে ?

"—সে আমাদের বংশের সম্মান রক্ষা করেছে।

" কারণ ?

"—কারণ সে আমাদের অর্থলোভী মনে করে সুভদ্রার জন্যে কনে-পণ দিতে চায় নি। স্বয়ংবরে কন্যালাভ দুরূহ বলে স্বয়ংবরে সম্মত হয় নি। পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে কন্যাগ্রহণ অক্ষত্রিয় কাজ বলে বাবার সঙ্গেও দেখা করে নি ...

"বলরাম কৃষ্ণকে শেষ করতে দেন না, প্রশ্ন করেন—তা সে যা করেছে, তা কি ঠিক কাজ হয়েছে ?

"—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কুল শীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন ধনঞ্জয় সুভদ্রাকে হরণ করে আমাদের কুলোচিত কাজ করেছে। এর ফলে সুভদ্রাও যশস্বিনী হবে।

"একবার থেকে কৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত উষ্ণকণ্ঠে বললেন—তাছাড়া কুন্তীভোজের ভরতকুলশ্রেষ্ঠ সব্যসাচীকে তোমরা কি-ই বা করতে পার ? স্বয়ং মহাদেব ছাড়া ত্রিভুবনে আর কে তাকে পরাজিত করতে পারে ? কাজেই তার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে তার কাছে গিয়ে প্রফুল্লমনে তাকে আমাদের অভিনন্দিত করা কর্তব্য।

"বলরাম ও যাদবগণ কৃষ্ণের পরামর্শ মেনে নিলেন। তাঁরা অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সসম্মানে সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন। মহাসমারোহে তাঁদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন

হল। নবদম্পতি একবছর দ্বারকায় কাটিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে রমণীয় তীর্থরাজ-পুষ্করে চলে গেলেন। অর্জুন ও সুভদ্রা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের বাকি সময়টা সেখানেই অতিবাহিত করলেন। তারপরে তাঁরা খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরে গেলেন। সেখানে চারভাই, কুন্তীদেবী এবং দ্রৌপদী পরমসমাদরে তাঁদের বরণ করলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীকে বললেন —আমি আজ থেকে আপনার অনুচরী হলাম। কৃষ্ণা সস্নেহে সখা কৃষ্ণের ভগিনীকে বুকে টেনে নিলেন

"অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেছেন শুনে বলরাম এবং অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর উপহারসহ খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবগণ পরম পুলকে তাঁদের বরণ করলেন। কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করে বলরাম যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। কৃষ্ণ কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থেই রয়ে গেলেন।"

২ । দুই ।

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা ও হালুয়া। গাড়িতে বসে এমন বাড়ির খাবার কখনও খাই নি! কুণ্ডু স্পেশালের চেয়ে ভাল ট্যুর কণ্ডাক্টর ভারতে আছে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁদের চেয়ে যে ভাল ট্যুর-ক্যাটারার নেই, একথা সোচ্চার স্বরে বলতে পারি। তীর্থযাত্রায় এঁরা নিরামিষ খাবার দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুস্বাদু খাবার পেলে যে-কোন আমিষাশী আনন্দিত হবে। শুধু তাই নয়, সময়ানুবর্তিতাও মনে রাখবার মতো। নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও এঁরা ঠিক সময়ে খাবার পরিবেশন করে চলেছেন। অথচ এখন তাঁদের দুজন লোক কম। ভৌমিকবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় সহকারী ম্যানেজার তপন জয়পুর থেকে কলকাতায় চলে গিয়েছে। আর অহীনকেও আবু-রোডে রেখে আসতে হল। কিন্তু না, অহীনের কথা থাক্। ওর কথা বলতে গেলেই আবার শঙ্করীদের কথা এসে পড়বে। ওদের কথা আমি আর ভাবতে চাইছি না।

বাণেশ্বরের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে খাবারে মনোনিবেশ করি।

বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। গতকাল মাউন্ট আবু থেকে ফিরে এসেই দুঃসংবাদটা শুনেছিলাম। ডাঃ ভাদুড়ী শ্রীকে নিয়ে কয়েকদিন ট্রেন-জার্নি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে বলেছেন। ফলে কাল রাতে আমি একেবারেই খেতে পারি নি।

কিন্তু আর আবু-রোডের কথা নয়, মেহসানা এসে গেছে। ট্রেন থেমেছে স্টেশনে। ম্যানেজার পাঁচুবাবু যথারীতি জুতো পরে নেমে গেল গাড়ি থেকে। তাকে এখন যেতে হবে এ. এস. এম. অফিসে। গাড়ি কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরবর্তী দ্বারকাগামী ট্রেনের সঙ্গে আমাদের গাড়িটি জুড়ে দেবার জন্য তদ্বির করতে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলো ম্যানেজার। এসেই দুঃসংবাদটা জানালো, "আজ এখানেই থাকতে হবে।"

"কেন?" আমরা আঁতকে উঠি।

"ট্রেন নেই। সেই একই ইতিহাস, কয়লার অভাবে ট্রেন বাতিল।"

"পরের ট্রেন কখন?"

"আগামীকাল সকালে। তার মানে আজ সারাদিন ও সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে।"

একেই বলে অদৃষ্ট। দ্বারকার আকর্ষণে শঙ্করীদের আবু-রোড স্টেশনে ফেলে এলাম, অথচ পাঁচঘণ্টা পরেই দিনের যাত্রার যতি টানতে হল। রেলপথে আবু রোড থেকে মেহসানা মাত্র ১১৭ কিলোমিটার, সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছিল, আর এখন বেলা এগারোটা। এর চেয়ে আজকের দিনটা আবু-রোডে থেকে যাওয়াই ভাল ছিল। অসুস্থ মেয়েটার কাছে আর একটা দিন থাকা যেত।

তাহলে অবশ্য কালকের দিনটাও এমনি নষ্ট হত। কারণ এখান থেকে এখন আমাদের দ্বারকায় নিয়ে যাবার মতো ঐ একখানি ট্রেন! অপর ট্রেনটি কয়লার অভাবে বাতিল হয়ে গেছে।

আবু-রোড থেকে দ্বারকার পথ খুব দীর্ঘ নয়, মাত্র ৫৮২ কিলো-মিটার। অথচ এই পথটুকু অতিক্রম করার জন্যই আমাদের সাতাশ ঘণ্টা রেলভ্রমণ নির্দিষ্ট করা ছিল। আর এখন কাল সকাল পর্যন্ত

এখানে ঠায় বসে থাকতে হবে। অতএব সব মিলিয়ে আবু-রোড থেকে দ্বারকা যেতে আমাদের পঞ্চাশ ঘণ্টার ওপরে সময় লাগবে।

তবে কয়লার অভাবই এর একমাত্র কারণ নয়। বাতিল করা ট্রেনটি ছাড়াও আজ এখান থেকে দ্বারকার পথে আরও দু'খানি ট্রেন আছে। কিন্তু তার একখানি মেল ও অপরখানি এক্সপ্রেস। তাদের সঙ্গে ট্যুরিস্ট-কোচ্ যুক্ত করার আইন নেই। সুতরাং ধৈর্য সহকারে আগামীকাল সকালের সেই ধীরগতি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির জন্য অপেক্ষা করাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ।

মাসিমার ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। মাসিমা মানে শঙ্করী পূর্ণিমা ও সেজদির মা। সুশ্রী ও শান্তস্বভাবা প্রৌঢ়া। অতিশয় স্নেহশীলা। দুটি যুবতী মেয়ে ও সাত বছরের নাতনীকে আবু-রোডে ফেলে তাঁকে দ্বারকা-দর্শনে যেতে হচ্ছে। তাই সকাল থেকে এতক্ষণ তিনি শুয়ে ছিলেন পাশের খোপে। সহসা তিনি উঠে এসেছেন।

মাসিমা আমাকে বলেন, "বাবা জ্যোতি, আমরা তো আবু-রোড থেকে খুব বেশিদূর আসি নি ?"

"না", উত্তর দিই, "মাত্র ১১৭ কিলোমিটার।"

"তাহলে বোধহয় রেল-অফিসে গেলে ফোনে ওদের একটা খবর নেওয়া যেতে পারে। মেয়েটা ভাল আছে জানলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।"

সত্যিই তো। এটা তো কারও খেয়াল হয় নি ! মেহসানা সম্ভবত আবু-রোডের রেলওয়ে ডিভিশন্যাল হেড-কোয়ার্টার। ফোনে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে। শঙ্করীর বাবা নাকি বেড়াতে বড়ই ভালোবাসতেন। মাসিমা তাঁর সঙ্গে বহু জায়গায় বেড়িয়েছেন। কাজেই রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বেশ ভাল ধারণা রয়েছে।

ম্যানেজার পাঁচুবাবুকে কথাটা বলতেই সে রাজী হয়ে যায়। বলে, "চলুন, তাহলে একবার এরিয়া-কন্ট্রোল অফিস থেকে ঘুরে আসা যাক্।"

জামা-জুতো পরে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। পাঁচুর চেনা জায়গা।

আমরা স্টেশন ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে আসি। মেহসানা জেলা-সদর। ১৯৭১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী জনসংখ্যা ৫১,৭১৩ জন। কাজেই পথ বেশ জনবহুল। পথের দুপাশে দোকানপাট।

খানিকটা হেঁটে পথের বাঁ-পাশে একটু উঁচুতে এরিয়া-কণ্ট্রোল অফিস। জনৈক অফিসারের কাছে যেতেই তিনি আমাদের বসতে অনুরোধ করলেন। সব কথা শুনে বললেন, "এ আর একটা কঠিন কাজ কি? তাঁদের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান, ঘণ্টা দুই পরে এসে খবর নিয়ে যাবেন।"

ফিরে এলাম স্টেশনে। প্লাটফর্মেই দেখা হয়ে গেল ঠাকুরমাদের সঙ্গে। তাঁরা ওয়েটিং-রুমে স্নান করতে চলেছেন, সঙ্গে বাসি কাপড়ের বালতি। রাজস্থান মরুভূমির দেশ, সেখানে জলাভাব হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আগ্রা থেকে গাড়ি ছাড়ার পরেই ম্যানেজার আমাদের বলে দিয়েছিল—গাড়ির জলে কারও স্নান বা কাপড় কাচা চলবে না। ও-কাজ দুটো স্টেশনে স্টেশনেই সেরে নিতে হবে।

কিন্তু গুজরাট তো ঠিক রাজস্থানের মতো নয়। অন্তত আজ সকালে গাড়িতে আসতে আসতে তাই মনে হয়েছে। গুজরাটের প্রকৃতি রাজস্থানের মতো রুক্ষ নয়, অনেক স্নিগ্ধ ও সুন্দরতর। আজ মাঝে মাঝেই বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখেছি।

তাহলে এখানে আমরা গাড়ির জলে স্নান করতে পারব না কেন?

ম্যানেজার জানাল—"এখানে জলাভাব নেই বটে, কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষ দৈনিক একবারের বেশি জল দেবেন না। সে জল স্নান কিংবা কাপড় কেচে খরচ করে ফেললে পরে হাত মুখ ধোবার জল পাওয়া যাবে না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তার ওপরে ঠাকুরমারা দৈনিক দুবার করে কাপড় ছাড়েন এবং তাঁরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। তাঁদের স্নানে একটু বেশি জল লাগে। ম্যানেজারের সাধ্য কি গাড়িতে এত জলের যোগান দেয়!

এজন্য ঠাকুরমাদের অবশ্য কোন অভিযোগ নেই। তাঁরা কুণ্ডু কোম্পানীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁদের

এসব জানা আছে। তাঁরা বাসি কাপড় বালতিতে জমিয়ে রাখেন। জংশন স্টেশন এলেই ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। সদলবলে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং-রুমে ছোটেন। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েন। প্রাণভরে স্নান ও কাচা শেষ করে বেরিয়ে আসেন। প্লাটফর্মে কাপড়জামা শুকোতে দেন। এমন চটপটে ভ্রমণপটু বৃদ্ধা-পর্যটক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁরা সবার আগে গাড়ি থেকে নামেন, সকলের চেয়ে বেশি দর্শন করে সবার আগে গাড়িতে ফিরে আসেন।

ঠাকুরমারা তিনজন, কিন্তু তারা দলে পাঁচজন। সঙ্গে দুজন দিদি রয়েছেন। তাঁদের একজনের নাম জানি না। অপর জন কল্পনাদি—মিসেস কল্পনা রায়। ঠাকুরমারা কেউই কারও আত্মীয়া নন। এমনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েই তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেই থেকে তারা একত্রে তীর্থদর্শন করে চলেছেন। অনামী দিদি বড়-ঠাকুরমার অবিবাহিতা ছোটবোন। বলা বাহুল্য, তাঁর বিয়ের বয়স বহু বছর আগেই অতিবাহিত হয়েছে।

কল্পনাদি মধ্যবয়সী, সুশ্রী এবং শিক্ষিতা। তিনিও জনৈকা ঠাকুরমার আত্মীয়া। ধর্মপরায়ণা এবং শান্তস্বভাবা। প্রতিদিন শেষরাতে উঠে গরদ পরে গীতাপাঠ করেন। শুয়ে শুয়ে শুনি। বেশ ভাল লাগে আমার।

ম্যানেজারের সঙ্গে প্লাটফর্ম থেকে নেমে আসি। রেল-লাইন ধরে এগিয়ে চলি সাইডিংয়ের দিকে। বড় বড় শহর ছাড়া বড় একটা ট্যুরিস্ট প্লাটফর্ম থাকে না। সেখানে সুবিধামত কোন জায়গায় ট্যুরিস্ট-কোচ রাখা হয় এবং প্রয়োজনে তার স্থান পরিবর্তন করা হয়। এই স্থান পরিবর্তনের নাম শান্টিং।

এবারে কুম্ভ স্পেশালের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে আমার সবচেয়ে বড় লাভ—এই শান্টিং বস্তুটিকে চিনতে পারলাম। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়-প্রয়োজনেই ট্যুরিস্ট-কোচ শান্টিং করে থাকেন। কিন্তু তার ফলে ট্যুরিস্টদের মাঝে মাঝেই খুব অশান্তির মধ্যে সময় কাটাতে হয়। যেমন ধরুন রাতে আপনারা কোন স্টেশনে রয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার

পরে আলো নিবিয়ে সবে শুয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত দেহ, চোখের পাতা বুজে আসতে সময় লাগল না। কিন্তু ঠিক তখুনি কোন এক অজানা কারণে আপনার গাড়ির শান্টিং শুরু হয়ে গেল। আর দফায় দফায় সে শান্টিং চলল। আপনাকে প্রায় সারারাতই জেগে থাকতে হল। কারণ যখনই আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করেছেন, তখুনি শান্টিং এঞ্জিন এসে আপনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সকালে উঠে সবিস্ময়ে দেখেছেন—আপনি গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে ছিলেন, পরদিন সকালেও ঠিক সেখানেই রয়েছেন। স্বভাবতই রাতের শান্টিংকে আপনার ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে হতে পারে।

আবার যেমন ধরুন, আপনি স্নান করতে যাবার সময় গাড়িটা প্লাটফর্মে ছিল। স্নান করে ফিরে এসে দেখেন গাড়ি সেখানে নেই। অথচ আপনার তখন পরনে গামছা, কাঁধে ভিজে কাপড়। সেই অবস্থাতেই ছুটতে হবে ওয়ার্ড-মাস্টারের অফিসে। তাঁর কাছ থেকে খবর নিয়ে সাইডিং থেকে গাড়ি খুঁজে বার করতে হবে।

ম্যানেজার সঙ্গে থাকায় এখন গাড়ি খুঁজতে কোন অসুবিধা হল না। আমরা গাড়িতে উঠে এলাম। মাসিমা সেজদি সাহাবাবু বিউটি উমাদি ও সত্যেনদা যেন আমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁরা সবাই ছুটে আসেন দোরগোড়ায়, সমস্বরে প্রশ্ন করেন—"কোন খবর পেলে, ওরা কেমন আছে?"

"খবর পাওয়া যায় নি, তবে ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরই পাওয়া যাবে।" ওঁরা নিঃশব্দে জায়গায় ফিরে যান। সত্যেনদা বলেন, "চলো, স্নান করে আসা যাক্।"

সত্যেনদা মানে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বয়সে প্রৌঢ়। সহজ সরল সাদাসিধে মানুষ। বরানগরে বাড়ি ও ব্যবসা। যৌথ পরিবার, সত্যেন্দ্রনাথ সবার বড়। তাঁর বড় মেয়েটি কলেজে পড়ে। বড় ছেলেটি এবারে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিত। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার। খুব ভাল সাঁতার জানত। অথচ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! সেই সাঁতার কাটতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। নিষ্ঠুর ভগবান অকারণে অসময়ে তাজা ছেলেটাকে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু ভক্ত সত্যেনদা

ভগবানের এই অবিচারকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন। ভাইয়েরা তাঁকে একা ছাড়েন নি, মা-কে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

সত্যেনদার সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। শুধু স্নান নয়, কিছু জামাকাপড়ও কেচে দেওয়া দরকার।

জামাকাপড় কেচে ও স্নান সেরে ফিরে আসি গাড়িতে। সত্যেনদা সাহায্য করেছেন বলেই এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পেরেছি। পাঁচু জিজ্ঞেস করে, "ঘোষদা, চা খাবেন নাকি?"

"এখন চা!" আমি বিস্মিত।

দাদা বলেন, "বুঝতে পারলে না? রান্না হতে দেবি আছে, তাই চা ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। কুণ্ডু কোম্পানীর ম্যানেজার, বুঝলে হে!"

দাদা এর আগেও বার দুয়েক এঁদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। পাঁচু হাসতে হাসতে কিচেনে চলে যায়।

বৌদি আমাদের খোপে আসেন। বলেন, "ঘোষদা, আপনার কাছে নিশ্চয়ই গল্পের বই আছে? দিন না দুয়েকখানা, সময় যে আর কাটতে চাইছে না।"

বালিশের পাশে রাখা স্বামী দিব্যাত্মনন্দের 'পুণ্যতীর্থ ভারত' বইখানি এগিয়ে ধরি তাঁর দিকে।

বৌদি মাথা নেড়ে জানান, "না-না, ও-বই নয়, আমি অন্য বইয়ের কথা বলছি।"

আমেদাবাদ ও বম্বেতে আমার এক দাদা, মাসি ও দুজন বন্ধু থাকে। তাদের জন্য আমার চারখানি বই নিয়ে এসেছি। বৌদি বোধকরি বইগুলো দেখে থাকবেন। অগত্যা সিটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে বের করি। বইগুলো বের করে বৌদির হাতে দিতেই দাদা পাঁচু ও কল্পনাদি তার হাত থেকে তিনখানি বই নিয়ে নেন।

দাদা বলেন, "আরে! এ যে দেখছি সবই শঙ্কু মহারাজের লেখা!"

চমকে উঠি। বৃহত্তর প্রয়োজনে সহযাত্রীদের কাছে সযত্নে আমার লেখক-পরিচয় গোপন করতে হয়েছে। এবং যাত্রার বাকি দিন

ক'টিতে পরিচয়টা গোপন থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাই কোনমতে সামলে নিই নিজেকে। দাদাকে বলি, "হ্যাঁ। উনি আমাকে বইগুলো দিয়ে দিয়েছেন, আমেদাবাদে ওঁর এক আত্মীয়কে দেবার জন্য।"

"আরে! তুমি শঙ্ক মহারাজকে চেন নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সবিনয়ে উত্তর দিই।

দাদা আর কোন প্রশ্ন না করে 'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' বইখানি নিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়েন।

বৌদি, পাঁচু এবং কল্পনাদিও 'ভাঙা দেউলের দেবতা', 'গঙ্গাসাগর' এবং 'উত্তরস্যাং দিশি' বই তিনখানি নিয়ে নিজেদেব জায়গায় চলে যান। আমি বাক্সটা রেখে দিয়ে আবার ওপরে উঠে বসি।

সহসা দাদা চীৎকার করে উঠলেন, "এটা কি হল?"

কি হল আবার! আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে তাকাই। দাদাও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে কেমন একটা সন্দেহ। কিন্তু আমি কোন কথা বলি না। শঙ্কিত বক্ষে পরবর্তী প্রশ্নের প্রতীক্ষা করতে থাকি।

দাদা প্রশ্ন কবেন, "সেদিন আমাব বাড়ির ঠিকানা বলার পরে তুমি আমাকে বলেছিলে না, বাঘা যতীন কলোনীর হৃষীকেশ ঘোষ দস্তিদার তোমার কাকা?"

এইবারে তাঁর অমন চেঁচিয়ে ওঠবার কারণ বুঝতে পারছি—'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' বইখানি আমি নাম লিখে কাকাকে উৎসর্গ করেছি। আর দাদার প্রতিবেশী হৃষীকেশ ঘোষ দস্তিদার যে আমার কাকা, তা-ও সেদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম দাদাকে। তখন তো জানা ছিল না যে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এখন সামলাই কি করে? প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলে যে আমার সহযাত্রীরা আমার সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন হয়ে পড়বেন এবং আমিও আর সহজভাবে মেলামেশা করতে পারব না তাঁদের সঙ্গে।

বাধ্য হয়ে অভিনয় শুরু করতে হয়। সহসা হো হো করে হেসে উঠি আমি। পাঁচু অমিয়বাবু ও সাহাবাবু অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকান।

একটু বাদে হাসি থামিয়ে দাদাকে বলি, "আপনি বুঝি ভেবেছেন যে হৃষীকেশবাবু যখন আমার কাকা এবং শঙ্কু মহারাজের কাকা, তখন আমিই শঙ্কু মহারাজ ?"

"তাহলে ?" দাদা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

গম্ভীর স্বরে বলি, 'শঙ্কু মহারাজ আমার গ্রাম সম্পর্কে জ্যাঠতুত দাদা। সুতরাং হৃষীকেশবাবু আমাদের দুজনেরই কাকা '

"শঙ্কু মহারাজ তোমার ভাই ?"

"না, দাদা। আমার থেকে অনেক বড।"

"কলকাতায় ফিরে একবার আলাপ করিয়ে দেবে তাঁর সঙ্গে। ওঁর লেখা আমার খুব ভাল লাগে।"

আমি মাথা নাড়ি।

দাদা সন্তুষ্ট হয়ে আবার শুয়ে পড়েন বিছানায়। তিনি বই পড়া শুরু করেন। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কল্পনাদি 'উত্তরস্যাং দিশি' পড়তে নিয়েছেন। ঐ বইতে আবার আমার একটা ছবি আছে।

দাদার মতো কল্পনাদির কাছে এত সহজে রেহাই পাব বলে মনে হচ্ছে না, আর একবার কারও সন্দেহ হলে, সহযাত্রীরা সবাই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে দেবেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকেই শুয়ে পড়লেন। পাখা চললেও গাড়ির ভেতরে বেশ গরম। তবু তাঁরা দিবানিদ্রার আয়োজনে লেগে গেলেন।

দিনে আমি ঘুমোতে পারি না। তাহলেও এই রোদে গাড়ি থেকে নেমে আসার কোন কারণ ছিল না। গাড়িতে বসে বৃন্দাবনে চিঠি লিখতে পারতাম। উদয়পুরের পরে আর মানসীকে চিঠি দেওয়া হয় নি। অথচ সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে আমি ওকে কথা দিয়েছি, প্রত্যেক জায়গা থেকেই একখানি করে চিঠি দেব।

চিঠি না লিখলে ডায়েরী নিয়ে বসতে পারতাম। কিন্তু এ-সব কিছুই না করে আমি নেমে এলাম গাড়ি থেকে।

ম্যানেজার খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। সহকারী তপন চলে

যাবার পর থেকে এতগুলো যাত্রীর সব ঝামেলা তাকে একা পোহাতে হচ্ছে। সে বোধহয় ভেবেছে এই দুপুর রোদে এরিয়াকন্ট্রোল অফিসে যাবার দরকার কি? বিকেলে গিয়ে খবর নিয়ে এলেই হবে।

কিন্তু আমার যে মন মানছে না। তাই কাউকে কিছু না বলে নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে। চলেছি এরিয়া-কন্ট্রোল অফিসে।

শ্রীর খবর পাওয়া গেল—ভাল খবর। সে ভাল আছে। বিমলবাবু কথা বলেছেন এঁদের সঙ্গে। জানিয়েছেন—মেয়ে তিন-চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আমরা যেন কোন দুশ্চিন্তা না করি।

অফিসার ভদ্রলোককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসি রেলওয়ে এরিয়া-কন্ট্রোল অফিস থেকে রাস্তায় নেমেই সামনে একটা সিনেমা হল। 'জুগনু' ছবি চলছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাটিনী শো শুরু হবে। ভীষণ ভিড়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। মেয়েরা প্রায় সবাই ছেলেদের পোশাক পরে ছেলেদের সঙ্গে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন লম্বা লাইন, তেমনি প্রচণ্ড রোদ। কিন্তু সবারই মুখে হাসি। ওরা সিনেমা দেখতে এসেছে যে!

আবার স্টেশনে আসি। বেশ, বড় স্টেশন। হবেই তো, বিরাম-গাঁম-সুরেন্দ্রনগর-রাজকোট-জামনগর-ওখা রেলপথের একটি বড় জংশন মেহসানা।

কিন্তু আমাদের গাড়ি কোথায় গেল? এখানেই তো ছিল! আবার শান্টিং। নিশ্চয় তাই। কিন্তু গাড়িটা নিয়ে গেল কোথায়?

না, খুব দূরে নয়। কিছুক্ষণ ছুটোছুটির পরেই গাড়ি খুঁজে পেলাম। তবে তাতে লাভ হল না কিছু। দরজা বন্ধ, ভেতরে সবাই বোধহয় ঘুমে অচেতন। ডাকাডাকি করা উচিত হবে না। তার চেয়ে গাড়িটাকে একবার ঘুরে দেখা যাক্। কেউ যদি জেগে থাকেন, দেখতে পাবেন আমাকে।

গাড়ি-পরিক্রমা বৃথা হল না। স্বয়ং সরকারদা দেখতে পেলেন আমাকে। বৌদি এসে দরজা খুলে দিলেন।

সরকারদার খোপের সামনে এসে বুঝতে পারি ব্যাপারটা।

সেখানে রীতিমত সভা বসে গিয়েছে। সাহাবাবু, সত্যেনদা, মা ও অমিয়বাবু তো রয়েছেনই, উমাদি, কল্পনাদি, সুরমাদি এবং বিউটিও এসে হাজির হয়েছে।

বৌদি জিজ্ঞেস করেন "এই রোদে কোথায় গিয়েছিলেন ঘোষদা?"

"রেলের অফিসে, শ্রীর খবর আনতে।"

"কোন খবর পাওয়া গেল বাবা?" মাসিমা প্রায় ছুটে এলেন। বুঝতে পারছি, তিনি জেগেই ছিলেন এবং ওদের কথাই ভাবছিলেন বসে বসে।

"হ্যা মাসিমা।" আমি উত্তর দিই, "খবর পেয়েছি, ভাল খবর। শ্রী ভাল আছে আজ। বিমলবাবু বলেছেন তিন চার দিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"বেঁচে থাকো বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" আর কিছু বলতে পারেন না তিনি। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি চলে যান নিজের জায়গায়।

সুরমাদি বলেন, "ভাই, বোস এখানে, সরকারদা কৃষ্ণ-কথা বলছেন।" তিনি একটু সরে বসেন।

এতক্ষণে সভার আলোচ্য বিষয়সূচী জানা গেল। দিদির কথামত বসে পড়ি তাঁর পাশে।

হ্যাঁ, সুরমাদি মানে সুরমা কুণ্ডুকে আমি 'দিদি' বলেই ডাকি। নিঃসন্তান বালবিধবা। জামাইবাবুর অকালমৃত্যুর পর থেকে ভাইদের সংসারে আছেন। বছর দশেক বয়সের একটি ভাইপো তার বর্তমান জীবনের প্রধান অবলম্বন। তীর্থদর্শন ছাড়া তিনি তাকে ফেলে কোথাও যান না। তীর্থ করতে এসেও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছেন না তাকে। তাই প্রতি তীর্থে দর্শনের আগেই তার জন্য কেনা কাটা সেরে নেন। এমন আশ্চর্য সুন্দর সরলার সংস্পর্শে খুব কমই এসেছি।

কল্পনাদি তাগিদ দেন, "এবারে শুরু করুন সরকারদা।"

"হ্যাঁ।" সরকারদা আরম্ভ করেন, "শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে ইন্দ্র-

প্রস্থে বাস করতে থাকলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্যে পঞ্চপাণ্ডবের জীবনের দিনগুলি মন্দাক্রান্তা তালে বয়ে চলল। সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যুর জন্ম হল। পাঁচ ভাইয়ের ঔরসে পাঞ্চালীর পাঁচ ছেলে জন্মালো--প্রতিবিন্ধ, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতনিক ও শ্রুতসেন।

"এই সময় একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন যমুনায় জলবিহার শেষ করে বিশ্রাম করছিলেন, তখন জটাধারী একজন দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর দাড়ির রঙ হলুদ, গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো। পরনে চীরবাস, মাথায় জটা।

"কৃষ্ণার্জুন পরম-সমাদরে তাকে অতিথিরূপে বরণ করে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

"ব্রাহ্মণ বললেন—আমি অগ্নি। সর্বদা অপরিমিত ভোজন করি। আমার বহুদিনের ইচ্ছা খাণ্ডববন দগ্ধ করি। কিন্তু ইন্দ্রের সখা পন্নগ-রাজ তক্ষক সেখানে সপরিবারে বাস করে বলে আমি জ্বলে উঠলেই ইন্দ্র সেখানে জলবর্ষণ করেন। ফলে আমি খাণ্ডবদাহ সম্পন্ন করতে পারছি না।"

একবার থামলেন সরকারদা। তারপরে বললেন, "আপনারা জানেন যে, রাজা শ্বেতকির যজ্ঞে একটানা বারো বছর ঘি খেয়ে অগ্নি-দেবের অগ্নিমান্দ্য হয়েছিল। প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা তাঁকে পরামর্শ দিলেন—তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর।

"কিন্তু অগ্নিদেব সাতবার চেষ্টা করেও খাণ্ডবদাহ করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি আবার ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বললেন—নর-নারায়ণঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা এখন খাণ্ডববনেই রয়েছেন। তুমি তাঁদের সাহায্য প্রার্থী হও। তাঁরা সহায় হলে তুমি খাণ্ডবদাহ করতে সমর্থ হবে। তাই অগ্নি ছুটে এসেছিলেন কৃষ্ণার্জুনের কাছে।

"যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। অগ্নির বক্তব্য শেষ হবার পরে কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন--তা আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কি করতে বলেন?

"অগ্নি উত্তর দিলেন—আপনারা আমার সহায় হোন। অস্ত্র নিয়ে খাণ্ডববনের বাইরে পাহারায় থাকুন, যাতে কেউ বন থেকে পালিয়ে যেতে না পারে।

"একটু ভেবে অর্জুন বললেন—ইন্দ্রকে ভয় করি না। কারণ আমার এমন সব দিব্যাস্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে ইন্দ্রের মতো শত শত বজ্রধরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু সেই সব অস্ত্র ব্যবহার করার মতো ধনু নেই আমার। নেই কোন বায়ুবৎ বেগশালী ঘোড়া এবং রথ। কৃষ্ণেরও এমন কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে সে খাণ্ডববনের নাগ ও পিশাচদের সংহার করতে পারে।

"ভগবান হুতাশন তখন জলেশ্বর বরুণদেবকে ডেকে পাঠালেন সেখানে। বরুন আসার পর অগ্নি তাঁকে বললেন—সোমরাজ তোমাকে যে ধনু, কপিধ্বজ রথ এবং দুটি অক্ষয় তুণীর দিয়েছিলেন, সেগুলো অর্জুনকে দাও। ওগুলো দিয়ে তিনি একটি মহৎকর্ম সম্পাদন করবেন।

"বরুন তখন অর্জুনকে সর্বায়ুধ-সারভূত দিব্য শরাসন তথা গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং দুটি বায়ুবেগগামী রমণীয় রথ দান করলেন। তারপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকী গদা প্রদান করলেন। এই গদার শব্দ বজ্রের মতো ভয়ংকর।

"আর অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন-চক্র উপহার দিয়ে বললেন—হে মধুসূদন, তুমি এই চক্র দিয়ে দেবদানবদের অনায়াসে পরাজিত করতে পারবে। যতবার তুমি শত্রুর প্রতি এই চক্র নিক্ষেপ করবে, ততবারই শত্রুকে নিহত করে চক্র আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে।

"সন্তুষ্ট কৃষ্ণার্জুন তখন অগ্নিদেবকে নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে বললেন। তাঁরা সেই বায়ুবেগগামী রথ দুটিতে করে বনের চারিপাশে পাহারা দিতে থাকলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হলেন। বনের জীবজন্তু প্রাণভয়ে বাইরে বেরুতে চাইল, কিন্তু পারল না। পার্থ সুতীক্ষ্ণ শর দিয়ে তাদের খণ্ড খণ্ড করে আবার আগুনে নিক্ষেপ করলেন। জীবজন্তুর আর্ত চীৎকারকে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন বলে মনে হতে থাকল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে আকাশ আচ্ছন্ন

করে ফেলল। দেবতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা ছুটে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে।

"সব শুনে ইন্দ্র তাড়াতাড়ি খাণ্ডববন রক্ষা করতে এলেন। তিনি বারিবর্ষণ শুরু করে দিলেন। কিন্তু অর্জুন শরবর্ষণ করে বারিপাতন বন্ধ করে দিলেন।

"ইন্দ্রের সখা তক্ষক তখন খাণ্ডববনে ছিলেন না, কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেন সেখানেই ছিলেন। বাতবর্ষণ করে অর্জুনকে অজ্ঞান করে ফেলে ইন্দ্র অর্ধদগ্ধ অশ্বসেনকে রক্ষা করতে পারলেন, কিন্তু তক্ষকের স্ত্রী মারা গেলেন।

"ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তখন কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করলেন। দেবতারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব এবং অসুরগণও কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা বাসুদেব ও সব্যসাচীকে পরাজিত করতে পারলেন না।

"এই সময় সহসা এক দৈববাণী হল—দেবরাজ, তোমার সখা ভুজঙ্গেশ্বর বেঁচে আছেন। বৃথা যুদ্ধে শক্তিক্ষয় ক'র না। কারণ কৃষ্ণার্জুনকে তুমি কখনই পরাজিত করতে পারবে না। ওঁরা যে নর নারায়ণ।

"অগত্যা দেবরাজ স্বর্গে ফিরে গেলেন। অগ্নিদেব পনেরো দিন ধরে নির্বিঘ্নে খাণ্ডববন দগ্ধ করতে থাকলেন।

"কেবল অস্ত্রলাভ নয়, খাণ্ডবদাহনে অগ্নিকে সাহায্য করার পেছনে পার্থসারথির আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। দানব-স্থপতি ময় মহেন্দ্রের ভয়ে তাঁরই বন্ধু নাগরাজ তক্ষকের অরণ্যাবাসে আত্মগোপন করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন ইন্দ্র কখনই তাঁর বন্ধুর বাড়িতে শত্রুকে খুঁজবেন না। পাণ্ডবদের জন্য ময়দানবকে শ্রীকৃষ্ণের একান্তই প্রয়োজন ছিল।

"ময় যখন বুঝতে পারলেন, খাণ্ডববন সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হবে, তখন তিনি বাধ্য হয়ে বন থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি অর্জুনের সামনে এসে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। বললেন—আমি দানব-স্থপতি, দানবদের বিশ্বকর্মা ময়। আমি তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছি। প্রতিজ্ঞা

করছি, বেঁচে থাকলে তোমার এ ঋণ আমি নিশ্চয়ই শোধ করব।

"অর্জুন ময়দানবের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। এদিকে তখন অগ্নি দেবের খাণ্ডবদাহন প্রায় শেষ। অশ্বসেন, চারটি শার্ঙ্গক পাখী ও ময়দানব ছাড়া আর কোন প্রাণী সেখানে জীবিত নেই দেখে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জুন অস্ত্রত্যাগ করলেন। তারা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন।

"কিছুদিন বাদে ময় এসে হাজির হলেন কৃষ্ণার্জুনের সামনে। তিনি করজোড়ে অর্জুনকে বললেন—আপনি হুতাশনের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ করেছেন। অতএব আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করতে পারি?

"অর্জুন বললেন—হে কৃতজ্ঞ! তুমি মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ বলেই আমার উপকার করতে চাইছ। কাজেই তোমাকে দিয়ে আমি কোন কাজ করাতে চাই না। তুমি বরং কৃষ্ণের কোন কাজ করে দাও।

"ময় তখন কৃষ্ণের আদেশ জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ বললেন—হে শিল্পকর্মবিশারদ! তুমি যদি একান্তই আমার কোন প্রিয়কার্য করতে চাও, তাহলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটি সভাগৃহ নির্মাণ করে দাও যে, কেউ যেন বার বার দেখেও তেমনটি আর তৈরি করতে না পারে। এমন সভাগৃহ নির্মাণ কর, যেখানে দেবতা মানুষ এবং অসুরদের সকল অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়।

"কৃষ্ণের আদেশে সন্তুষ্ট হয়ে কৃতজ্ঞ ময় তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। এদিকে কৃষ্ণ তাঁর কাজ শেষ হয়েছে বলে দ্বারকায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। পিসীমা কুন্তী ও দাদা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তিনি স্নান করে অলঙ্কার পরে মালা ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে দেবদ্বিজগণের পূজা শেষ করলেন। ব্রাহ্মণগণ দৈ ফল ও ফুল প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। ধনদান করে বাসুদেব তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেন। তারপরে তিনি বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করলেন।

"চার ভাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির সেখানেই ছিলেন। সহসা তিনি ছুটে

এসে কৃষ্ণের রথে উঠলেন। সারথি দারুককে তাঁর জায়গা থেকে সরে যেতে বলে নিজে লাগাম হাতে নিলেন। অর্জুনও তাড়াতাড়ি রথে উঠে কৃষ্ণের পাশে বসে পড়লেন। যুধিষ্ঠির লাগামে টান দিলেন। রথ এগিয়ে চলল। ভীম নকুল সহদেব এবং উপস্থিত ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ কৃষ্ণের অনুগমন করতে থাকলেন।

"এইভাবে প্রায় অর্ধযোজন পথ অতিক্রম করবার পরে শত্রুনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আর নয়, এবারে আপনি ফিরে যান। তিনি যুধিষ্ঠিরের পা জড়িয়ে ধরলেন।

"পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির বুকে টেনে নিলেন। তিনি কৃষ্ণের মাথার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তাঁকে দ্বারকা রওনা হবার অনুমতি দান করলেন। ভীম ও অর্জুন তখন কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালেন। নকুল সহদেব এবং ছোটরা সবাই প্রণাম করলেন তাঁকে। তাঁরা রইলেন দাঁড়িয়ে, আর বাসুদেবের রথ চলল এগিয়ে। পাণ্ডবরা পলকহীন নয়নে তাকিয়ে রইলেন সেই রথের দিকে, ঠিক বৃন্দাবন থেকে বিদায় নেবার সময় বিরহ-ব্যাকুলা গোপিনীবা যেমন অপলকনয়নে বাসবিহারীর বথের দিকে তাকিয়েছিলেন"

থামলেন সরকারদা। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন কল্পনাদি, "এ কি! থামলেন কেন?"

মৃদু হেসে সরকাবদা বলেন, "দানব-স্থপতি ময় আগে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্মাণ করে দিন!'

"হয়ে গেছে।" উমাদি বলে ওঠেন।

সরকারদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, "কি?"

"ইন্দ্রপ্রস্থ। ময়দানব বহুকাল আগেই সে সভাগৃহ নির্মাণ করে ফেলেছেন। তাছাড়া আমরা তো ইন্দ্রপ্রস্থের কথা জানতে চাইছি না, আমরা কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইছি।"

অতএব সরকারদাকে শুরু করতে হয়, "ঝড়ের বেগে বাসুদেবের রথ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, কৃষ্ণ বিরহে বিচলিত পাণ্ডবরা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরে চললেন। তাঁরাও বিরহিনী গোপিনীদের মতই এই আশায় বুক বাঁধলেন যে, বাসুদেব তো আবার

ফিরে আসবেন।

"মহাবীর সাত্বত এবং সারথি দারুককে সঙ্গে করে দ্বারকানাথ দ্বারকায় ফিরে এলেন। তিনি মাতামহ উগ্রসেন, পিতা বাসুদেব এবং মাতা দেবকীকে প্রণাম করলেন। আহুক ও বলরামকে অভিবাদন জানালেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানু প্রভৃতিকে সস্নেহ আলিঙ্গন দান করলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন প্রিয়তমা রুক্মিণীর অন্দর-মহলে।"

তিন

বৈকালী চা এসে গিয়েছে। অতএব সভা ভঙ্গ হয়। আমরা চায়ের কাপ হাতে নিই। কিন্তু উমাদি উঠে দাঁড়ান। মতি জিজ্ঞেস করে, "চা খাবেন না দিদি?"

পাঁচু কৃত্রিম ধমক লাগায়, "গোপালদি কি নিজের জায়গায় বসে ছাড়া কখনও কিছু খান? উনি জায়গায় যাচ্ছেন, তুই চা নিয়ে সঙ্গে যা।"

মতি মৃদু হেসে উমাদিকে অনুসরণ করে। দাদা প্রশ্ন করেন, "ও নিজের জায়গায় বসে ছাড়া খায় না কেন ম্যানেজার?"

"'তাঁর কি একা খেলে চলে? না, মায়েরা কখনও গোপালদের আগে কিছু খেতে পারেন?"

"তা গোপাল কি চা-ও খান নাকি?" এবারে অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

অমিয়বাবু মজার মানুষ। ভদ্রলোক অকৃতদার, বয়স পাঁচের কোঠায়। কালীঘাটে একখানি পৈতৃক বাড়ি আছে, তারই ভাড়ায় জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিচ্ছেন। গায়ের রঙ কালো, ছিপছিপে গড়ন। নিজে কানে খাটো বলে সর্বদা সবার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেন এবং কেউ তাঁর সঙ্গে আস্তে কথা বললে ভীষণ ক্ষেপে যান।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। গোপাল চানাচুর আচার মসালা-দোসা সবই খায়। সে এতক্ষণ শুয়েছিল। এবারে গোপালদি তাকে

ঘুম থেকে তুলবেন, মুখ ধুইয়ে বিছানায় বসিয়ে দেবেন। তার সামনে কিছুক্ষণ চায়ের কাপটি রেখে তারপরে নিজে খেয়ে নেবেন।"

"কার বিছানায় বসাবেন, নিজের, না গোপালের ?"

"আপনি গোপালের বিছানা দেখেছেন ?" ম্যানেজার অমিয়-বাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। একটি চৌকো পেতলের বাক্স, আগে বোধহয় গয়নার বাক্স ছিল। তারই ভেতরে গোপালের বিছানা। তোষক বালিশ তাকিয়া চাদর—সবই আছে। উমাদি তো বাক্সটাকে সর্বদাই সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন।"

"গোপালদি এখন সেই পেতলেব বাক্সটির ডালা খুলে গোপালকে তার ভেতরে বসিয়ে রাখবেন। তারপরে বাক্সটিকে তার সিটের ওপরে রেখে দেবেন।"

সত্যেনদা শান্তিপ্রিয় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর বোধহয় আলোচনাটা ভাল লাগে না। তিনি উঠে দাঁড়ান। বলে, "ঘোষ বেরুবে নাকি ?"

"হ্যাঁ দাদা। জামা-কাপড়টা ইস্ত্রি করাতে যেতে হবে।"

'তাহলে চলো !"

আমি উঠে দাঁড়াই। মা জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছ বাবা ?"

"একবার বাজার থেকে ঘুরে আসছি।" উত্তর দিই।

সত্যেনদার মাকে আমি মা বলেই ডাকি। তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। আদর্শ মা। আমার অন্যান্য সহযাত্রিনীদের মতো তিনি যথেচ্ছ কেনাকাটা করে বোঝা বাড়ান নি। কিন্তু পুজো দিয়েছেন প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে।

অকালে পুত্রের বিয়োগব্যথায় ব্যথিত সত্যেনদার প্রতি মা-র সর্বদা সজাগদৃষ্টি। তাই আমি সঙ্গে যাচ্ছি শুনে তিনি বোধহয় নিশ্চিন্ত হলেন। বলেন, "যাও বাবা, ঘুরে এস। রাত ক'র না যেন।"

"ভয় নেই মা।" সত্যেনদা মৃদু হেসে বলেন, "আপনার নাবালক ছেলে দুটি অন্ধকারেও পথ চিনে ঠিক আপনার কাছে ফিরে আসবে।"

সত্যেনদা মাকে 'আপনি' বলেন।

সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ঘোষদা, বাজারে যাচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"আমার একটা ফরমাশ আছে!"

"বলুন।"

"কয়েকটা কলা, আম ও গোটাদুয়েক আপেল নিয়ে আসবেন।"

"মাসিমার জন্য?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মাসিমা পথের রান্না খাবার খান না। আজ বারোদিন হল আমরা কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি, এর ভেতরে তিনি একদিনও ভাত রুটি কিংবা লুচি খান নি—খাবেনও না। সঙ্গে করে চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে এসেছেন, তাই খাচ্ছেন এবং ঐ খেয়েই তীর্থদর্শন শেষ করে কলকাতায় ফিরবেন। তবে বলেছেন, দ্বারকায় গিয়ে দ্বারকানাথকে ভোগ দিয়ে একবেলা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করবেন।

সাহাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সত্যেনদার সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। সাহাবাবুর কথাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। পুরো নাম গোরাচাঁদ সাহা। বয়স বছর আটচল্লিশ। দেখে কিন্তু মনে হয় অনেক কম। বেশ সুন্দর চেহারা। সব সময় ফিটফাট থাকেন। কলকাতার একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করেন। খুবই শান্ত এবং ভদ্র মানুষটি। স্ত্রী সেজদিও স্বামীর মতই সরলস্বভাবা। কেনাকাটা করতে খুব ভালোবাসেন। ভদ্রমহিলা সন্তানহীনা। আর তাই বোধহয় দেবরের মেয়ে বিউটিকে তিনি ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন। বিউটি সেজদিকে 'মা' ডাকে, আর সাহাবাবুকে ডাকে 'ছেলে'। সাহাবাবুও যে তাকে 'মা' বলেই সম্বোধন করেন।

ছোট হলেও মেহসানা বাজারটি বেশ সুন্দর। প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। দোকানদাররাও ভারী ভদ্র।

দাড়ি কেটে ও কেনাকাটা সেরে ফিরে চলেছি স্টেশনে। আরে! দাসবাবুও সস্ত্রীক বাজারে এসেছিলেন দেখছি। কিছু কেনকাটাও করেছেন। কি ব্যাপার! পরশুদিন মাউন্ট-আবুতে ভদ্রলোক

বলেছিলেন—টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছে।

দাস-দম্পতিকে ধরবার জন্য পা চালাই। সত্যেনদা অবশ্যি আমার এ সদিচ্ছার সরিক হন না। তিনি তেমনি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন। আমি এগিয়ে আসি।

দাসবাবুর বয়স বছর ষাটেক। ছোটখাটো রোগা কালো মানুষটি। পাকা চুল, নকল দাঁত। অনেকটা সেকালের জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদারী চেহারা। লেখাপড়া জানেন বলে মনে হয় না। চিৎপুরে একটা মিষ্টির দোকানের মালিক ছিলেন। বেশ ভালো দোকান—দশ-বারোজন কর্মচারী কাজ করত। দোকানটি নাকি এখনও আছে, তবে তার মালিকানা পালটে গিয়েছে। অপুত্রক দাসবাবু ভাইপোদের মানুষ করেছিলেন, তারা জেঠামশায়ের দোকান দখল করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছে। দাসবাবু এখন সস্ত্রীক জামাইয়ের আশ্রিত। তবে দাসবাবুকে সোচ্চার স্বরে 'বাবা' বলে ডাকে।

জামাইয়ের জন্যই নিঃসম্বল দাসবাবু দ্বারকা-দর্শনে বেরুতে পেরেছেন। তবে কুণ্ডু স্পেশালকে পুরো টাকা দিতে পারেন নি বলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একখানি বার্থ পেয়েছেন। রাতে অবশ্য ম্যানেজার প্যাসেজে একটা বেঞ্চি পেতে দেয়। এবং মিসেস সেখানেই ঘুমান।

মিসেসের চেহারাটি দাসবাবুর ঠিক বিপরীত। তাঁকে দেখলে জমিদার-গিন্নী বলে মনে হয়। স্বভাবটাও অনেকটা সেই রকম। দাসবাবুর মতো সারাদিন বক্‌বক্ করেন না।

কুণ্ডু স্পেশালকে পুরো টাকা না দিতে পারলেও, দাসবাবু প্রায় প্রত্যেক জায়গায় নাতনীর জন্য কিছু না কিছু কিনেছেন। কেবল মাউন্ট-আবুতে কিছু কিনতে পারেন নি। বলেছিলেন, টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। তাহলে আজ আবার তিনি এ-সব কেনাকাটা করলেন কেমন করে?

কাছে এসে বলি, "আজ কি কিনলেন নাতনীর জন্য?"

"আর বলেন কেন?" দাসবাবু জবাব দেন, "কয়েকটা কাঠের পুতুল।"

"টাকা পেলেন কোথায়?" অভদ্রতা জেনেও প্রশ্নটা না করে

পারি না।

দাসবাবু কিন্তু কিছুই মনে করলেন না। বেশ উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আরে তাই তো! কথাটা যে বলাই হয় নি আপনাকে।"

"কি কথা?"

"টাকা এসে গিয়েছে।"

"এসে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ। আজই ম্যানেজারবাবু অফিস থেকে চিঠি পেয়েছেন, আমার জামাই তাঁদের কলকাতার অফিসে আমার নামে আরও দুশো টাকা জমা দিয়েছে। বলি নি আপনাকে—জামাই নয়, গত জন্মে বাবাজী আমার ছেলে ছিল।"

ফিরে আসি গাড়িতে। দাদা শুয়ে আছেন কেন? দিদি উমাদি ও বিউটি তার পাশে বসে। উমাদি হাওয়া করছেন, বিউটি মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। দিদি বলছেন, "হরলিক্সটা খেয়ে নিন, একটু সুস্থ বোধ করবেন।"

"শরীর ভাল নেই নাকি?" জিজ্ঞেস করি।

"না ভাই। শরীরের কিছুই হয় নি, মনটা ভাল নেই বলেই হয়তো শরীরটা একটু দুবল লাগছে।"

"তাহলে হরলিক্সটা ঠাণ্ডা করছেন কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন না।" ধমক লাগাই আমি।

দাদা দ্বিরুক্তি না করে ওঠে বসেন। সুবোধ বালকের মতো এক-চুমুকে হরলিক্সটুকু নিঃশেষ করে আবার শুয়ে পড়েন।

বিউটি সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে, "কেমন জব্দ দাদু! আমি তো তখুনি বলেছিলাম, মামু আসার আগে খেয়ে নিন।"

দাদা শব্দহীন। সুতরাং বিউটিকেও নীরব হতে হয়। সে নীরবে দাদুর চুলের ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করি, "মন খারাপ হবার কারণ কি? চিঠি এসেছে নাকি?"

"হ্যাঁ।" দাদা ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেন।

"কে লিখেছেন?"

"ছোটবৌমা। সে আমার ওপর রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।"

"কারণ ?"

"আমি তার কথা শুনি নি। বলেছিল—আপনার শরীর খারাপ, এবার না হয় না-ই বা গেলেন।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হাসতে হাসতে বলি, "না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমি ভাবলাম না জানি কি দুঃসংবাদ এসেছে!"

"দুঃসংবাদ ছাড়া আর কি ?" দাদা প্রতিবাদ করেন, "তোমরা আমার সেই অসহায় ছেলেটাকে দেখ নি, ছোটবৌমা চলে গেলে কে তার দেখা-শোনা করবে ? হয়তো দিনের পর দিন সে না-খেয়ে থাকবে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। একটি ছাড়া দাদার সব ছেলেরাই কৃতী। তিনজন য়ুরোপে লেখা-পড়া করেছে। মেয়েদেরও সবারই খুব ভাল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু দাদার একটি ছেলে জন্ম থেকেই একটু অস্বাভাবিক—মানে তার মস্তিষ্কটা ঠিক পরিণত নয়। বহু চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয় নি। বৌদি মারা যাবার পর থেকে সেই ছেলেটি দাদার গলগ্রহ। তাকে ঝি-চাকরদের হাতে ছেড়ে কোথাও যাওয়া মুশকিল। তবু ছোটবৌমা বাড়ি থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত। সে-ও বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

সুতরাং দাদাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমি পাশের খোপে আসি। সরকারদা দেখছি ইতিমধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। আমিও বসে পড়ি। সরকারদা বলে চলেছেন—

"ময় কৃষ্ণের আদেশমত পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এক মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী অতি বিচিত্রা ও সর্বরত্নভূষিতা সভাস্থলী নির্মাণ করে দিলেন। তিনি ভীমসেনকে দানবরাজ বৃষপর্বার স্বুবর্ণমণ্ডিত শত্রু-নাশিনী গদা এবং ধনঞ্জয়কে দেবদত্ত মহাশঙ্খ উপহার দিলেন। বিশ্বকর্মা-নির্মিত যাদবসভা দেবসভা ও ব্রহ্মাসভার চেয়েও পাণ্ডব রাজসভা সুন্দর হল। শুভদিনে পাণ্ডবরা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। মহর্ষি নারদ

নিজে এসে সেই সভাগৃহের প্রশংসা করলেন। তিনি পাণ্ডবদের রাজনীতি সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন। তাঁদের কাছে ইন্দ্রসভা যমসভা বরুণসভা কুবেরসভা ও ব্রহ্মাসভার সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন। তারপরে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের যশঃকীর্তন করে জানালেন যে, স্বর্গবাসী মহারাজা পাণ্ডুর ইচ্ছা, তাঁর পুত্ররা রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন।

"নারদ চলে যাবার পরে চার ভাই এবং মন্ত্রীরা সবাই যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির অপ্রমেয় মহাবাহু সর্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না। কারণ তিনি জানতেন বাসুদেব সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ। একমাত্র তিনিই তাঁকে সৎপরামর্শ দিতে পারেন। কাজেই তিনি জনৈক দূতকে দ্রুতগামী রথে দ্বারকায় পাঠালেন। ভগবান চক্রপাণি দূতের কাছে যুধিষ্ঠিরের আহ্বান পেয়ে ইন্দ্রসেনকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে রওনা হলেন।

"কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে জানালেন—আমার ইচ্ছা রাজসূয় যজ্ঞ করি, তুমি আমাকে পরামর্শ দাও। তুমি তো জান সংসারে সৎপরামর্শ পাওয়া খুবই কঠিন। কেউ বন্ধুত্বের জন্য দোষত্রুটির উল্লেখ করে না, কেউ স্বার্থপরতার জন্য প্রিয়বাক্য বলে, কেউ বা নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কথা মনে রেখে উপদেশ দেয়। কিন্তু কৃষ্ণ, তুমি তো সকল দোষ-রহিত এবং কাম-ক্রোধ বিবর্জিত, তুমি আমাকে যথার্থ পরামর্শ দান কর।

"কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ আপনি সর্বগুণে গুণবান, অতএব আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা অবিধেয় নয়। আপনি সর্বজ্ঞ, তবু আপনাকে বলছি, আপনি জানেন যে সত্যযুগে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তারপরে যাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছেন, তাঁরা কেউ ক্ষত্রিয় নন, ক্ষত্রিয়ের মতো আচার-ব্যবহার করে থাকেন মাত্র।

—"এখন মহাপতি জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করেছেন। প্রতাপশালী

শিশুপাল জরাসন্ধের সেনাপতি হয়েছেন। সুতরাং নিয়মানুসারে তিনিই ভারত-সম্রাট, একমাত্র তাঁরই রাজসূয় যজ্ঞ করবার অধিকার আছে। জরাসন্ধ জীবিত থাকলে আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়।

"—মহারাজ, আপনি জানেন যে দানবরাজ কংস যাদবদের পরাজিত করে সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সেই দুরাত্মা বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজিত করে সবপ্রধান হয়ে উঠল। তখন ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কংস বধের অনুরোধ করে। আমি প্রথমে আহুককন্যা দান করে অক্রূরকে বশীভূত করি। তারপরে বলভদ্রের সাহায্যে কংস ও সুনামাকে সংহার করি।

"— কংস-ভয় নিবারিত হল বটে কিন্তু তারপরেই জরাসন্ধ প্রবল-পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। আমরা জানতাম যে, তাঁর শুধু অসংখ্য সৈন্য নয়, হংস ও ডিম্বক নামে দুজন দেবতুল্য অনুচর আছে। তারা তিনজনে অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করতে পারে।

"—এদিকে হংস নামে আরেকজন নরপতি ছিল। বলদেব তাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক সেই সংবাদ শুনে ভাবল তার সহচর হংস মারা গিয়েছে। হংস ছাড়া জীবন-ধারণ বৃথা বিবেচনা করে ডিম্বক যমুনায় প্রাণ বিসর্জন দিল। আর তার মিথ্যে মৃত্যু-সংবাদ শুনে ডিম্বক মারা গিয়েছে জেনে হংসও যমুনার জলে আত্মসমর্পণ করল। প্রিয় সহচরদের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ব্যথিত জরাসন্ধ জয়যাত্রা বন্ধ করে মগধে ফিরে গেলেন।

"—মহারাজ, আপনি জানেন কংস জরাসন্ধের জামাই। কিছুকাল পরে একদিন তাঁর মেয়েরা আবার এসে তাঁকে কংস-হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল—তুমি আমাদের পতিহন্তাকে সংহার কর।

"—জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করলেন। আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি ভাগ করে প্রত্যেকে কিছু কিছু নিয়ে ব্রজমণ্ডল ছেড়ে পশ্চিমে পলায়ন করলাম। এখন আমরা পশ্চিম-দেশে রৈবতকের কাছে কুশস্থলীতে বাস করছি। অর্থাৎ আমরা জরাসন্ধের ভয়ে পর্বতে

আশ্রয় নিয়েছি। ঐ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন ও প্রস্থে এক যোজনের কিছু বেশি। পর্বতে একুশটি শৃঙ্গ আছে। আমরা কুশস্থলীর দুর্গ-সংস্কার করে নিয়েছি। সেখানে শত শত দ্বার তৈরি করেছি বলে এখন সে দুর্গ-নগরীর নাম দ্বারাবতী। আপনি জানেন যে জরাসন্ধের ভয়ে যদুবংশীয় সকলেই এখন সেখানে ঐক্যবদ্ধ এবং আমরা আঠারো হাজার জ্ঞাতিভাই দ্বারাবতী রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ রয়েছি।

"—হে ভারতসত্তম! আপনি সম্রাটতুল্য গুণশালী, আপনারই ভারত-সম্রাট হওয়া উচিত। কিন্তু জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনি যদি সত্যই রাজসূয় করতে চান, তাহলে আগে জরাসন্ধকে বধ করে বন্দী রাজাদের মুক্ত করুন।"

থামলেন সরকারদা। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই পাশের খোপ থেকে দাদা বলে উঠলেন, "একি! থামলে কেন? জরাসন্ধ-বধের কথা বলো।"

বুঝতে পারছি, তীর্থদর্শনে বেরিয়ে যে স্নেহপ্রবণ পিতা মুহূর্তের জন্য তাঁর অনুপযুক্ত অসহায় পুত্রটির কথা ভুলতে পারছেন না, মহাভারতের কাহিনী তাঁরও সব আশঙ্কা এবং বেদনার বিস্মৃতি ঘটিয়েছে। অথচ দাদার কাছে এ কাহিনী নতুন নয়। তিনি নিজেই পরবর্তী ঘটনাটির উল্লেখ করলেন। দাদা জীবনে বহুবার জরাসন্ধ-বধ কাহিনী পড়েছেন ও শুনেছেন। তবু আজ তিনি আবার তা শুনতে চাইছেন, কারণ মহাভারত কখনও পুরনো হয় না। অথচ মহাভারতে যে সমাজ ও জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা অন্তত তিন হাজার বছরের পুরনো।

এর কারণ—ভারত-জীবনের প্রায় সবদিক মহাভারতে প্রতিফলিত এবং সেই অতীত ভারত আজও সম্পূর্ণ অতীত নয়। কয়েক বছর আগেও আমরা গাড়োয়ালের তমসা-উপত্যকায় মহাভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বেঁচে থাকতে দেখে এসেছি। দেখেছি, দুর্যোধন ও কর্ণ সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ লৌকিক-দেবতা। আজও সেখানে সব ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিবাহ করে।*

* লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

মহাভারত শুধু প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস নয়, মহাভারত ভারতীয় জীবন সংস্কৃতি ও ধর্মের ধাবক। আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'The *Mahabharata* is not merely a "song of Victory", it is a *Purana-Samhita*, a collection of old legends, and an *Itivritta* or traditional account of high-souled kings and pious sages, of dutiful wives and beautiful maids.'** মহাভারতের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সহজাত। তাই দাদা ব্যক্তিগত বেদনা বিস্মৃত হয়ে মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে তলিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু মহাভারতের ভাবনা থাক্। সরকারদা ইতিমধ্যে আবার কৃষ্ণ-কথা শুরু করেছেন, তাই শোনা যাক্। সরকারদা বলছেন, "বাসু-দেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—হে ধীমান্! তোমার মতো সংশয়চ্ছেদক পৃথিবীতে আর নেই। তুমি আমাকে যেমন পরামর্শ দিলে, এমনটি আর কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, বল-রাম ভীম অর্জুন এবং তোমার মধ্যে কে জরাসন্ধকে বধ করবে?

"কৃষ্ণ কোন উত্তর দেবার আগেই ভীম বলে উঠলেন—কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জুনে জয়। অতএব আমরা তিনজনে একত্র হয়েই জরাসন্ধকে বধ করব।

"যুধিষ্ঠির তখন কৃষ্ণকে বললেন—তুমি তো জান, ভীম ও অর্জুন আমার দু-চোখের মণি এবং তুমি আমার মন। তোমরা তিনজনে চলে গেলে, আমি বাঁচব কেমন করে?

"কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করলেন—মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী নই। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করব। মেজদা ঠিকই বলেছেন, আমি নীতিজ্ঞ, সে বলবান এবং অর্জুন আমাদের রক্ষয়িতা। তিন অগ্নি একত্র হয়ে যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, আমরাও তিনজন তেমনি একত্রে জরাসন্ধকে বধ করব।

"ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

** 'Advanced History of India'

বললেন—তুমি প্রজ্ঞা নীতি বল ক্রিয়া এবং উপায়-সম্পন্ন, অতএব অর্জুন ও ভীম যথাক্রমে তোমার অনুগমন করবে। তাহলেই বিক্রম নীতি জয় ও বল সিদ্ধ হবে।

"বাসুদেব ভীম ও অর্জুন তখন তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান করে মগধের পথে যাত্রা করলেন। তাঁরা কুরুদেশ ছাড়িয়ে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালকূট অতিক্রম করলেন। তারপরে গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা ও সরযূ পার হয়ে পূর্ব-কোশলা দেখতে পেলেন। সেখান থেকে মিথিলা হয়ে মালায় এসে চর্মন্বতী নদী পেরোলেন। অবশেষে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে মগধদেশে উপস্থিত হলেন।

"তাঁরা দুরতিক্রম্য গিরিব্রজ অতিক্রম করে জরাসন্ধের প্রাসাদদ্বারে পৌঁছলেন। সেখানে তিনটি ভেরী ছিল। তাতে একবার আঘাত করলে একমাস ধরে শব্দ হত। তাঁরা ভেরী তিনটিকে ভেঙে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাজসভার মালাকারদের কাছ থেকে জোর করে মালা ছিনিয়ে নিয়ে গলায় পরলেন। তারপরে জরাসন্ধের সামনে উপস্থিত হলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণ দেখে জরাসন্ধ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাদের কুশল প্রশ্ন করলেন।

"ভীমার্জ্জুন কোন উত্তর দিলেন না, তাঁরা মৌন রইলেন। ধীমান বাসুদেব তাঁদের দেখিয়ে বললেন—মহারাজ, এঁরা নিয়মস্থ, এখন কথা বলবেন না। রাত প্রথম প্রহর অতিবাহিত হলে এঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।

"স্নাতক ব্রাহ্মণদের প্রতি জরাসন্ধের শ্রদ্ধা এবং দুর্বলতার কথা কৃষ্ণের অজানা ছিল না। তাই তাঁরা স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছিলেন। তিনি জানতেন জরাসন্ধ দুপুর রাতেও স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশী ভীমার্জুনের সঙ্গে আলাপ করতে সম্মত হবেন। আর তখুনি কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

"জরাসন্ধ তাঁদের যজ্ঞাগারে বিশ্রাম করতে বলে শয়নকক্ষে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনি মাঝরাতে আবার যজ্ঞাগারে ফিরে এলেন। এবারে কিন্তু তাঁদের দেখে জরাসন্ধের খানিকটা সন্দেহ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কে? সোজা পথে না

এসে গিরিব্রজ অতিক্রম করে এখানে এলেন কেন, আর কেনই বা তখন আমার পূজা গ্রহণ করলেন না ?

"কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—আমরা শত্রুগৃহে এসে কখনও তার পূজা গ্রহণ করি না।

"—শত্রু ! আমি আপনাদের শত্রু ! কখন আমি শত্রুতা করলাম ?

"—তুমি বলি দেবার জন্য ক্ষত্রিয়রাজাদের বন্দী করে রেখেছ। আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়। তোমাকে বধ করবার জন্য আমরা এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি।

"—আপনারা কে ?

"—আমি তোমার পুরনো শত্রু বাসুদেব আর এরা ভীম ও অর্জুন।

"বিস্মিত হলেও নির্ভীক বীর জরাসন্ধ বললেন—আমি এখুনি সৈন্যদের ডেকে তোমাদের হত্যা করাতে পারি। কিন্তু তোমরা আমার অতিথি, সুতরাং তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। বলো, কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ? ইচ্ছে করলে অবশ্য তিনজনেই একসঙ্গে যুদ্ধ করতে পার।

"হলধরানুজ মধুসূদন জানতেন ব্রহ্মার বরে জরাসন্ধ যাদবদের অবধ্য। তাই তিনি তাঁকে বললেন—তুমিই বলো মহারাজ, তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে ?

"জরাসন্ধ তখন তাঁর সেনাপতি কৌশিক ও চিত্রসেনকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। ভীমকে দেখিয়ে তাদের বললেন—আমি এই মহাবীর বৃকোদরের সঙ্গে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি। যদি এই যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তোমরা আমার ছেলে সহদেবকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করবে।

"সেনাপতিগণ বিস্মিত হলেন। কিন্তু রাজার আদেশ, তাঁদের নীরব থাকতে হল।

"ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে তাঁরা করমর্দন করে নিলেন। তারপরে একে অপরকে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করতে শুরু করে দিলেন। কেউই কম নন। কাজেই দিনের পর দিন ধরে

যুদ্ধ চলল। তেরো দিন তেরো রাত যুদ্ধ চলার পরে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যুদ্ধ থামাতে চাইলেন। সুযোগ উপস্থিত বুঝতে পেরে ভীমকে সচেতন করবার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নয়, কারণ সে মরে যেতে পারে।

"ভীম দ্বিগুণ উৎসাহে জরাসন্ধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি প্রচণ্ড বেগে তার পেটে লাথি মারলেন। কিন্তু বর্ম পরে থাকায় জরাসন্ধের কিছুই হল না।

"কৃষ্ণ আবার বললেন—মেজদা, তোমার যে দৈববল ও বায়ুবল আছে, একবার তা মহারাজা জরাসন্ধকে দেখাও।

"ভীম তখন জরাসন্ধের দু-পা ধরে কিছুক্ষণ মাথার ওপরে ঘুরিয়ে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরে হাঁটুর চাপে তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করলেন। এবং অবশেষে ভীম জরাসন্ধের পা-দুটি ধরে তাঁকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেললেন।

"শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হল। বুদ্ধিমান শত্রুনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিয়ে তাঁর চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করলেন।

"ভীমার্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধের রথে চড়ে কৃষ্ণ জরাসন্ধের কারাগারে এলেন। কংস-বধের পরে মথুরা কারাগারে যেমন বসুদেব ও দেবকীকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ তাঁর বান্ধবদের কারামুক্ত করলেন।

"মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষত্রিয়রাজারা জীবন ফিরে পেলেন। তারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে কৃষ্ণকে বললেন—আমরা আপনার ভৃত্য। আদেশ করুন, আমাদের কি করতে হবে?

"—মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইছেন, আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন।

"নৃপতিগণ সম্মত হলেন, আর তারপরেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেব সেখানে এসে কৃষ্ণের কৃপাপ্রার্থনা করলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভয়দান করলেন। বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে রাজত্ব কর। রাজসূয় যজ্ঞের পরেই মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ছোট ভাই সহদেবের সঙ্গে তোমার ছোট বোনের বিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন

করবেন।

"কৃষ্ণ ভীমার্জুনকে নিয়ে রথে চড়ে ইন্দ্রপ্রস্থ রওনা হলেন।

"যুধিষ্ঠির নিজে তাঁদের বরণ করলেন। সেখান থেকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেরাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্পর্কে আরও কিছু পরামর্শ দিলেন। তারপরে কৃষ্ণ একদিন কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মরাজ প্রদত্ত মনস্তুল্যগামী দিব্য রথে দ্বারকার পথে রওনা হলেন।"

চার

সকালে ঘুম ভাঙল গাড়ির ঝাকানিতে। গাড়ি চলার ঝাঁকানি নয়। শান্টিংয়ের ঝাঁকানি। গাড়ি চলার ঝাঁকানির একটা ছন্দ আছে, যতি আছে, মিল আছে। একটা তাল আছে, লয় আছে, সুর আছে। তাই তাতে ঘুম ভাঙে না বরং ঘুম আসে। কিন্তু শান্টিংয়ের ঝাকানি অবিকল গলা-ধাক্কার মতো। তাতে তন্দ্রা টুটে যায়, অন্তরাত্মা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে ওঠে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। টর্চ জেলে ঘড়ি দেখি। আরে, এ যে দেখছি পাঁচটা বেজে গিয়েছে। তাহলে তো ট্রেন এসে গিয়েছে। সম্ভবত তার সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্যই আমাদের গাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দ্বারকা যাত্রা আসন্ন। সুতরাং শান্টিং এঞ্জিনটার ওপর অভিমান করা উচিত হবে না।

জানালা খুলে দিই। এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। থাকবেই তো। এ যে বাংলা নয়, গুজরাত—ভারতের পশ্চিমতম রাজ্য। এখানে ভোর হয় অনেক দেরিতে।

আমাদের গাড়ি প্লাটফর্মে নিয়ে এল, ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিল। যাক্, বাঁচা গেল। বেশ কিছুক্ষণ আর শান্টিংয়ের ঝামেলা সইতে হবে না।

গাড়ির সবারই প্রায় ঘুম ভেঙে গেছে। সবারই এক প্রশ্ন— ট্রেন ছাড়ছে নাকি? উত্তর শুনে সবাই খুশি। গতকাল সকালে আবু-রোড থেকে যাত্রা করে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক পরেই যাত্রাবিরতি

ঘটাতে হয়েছিল। তারপর থেকে ঠায় বসা। বসে বসে শুধুই আজকের এই শুভমুহূর্তটির প্রতীক্ষা। অচল গাড়িতে বসে থাকা বড়ই কষ্টকর। সেই কষ্টের অবসান আসন্ন।

শান্টিং আমাদের খোপে কেবল একজন মানুষের ঘুম ভাঙাতে পারে নি। সে আমাদের ম্যানেজার পাঁচুগোপাল দে। স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী মানুষ। বহু বছর ধরে কুণ্ডু স্পেশালের গাড়িতে ম্যানেজারী করছে। সুতরাং শান্টিং ওর ঘুম ভাঙাতে পারবে কেন। বরং শান্টিং চলতে থাকলে ম্যানেজারের বোধকরি ঘুম আরও গাঢ় হয়।

মাজন ও গামছা নিয়ে বাথরুমে আসি। সারাদিন গাড়িতে থাকতে হবে। কাজেই এত তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু তিনটি বাথরুম, প্রায় চল্লিশজন মানুষ। পরে ভিড় লেগে যায় বলে আমি রোজই সবার আগে বাথরুমের ব্যাপারগুলো সেরে নিই।

বাথরুম থেকে বেরুবার আগেই ট্রেন চলতে শুরু করল। বেরিয়ে দেখি কল্পনাদি গীতাপাঠে বসে গিয়েছেন। উমাদি গোপালকে ঘুম থেকে তুলছেন। হেসে বলি, "আপনি কি নিষ্ঠুর মা-ই বটে, বেড-টি আসবার আগেই ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে দিলেন!"

উমাদি গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করেন, 'Early to bed and early to rise/Makes a man healthy, wealthy and wise.'

"তিন হাজার বছর ধরে সারা ভারতের কোটি কোটি মানুষকে জ্ঞান বিতরণ করবার পরেও কি আপনার গোপালের আরও 'wiser' হবার দরকার আছে?"

উমাদি কিন্তু আমার সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, "আচ্ছা ঘোষদা, আপনিও কি শঙ্কু মহারাজের মতো মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণের কাল মাত্র হাজার তিনেক বছর আগেকার?"

স্বাভাবিকভাবেই বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তাহলেও কোনমতে সামলে নিই নিজেকে। উত্তর দিই, "হ্যাঁ।" একবার থেমে পাল্টা প্রশ্ন করি, "তা, আপনি শঙ্কু মহারাজের কোন্ বইতে এটা পড়েছেন?"

"কেন, তাঁর 'মধু-বৃন্দাবনে' বইতে।"

ঢোঁক গিলে কোনমতে জিজ্ঞেস করি, "কৃষ্ণলীলার কাল সম্পর্কে সে কি লিখেছে বলুন তো?"

"অনেকদিন আগে পড়েছি, সবটা মনে নেই। তাহলেও যতটা মনে পড়ছে বলছি।" একবার থামেন উমাদি। বোধহয় মনে করবার চেষ্টা করেন। তারপরে বলেন, শঙ্কু মহারাজ বলেছেন—দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ সমসাময়িক। অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার কাল খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী।"

"তাহলে মহাভারতে নেমিনাথ, এমনকি জৈনধর্মের কোন উল্লেখ নেই কেন?" আমি শঙ্কু মহারাজের বিরোধিতা করি।

"কারণ মহাভারতকার অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।" উমাদি শঙ্কু মহারাজার পক্ষ নিলেন।

"কিন্তু একটা কথা আছে—যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।"

"ওটা কথার কথা।" উমাদি প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে যান।

"আর আমি যদি বলি যে জৈনধর্ম প্রসারলাভের আগে, এমন কি রামচন্দ্রের আগেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল!"

"কথাটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। কারণ শঙ্কু মহারাজ বলেছেন—দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক এবং তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে মথুরায় জৈনধর্ম প্রসার লাভ করে অনেক পরে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রামচন্দ্রের আগে হতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু আগে রাবণের ভাগনে লবণকে পরাজিত করে শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করেছিলেন।"

"রামায়ণে না থাকলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক রাজসভার একটি আলোচনায় পরীক্ষিতের উত্তরপুরুষ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, 'পারস্পরিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এই দুই মহাগ্রন্থের রচনাকাল তথা ঘটনাগত পৌর্বাপর্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা করার উপায় আছে। রামায়ণে উল্লিখিত বিদেহপতি জনক ও কেকয়রাজ অশ্বপতি যে দুজন সমকালীন ঐতিহাসিক ব্যক্তি

তাতে সন্দেহ নেই।...রামায়ণ ও রামায়ণ রচয়িতাকে রাজা জনক ও অশ্বপতির পূর্বে স্থাপন করা যায় না। পক্ষান্তরে মহাভারতোক্ত পাণ্ডববংশীয় শেষ রাজা জনমেজয় যে রাজা জনকের বহু পূর্ববর্তী তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে জানা যায়, জনক রাজার কালেই পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় একজন সুপ্রাচীন নৃপতি বলে গণ্য হতেন। সুতরাং মহাভারত-বর্ণিত রাজন্যবর্গ ও ঘটনাবলী যে রামায়ণের রাজন্যবর্গের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে জনমেজয়ের তক্ষশিলা বিজয়ের পূর্বেই যে কুরুপাণ্ডবকাহিনী সুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এমন মনে করাও বোধকরি অসঙ্গত নয়। কারণ মহাভারতে বলা হয়েছে তক্ষশিলা নগরীতেই মহাভারতাচায বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে কুরুপাণ্ডবকাহিনী শুনিয়েছিলেন। এই বৈশম্পায়নও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। শাঙ্খ্যায়ণ এবং আশ্বলায়ণের গৃহ্যসূত্র রচনার সময়েও বৈশম্পায়ন মহাভারতাচার্য বলে পরিচিত ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে শুধু যে বৈশম্পায়ন নামটিই পাওয়া যায় তা নয়, মহাভারত নামও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এই সব গ্রন্থে রামায়ণের উল্লেখমাত্রও নেই। এর থেকেও মহাভারতেব অগ্রগামিতাই সূচিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লোক। রামায়ণকে ঐ সময়ের পরবর্তী বলেই স্বীকার করতে হয়। মোট কথা, রামকাহিনীর উৎপত্তি যখনই হোক আদিকাব্য রামায়ণ যে মূল-মহাভারতের পরবর্তী তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'*

"তাছাডা সম্প্রতি অযোধ্যায় খননকাযের যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানকার সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর চেয়ে পুরনো নয়। অথচ আপনি জানেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র বইতে বলেছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৩০ অব্দে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল।"

"আধুনিক পুরাতাত্ত্বিকরা সে মত সমর্থন করেন না।"

"কিন্তু তাঁরা বলেন মহাভারতের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী।" উমাদিকে শেষ করতে দিই না আমি।

---

*'রামায়ণ-সমস্যা'

উমাদি একটু হাসেন। তারপরে বলেন, "কিন্তু ঘোষদা, ডঃ বি. বি. লালের এই মত কিন্তু অনেক পুরাতাত্ত্বিক মানতে পারছেন না। যেমন ধরুন, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ডি. সি. পাণ্ডে বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০থেকে ১০০০ বছরের মধ্যে কোন সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বলেছেন, মহাভারতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক বস্তু রয়েছে। কারণ য়ুয়ান চোয়াঙ পর্যন্ত লিখে গিয়েছেন—মহাভারতের যুদ্ধের পর থেকেই কুরুক্ষেত্রে বহু মানুষের কঙ্কাল চাপা পড়ে রয়েছে।"

"তার মানে আপনিও শঙ্কু মহারাজের মতই মনে করেন মোটা-মুটিভাবে কৃষ্ণ তিন হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

উমাদিকে আর না ঘাঁটিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আসি। আবার সেই দুর্ভাবনাটা পেয়ে বসে আমাকে—ধরা পড়ে যাবার ভাবনা। ভদ্রমহিলা 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়েছেন। জেনেছেন যে লেখকের পদবী 'ঘোষ'। আমাকে তিনি 'ঘোষদা' বলেই ডাকছেন। যে-কোন সময় প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে পারি। এবং গতকাল যত সহজে দাদার কাছে নিষ্কৃতি পেয়েছি, অত সহজে এঁর কাছে পরিত্রাণ পাব বলে মনে হচ্ছে না।

দাদা উঠে বসেছেন। জিজ্ঞেস করি, "আজ কেমন আছেন?"

"ভাল, একেবারে ভাল।" একবার থেমে আবার বলেন, "আরে, ভাল হব না তো কি? আমার কি তোমাদের মতো ওষুধ-খাওয়া শরীর যে একটু সর্দি-কাশি হলেই সাতদিন শুয়ে থাকতে হবে। বাহাত্তর বছর বয়স হল, বাহাত্তরটা ট্যাবলেট খেয়েছি কিনা সন্দেহ।"

জিজ্ঞেস করি, "অসুখ হলেও কি আপনি ওষুধ খান না?"

"অসুখ আমার খুব কম হয়। হলেও ওষুধ বড় একটা খাই না, ন্যাচার্যাল ট্রীটমেন্ট করি।"

"কি রকম?"

"শুয়ে থাকি, কথা বলি না এবং জল ছাড়া আর কিছু খাই না। তাই কাল হরলিক্স খেতে চাই নি, কিন্তু তোমরা শুনলে না, জোর করে খাইয়ে দিলে।"

"দিদিমা, উঠে পড়ুন এবারে।" বাণেশ্বরের গলা পাচ্ছি। নিশ্চয়ই চা হয়ে গিয়েছে। তাই বোধহয় মিসেস দাসকে শয্যাত্যাগ করতে বলছে। কারণ তিনি প্যাসেজে শুয়েছেন। তাঁর বেঞ্চি না সরালে বাণেশ্বরের এদিকে আসা সম্ভব নয়।

বেঞ্চি সরাবার শব্দ হচ্ছে। মিসেস দাস আমাদের কামরায় প্রবেশ করেন। আর ঠিক তখুনি দাদামশায় বাঙ্ক থেকে ঠিক তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়েন।

মিসেস প্রথমে একটু চমকে ওঠেন। তারপরেই কর্কশকণ্ঠে ধমক লাগান, "আঃ মর! বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।"

দাসমশায় অপ্রস্তুত। কারণ ঘটনাটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। তিনি ওপর থেকে স্ত্রীকে দেখতে পান নি। এমনি নিচে নেমেছেন। কিন্তু দৃশ্যটা আমাদের তৃপ্ত করে। আমরা উচ্চস্বরে হেসে উঠি।

লজ্জিত দাসমশায় অমিয়বাবুব পাশে গিয়ে বসেন। মিসেস দাস স্বামীর বাঙ্কে বিছানাপত্র রেখে বাথরুমের দিকে চলে যান।

একটু বাদে বাণেশ্বর ও মতি চা নিয়ে আসে। চায়ে চুমুক দিয়ে অমিয়বাবু দাসমশায়কে জিজ্ঞেস করেন, "তা, দাসদার রাতে ঠিকমত ঘুম হচ্ছে তো?"

অমিয়বাবুব মনে কি আছে বলতে পারি না। তবে তাঁর প্রশ্নটার মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটি বোধ করি শ্রীদাসের মনকে জটিল করে তুলেছে। তাই তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আপনি আমাদের কথায় কথা বলতে আসেন কেন? জীবনে স্ত্রী-সঙ্গ করলেন না, আপনি কেন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আসেন?"

কানে কম শুনলেও আমিয়বাবু মোটেই বোকা নন। বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে তিনি সহাস্যে বলেন, "আমি আপনার স্ত্রী-সঙ্গের প্রসঙ্গে কিছু বলছি না, জানতে চাইছি—রাতে আপনার ঠিকমত ঘুম হচ্ছে কিনা?"

"না, হচ্ছে না। কেমন করে হবে? বউ রইল নিচে আর আমি রইলাম ওপরে—এ অবস্থায় কারও রাতে ঘুম হয়?"

বলা বাহুল্য অমিয়বাবু এবারে চুপ মেরে যান। আমরাও নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে থাকি।

বাণেশ্বরকে কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বাইরে তাকাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও খানিকটা পাল্টে গিয়েছে ইতিমধ্যে। রেল-লাইনের দু'ধারেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দু-একটি টিলা। ক্ষেতের মাটি কোথাও লাল, কোথাও ধূসর, আবার কোথাও বা বেলে। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই এক-একটি স্টেশন আসছে, ট্রেন থামছে। স্টেশনগুলো বেশ বড় বড় কিন্তু যাত্রী নেই বললেই চলে। কেউ বড় একটা নামছেও না গাড়ি থেকে। মনে হচ্ছে, গাড়ি না থামলেও চলত।

কিছুক্ষণ বাদে আরেকটা স্টেশন এলো, ট্রেন থামল। এখানে কিন্তু লোক নামছে—অনেক লোক। একদল মেয়ে-পুরুষ ও বালক-বালিকা নামল গাড়ি থেকে। স্টেশনের দিকে নয়, তারা নামল উল্টোদিকে—যেদিকে প্লাটফর্ম নেই। ওরা কি টিকিট করে নি? বোধহয় তাই।

কিন্তু এসব ভাবনা আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। তার চেয়ে ঐ আগন্তুকদের দেখা যাক্। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই পরনে রঙীন পোশাক। জনকয়েকের কোমরে লম্বা তরোয়াল। মনে হচ্ছে এরা বরযাত্রী। বিয়ে করতে আসার সময়ও রেলের টিকিট কাটছে না!

রেল-লাইনের ধারে একটা বড় গাছের ছায়ায় কয়েকটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—টায়ারের চাকার বেশ মজবুত গাড়ি। গরুগুলিও বড় বড়। বরযাত্রীর দল সেই গাড়িগুলোতে চেপে বসলেন। গাঁয়ের মেটেপথ বেয়ে গো-যানের শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। আমাদের রেলগাড়িও চলতে শুরু করল।

"দাদু কেমন আছেন?" বিউটি আমাদের খোপে আসে, এসে আমার পাশে বসে। ভারি শান্ত সাহাবাবুর এই ষোড়শী ভাইঝিটি। ছোটখাটো শ্যামবর্ণা সুশ্রী তরুণী। গত বছর হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে কলেজে পড়ছে।

দাদা আমার 'গারো পাহাড়ের পাঁচালি' পড়ছিলেন। তিনি বই থেকে মুখ তুলে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, "এতক্ষণে বুঝি গিন্নীর কর্তার

কথা মনে পড়ল?"

আমরা সবাই হেসে উঠি। বিউটি ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "দাদু, ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!"

দাদা তাঁর গাড়ির গিন্নাকে আর ক্ষেপাতে সাহস পান না। স্বাভাবিক স্বরে বলেন, "ভাল আছি, খুব ভাল।"

বিউটি প্রসঙ্গ পালটায়। আমাকে বলে, "মামু, আজ মহাভারতের গল্প হবে না?"

আরে তাই তো! কথাটা যে ভুলেই গিয়েছিলাম। বিউটিকে বলি, "সরকারদাকে জিজ্ঞেস কর।"

সরকারদা পরের খোপে। বিউটি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "ও কাকু, আজ মহাভারতের গল্প বলবেন না?"

"বলব বৈকি।" সরকারদা উত্তর দেন।

"তাহলে আসুন।"

"ওখানে আসব?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" বৌদি বলেন, "তুমি ওখানেই যাও, আমি বইটা পড়ছি।" তিনি আমার 'গঙ্গাসাগর' পড়ছেন। ভাবতে ভাল লাগছে —আমার বই পড়বার জন্য বৌদি মহাভারতের কাহিনী শুনতে চাইছেন না। জানি না অন্য কোন লেখক এভাবে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন কি না।

"ঘোষদা, একটু প্রসাদ ছাড়ুন।" অমিয়বাবু হাত বাড়ান।

আমি নস্যির কৌটোটা তাঁর হাতে দিই।

সরকারদা এসে অমিয়বাবুর পাশে বসেন। ভদ্রলোক কানে কম শোনেন, সুতরাং তাঁর পাশে না বসলে সরকারদাকে বড্ড চেঁচাতে হয়।

"কাল যেন কতটা হয়েছিল?" সরকারদা প্রশ্ন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিউটি উত্তর দেয়, "জরাসন্ধ-বধের পরে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন।"

"ও হ্যাঁ।" সরকারদা একবার থেমে শুরু করেন, "তারপরে মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই রাজসূয় যজ্ঞের প্রয়োজনে সহদেবের দিগ্বিজয়ের সময়। দিগ্বিজয়ের পথে সহদেব দ্বারকায় গিয়ে

কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পর্কে খবরাখবর দিয়ে এসে-ছিলেন। সেই সংবাদ অনুসারে চরাচর-শ্রেষ্ঠ ভূতভাবন ভগবান্ সনাতন বাসুদেব যথাসময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পুরোহিত ধৌম্য এবং পঞ্চপাণ্ডব সসম্মানে তাঁকে যজ্ঞশালায় বরণ করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—বাসুদেব! কেবল তোমারই অনুগ্রহে আমি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর, তোমারই প্রসাদে আমি আজ অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি। এখন আমি রাজসূয় যজ্ঞ করে আমার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদের দান করতে চাই। তুমি আমাকে যজ্ঞ আরম্ভ করার অনুমতি দান কর।

"শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—আপনি নৃপশ্রেষ্ঠ, আপনি সম্রাট হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করবেন, আমি তা পালন করব।

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, বসুপুত্র পৈল ও ধৌম্য প্রভৃতি বেদবেদান্তপারগ পণ্ডিতদের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হল। একে একে ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ যজ্ঞস্থলে এলেন। এলেন দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ। এলেন বঙ্গ কলিঙ্গ মালব দ্রাবিড় সিংহল ও কাশ্মীরের রাজারা। এলেন বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব প্রভৃতি যাদবগণ। এলেন বিরাটরাজ ও শিশুপাল এবং আরও অনেকে।

"যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেককে পরম সমাদরে বরণ করলেন। দুঃশাসনের ওপর তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ভার পড়ল। অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবার দায়িত্ব দেওয়া হল। সঞ্জয় রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন আর ভীষ্ম ও দ্রোণ সবকিছু দেখাশোনা করতে থাকলেন।

"অবশেষে অভিষেক দিবসে অর্ঘ্যদানের সময় উপস্থিত হল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আচার্য, ঋত্বিক, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং

প্রিয়ব্যক্তি এই ছ'জনকে প্রথম অর্ঘ্য দাও। তারপরে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান কর।

"—তিনি কে? যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভীষ্ম উত্তর দিলেন—জ্যোতিষ্কের মধ্যে যেমন ভাস্কর, তেমনি মনুষ্য-সমাজে কৃষ্ণ। তেজ বল ও পরাক্রম সর্ববিষয়েই শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তাঁর আগমনে আমাদের এই সভা উদ্ভাসিত। অতএব তাঁকেই অর্ঘ্য প্রদান কর।

"ভীষ্মের আদেশে সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করলেন। বাসুদেব সানন্দে তা গ্রহণ করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই শিশুপাল কিন্তু প্রতিবাদ জানালেন। কৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার জন্য তিনি ভীষ্মকে যার-পর-নেই অপমান করলেন। ভীম রেগে গেলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলে কৃষ্ণই ওকে হত্যা করবে, কারণ শিশুপাল কৃষ্ণের বরে অন্যের অবধ্য। কৃষ্ণ তার পিসী, শিশুপালের মা দেবী যাদবীকে কথা দিয়েছেন যে তিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করবেন। আজ তা পূর্ণ হল, সুতরাং একটু ধৈর্য ধারণ কর।

"চেদিপতি শিশুপাল আবার বাসুদেবকে বললেন—জনার্দন, আজ আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। এস, তোমার প্রিয়সখা পাণ্ডবদের সামনেই তোমাকে যমালয়ে পাঠাই।

"কৃষ্ণ শান্তস্বরে সমবেত ভূপতিদের বললেন এই দুরাচার শিশুপাল আমার পিসতুতো ভাই হয়েও সর্বদা আমাদের ক্ষতি করেছে। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে সে একবার দ্বারকা দগ্ধ করেছে। সেবারে ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্বতে বিহার করছিলেন, তখন এই পাপিষ্ঠ তাঁর বহু অনুচরকে হত্যা করেছিল। সে আমার বাবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব চুরি করেছিল। এই দুরাত্মা সৌবীর দেশগামিনী বভ্রুপত্নী এবং নিজের মামাতো বোন বিশালরাজের কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করেছে। এমন কি রুক্মিণীর দিকে পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছিল। সে আমার অনুরক্ত জেনেও তাঁকে বিয়ে করতে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমার স্ত্রী হবার পরেও একবার সে

রুক্মিণীকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। আজ আপনাদের সকলের সামনে শিশুপাল আমাকে দুঃসহ অপমান করেছে। আমি ওর একশো অপরাধ ক্ষমা করেছি, কিন্তু আর ওকে ক্ষমা করব না। দেখুন, আপনাদের সকলের সামনেই আমি ওকে সংহার করছি।

"কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অরাতিনিসূদন মধুসূদন সুদর্শন-চক্রের সাহায্যে চেদিপতি শিশুপালের শিরশ্ছেদ করলেন। তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাঁর শরীর থেকে সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ নির্গত হয়ে কমললোচন কৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গেল।..."

"হরিবোল, জয় হরি!..."

অমিয়বাবুর আকস্মিক হরি-বন্দনার জন্য একবার থামতে হয় সরকারদাকে। তারপরে একটু হেসে তিনি কাহিনী শেষ করেন, "যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমার্জুন ও নকুল সহদেব শিশুপালের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। যথাসময়ে রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হল। কুন্তী দ্রৌপদী সুভদ্রা ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন।"

পাঁচ

সকাল সাড়ে ন'টায় ট্রেন বীরামগাঁম পৌঁছল। ব্রডগেজ এবং মিটারগেজ উভয় লাইনেরই বেশ বড় জংশন। এখান থেকে গাড়ি যায় বরোদা-আনন্দ-আমেদাবাদ এবং ভবনগর-রাজকোট-ওখা। আমরা মেহসানা থেকে ৬৫ কিলোমিটার এসেছি। হাওড়া-বম্বে মেল 'ভায়া' নাগপুরের সঙ্গে এখানকার জন্য একখানি বগি থাকে। আগে কলকাতা থেকে গুজরাটের যাত্রীরা সাধারণতঃ সেই বগিতে চেপে বসতেন। রওনা হবার তৃতীয় দিনে এখানে পৌঁছতেন। গত ২রা অক্টোবর (১৯৭৫) থেকে একটি সপ্তাহিক হাওড়া-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণ চালু হয়েছে। হাওড়া থেকে আমেদাবাদ ২,০৯০ কিলোমিটার পথ যেতে ট্রেণটির ৪৬ ঘণ্টার মতো সময় লাগছে।

আর আমরা রওনা হবার তেরোদিন বাদে বীরামগাঁম এলাম।

আমরা যে পর্যটক, দেখতে দেখতে পথ চলছি। ইতিমধ্যে দিল্লী মথুরা আগ্রা জয়পুর আজমীর চিতোরগড় উদয়পুর ও আবু-রোডে নেমেছি। গতকাল সকালে দ্বারকা রওনা হয়েছি।*

দিল্লী ছাড়ার পরে আর এত বেশি সময় একসঙ্গে গাড়িতে থাকি নি। বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গিয়েছে। তাই ম্যানেজারের সঙ্গে নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। ম্যানেজার স্টেশন-মাস্টারের অফিসে যাচ্ছে। জংশন স্টেশন এলেই ওকে কর্মতৎপর হতে হয়। শুধু গাড়ি কাটানো কিংবা জোড়ানো নয়, তার পরেও জল আলো পাখা এবং গাড়ি পরিষ্কার করানোর সমস্যা।

ম্যানেজার কিন্তু অন্য কথা বলে, "বইখানি বেশ ভাল লাগছে।"

"কোন্ বই?" আমি বুঝতে পারি না।

"আপনার বই—উত্তরস্যাং দিশি।"

চমকে উঠি। তাহলে কি ধরা পড়ে গেলাম! ঐ বইতে যে আমার ছবি রয়েছে! তাহলেও কোনমতে প্রশ্ন করি, "আমার বই?" কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকায়। একবার চোখাচোখি হয়। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, "না, মানে আপনি যে বইখানি কল্পনাদিকে পড়তে দিয়েছিলেন, শঙ্কু মহারাজের বই।"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সহাস্যে জিজ্ঞেস করি, "বইখানি ভাল লাগছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, এমনিতেই ওঁর লেখা আমার ভাল লাগে, তার ওপর চাম্বার দিকে যাওয়া হয় নি, দেখা হয় নি মণিমহেশ।"

"কুলু-মানালী গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানীর ট্রিপ হয়।" একবার থামে ম্যানেজার। তারপর বলে, "আমাদের মালিক ফকিরবাবু তো আপনার বন্ধু।..."

"কেমন করে জানলেন?"

"বারে! হাওড়ায় গাড়ি ছাড়ার আগে তিনি যে আপনাকে

---

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' বইখানি দ্রষ্টব্য।

দেখিয়ে আমাকে বলে গেলেন—ঐ ভদ্রলোক আমার বিশেষ বন্ধু। ওঁর দিকে একটু স্পেশাল কেয়ার নিও ”

ফকিরবাবু অনুরোধ রক্ষা করেছেন, নিজের কর্মচারীদের কাছে পর্যন্ত আমার পরিচয় প্রকাশ করেন নি। অথচ আমার প্রতি যাতে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হয়, সে ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন।

পাঁচু প্রস্তাবটি পেশ করে, “ঘোষদা, কলকাতায় ফিরে ফকিরবাবুকে বলুন না মণিমহেশ যাত্রার ব্যবস্থা করতে!”

“বেশ, বলব।”

“প্লীজ...”

গাড়ীতে ফিরে দেখি স্টেশনের হৈ-চৈতে অনেকেরই দিবানিদ্রা টুটে গিয়েছে। তারা অত্যন্ত বিরক্ত। কিন্তু তাসাড়ুদের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। সবচেয়ে বিস্ময়কর উকিলবাবু সামন্তবাবু ও অমিয়বাবুর সঙ্গে আজ ঠাকুরমশায়ও তাসের আড্ডায় বসে গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তিনি উকিলবাবুর সঙ্গে তর্ক করছেন। ওঁরা ব্রিজ খেলছেন।

খেলা নয়, আমি ভাবি ঠাকুরমশায়ের কথা। দীর্ঘকায় প্রৌঢ়। গায়ের রঙটি ফর্সা। বড় বড় চোখ। উন্নত নাসিকা। বেশ বোঝা যায় যে তিনি যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন। খুব কম কথা বলেন। ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরের লোক। সেখানেই থাকেন। স্কুল-মাস্টারী করতেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। তবে এখনও প্রাইভেট ট্যুশানী করেন। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলেটি কলকাতায় একটা রাজ্য সরকারী অফিসের কেরানী, মেসে থাকে।

ঠাকুরমশায়ের মথুরা-বৃন্দাবন ও দ্বারকা দর্শনের ইচ্ছা বহুদিনের। কিন্তু কৃষ্ণের রাজপুরী যে কৃষ্ণনগর থেকে বহুদূর। দর্শন করতে অনেক টাকার দরকার।

অবসরপ্রাপ্ত দরিদ্র স্কুলমাস্টার অত টাকা পাবেন কোথায়?

ছেলে কিন্তু একবারও সে-কথা ভাবে নি। গতবার পুজোর সময় বাড়ি এসে বাপ-মার মনের ইচ্ছা জানার পর থেকেই সে তাঁদের দ্বারকা পাঠাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। কলকাতায় ফিরে

গিয়েই চিঠি লিখেছে বাড়ির পেছন দিকে যে খালি জমিটুকু আছে, পত্রপাঠ খদ্দের দেখে বিক্রি করে দাও। আশা করি, হাজারখানেক টাকা পেয়ে যাবে। বাকি টাকা আমি কো-অপারেটিভ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করছি। আগামী ফেব্রুয়ারীতে কুণ্ডু স্পেশালের গাড়ি যাচ্ছে, তোমরাও যাচ্ছ সেই সঙ্গে। আমি ডিসেম্বরে আসছি।

ছেলে কোন কথা শোনে নি। বাধ্য হয়ে ঠাকুরমশায় বসতবাড়ির খালি জমিটুকু বিক্রি করেছেন, ছেলেও ধার করেছে। সে কুণ্ডু স্পেশালের টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে জামা-কাপড় জিনিসপত্র ও পথখরচ নিয়ে ঠাকুরমশায় কৃষ্ণনগর থেকে সস্ত্রীক কলকাতায় রওনা হয়েছেন। শেয়ালদা পৌঁছেও গিয়েছিলেন ঠিকমত। কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা চাপিয়ে নিজে বেতের ঝুড়িটা হাতে নিয়েছেন। কুলির পেছনে পথ চলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসেছেন। শেডের তলায় একটা জায়গায় মালপত্র রেখে কুলিভাড়া মিটিয়েছেন। তারপর স্ত্রীকে বিছানার ওপর বসে থাকতে বলে ছেলেকে ফোন করতে গিয়েছেন। কোন্ ট্রেনে তাঁরা আসবেন ঠিক না থাকায় ছেলে তাঁকে শেয়ালদা পৌঁছে অফিসে ফোন করতে বলেছিল। বলেছিল—ফোন পেলে আধঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে গিয়ে আমি তোমাদের মেসে নিয়ে যাব।

ফোন করে ফিরে আসতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন—খোকাকে পাওয়া গেল?

—হ্যাঁ। এখুনি আসছে। বলল, কাল নাকি আমাদের গাড়ি ছাড়ছে না, পরশুদিন ছাড়বে।

—কেন?

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠেন ঠাকুরমশায়—ট্রাঙ্ক···আমাদের ট্রাঙ্ক কোথায় গেল!

স্ত্রী বিছানার ওপর থেকে উঠে দাঁড়ান। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকান। বলেন—এই তো আমার ঠিক পেছনে, এখানে ট্রাঙ্কটা ছিল। কোথায় গেল? তিনি কেঁদে ফেলেন।

ঠাকুরমশায়ের চোখদুটিও অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। দুজনের যাবতীয়

জামা-কাপড় ও পথখরচ প্রায় আট শ' টাকা ছিল ঐ ট্রাঙ্কে। সারাজীবন যিনি সত্য পথে থেকেছেন, কোনদিন কাউকে ঠকান নি, তাঁর কেন এমন সর্বনাশ হল! আর প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল স্টেশনে এমন রাহাজানি কেমন করে সম্ভব?

না, স্টেশনের প্রহরীদের কেউ তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি, বরং সেই 'কেয়ার টেকার'-এর দল 'কেয়ারলেসনেস'-এর জন্য ঠাকুরমশায়ের স্ত্রীকেই তিরস্কার করেছে। অগণিত যাত্রীদের মধ্যে কেউ সেই রেল-পুলিসদের বলে নি—তোমাদের কর্তব্যহীনতার জন্যই এখানে এমন ঘটনা হামেশা ঘটছে এবং তোমরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে অনভিজ্ঞ যাত্রীদের এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পার।

ঠাকুরমশাই ঠিক করেছিলেন যাত্রা বন্ধ করবেন। কিন্তু ছেলে সেকথা শোনে নি। বলেছে—তুদিন সময় যখন পাওয়া গেছে, একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

ঠাকুরমশাই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, কিন্তু ছেলে তার কর্তব্যে অবহেলা করে নি। কোথা থেকে যেন শ' চারেক টাকা যোগাড় করেছে। মাকে তুখানি শাড়ি, তুটি শায়া ও তুটি ব্লাউজ কিনে দিয়েছে। বাকি টাকাটা দিয়ে বলেছে—সব জায়গায় সব কিছু দেখতে পারবে না, কিন্তু মথুরা বৃন্দাবন ও দ্বারকায় পথ-খরচ এতেই হয়ে যাবে। টাকাটা সব সময় কোমরে বেঁধে রেখো। সে বাপকে তার নিজের তুখানি ধুতি ও একটা পাঞ্জাবি দিয়ে দিয়েছে।

মা-বাপ ছেলের দেওয়া সেই জামা-কাপড় পরেই তীর্থদর্শন করছেন। তীর্থস্থান ছাড়া আর কিছু দেখতে পারছেন না। কারণ কুণ্ডু কোম্পানী আমাদের রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন। তারপর সব খরচ আমাদের। আমরা কোথাও সবাই মিলে একটা বাস ভাড়া করছি, কোথাও টাঙ্গায় করে দর্শন করছি। সব দেখতে হলে ওঁদের তুজনের প্রায় শ' আটেক টাকার প্রয়োজন ছিল। কাজেই ওঁরা নামতে পারেন নি দিল্লী আগ্রা চিতোরগড় উদয়পুর ও আবু-রোডে। কিন্তু দর্শন করেছেন মথুরা বৃন্দাবন অম্বর পুষ্কর নাথদ্বার ও একলিঙ্গজী। দর্শন করবেন প্রভাস ও দ্বারকা—পূর্ণ হবে ভক্ত-

ব্রাহ্মণের মনস্কামনা।

হাওড়ায় গাড়ি ছাড়বার পর থেকেই ঠাকুরমশায়কে দেখে এসেছি শান্ত শিষ্ট ও স্বল্পবাক্ মানুষ। শেয়ালদায় ট্রাঙ্ক চুরির কথাও তিনি বলেন নি, বলেছেন তাঁর স্ত্রী। ঠাকুরমশায় গাড়িতে সাধারণতঃ শুয়েই থাকেন। আজই দেখছি তাঁর অন্য রূপ। তিনি শুধু উঠে বসেন নি, তাসের আড্ডায় যোগ দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বচসায় পর্যন্ত অংশ নিচ্ছেন।

কেন তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন? দ্বারকা নিকটবর্তী হচ্ছে বলে? ভগবৎ দর্শন আসন্ন বলে কি ভক্ত এমন পুলকিত?

ম্যানেজার জানাল, অনেক চেষ্টা করেও সে আবু-রোডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। শ্রীর কোন খবর পাওয়া গেল না আজ। আমেদাবাদে পৌঁছবার আগে আর বোধহয় পাওয়াও যাবে না। আমরা এখন ওদের থেকে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি।

একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল। আর তার পরেই কৃষ্ণকথার আসর বসল। তাসের আড্ডা ভেঙে গিয়েছে। তাঁদেরও কয়েকজন আমাদের আসরে যোগ দিলেন।

সরকারদা শুরু করেন, "শিশুপাল-বধের পরে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই দ্বৈতবনে বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে। কিন্তু তার আগে সভাপর্বের ছেষট্টি অধ্যায়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণের সময় কৃষ্ণের উল্লেখ আছে।......"

"হ্যাঁ, কৃষ্ণ অদৃশ্য থেকে তাঁকে কাপড় যুগিয়েছিলেন।" বিউটি মাঝখান থেকে বলে বসল।

সরকারদা মৃদু হেসে বলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণার লজ্জা নিবারণ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিন ভুবনেশ্বর কেশবের হয়ে মহাত্মা ধর্ম অন্তরাল থেকে যাজ্ঞসেনীকে কাপড় যুগিয়েছিলেন। দুঃশাসন বহু চেষ্টা করেও তার ভ্রাতৃবধূকে প্রকাশ্য সভায় বিবসনা করতে পারে নি।"

"অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সেদিন দুর্যোধনের চক্রান্ত, শকুনির পাশা খেলা এবং দ্রৌপদীর অপমানের কথা জানতে পেরেও ইন্দ্রপ্রস্থে আসতে পারেন নি।"

"কারণ ?" অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "তখন তিনি শাল্বের সৌভ-নগর বিনাশে ব্যস্ত ছিলেন।"

"একটু খুলে বলুন না কাকা !" বিউটি ফরমাশ করে।

সরকারদা বলে চলেন, "তুমি জান যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন এবং তখুনি তিনি শিশুপালকে সংহার করেন। শিশুপাল ছিলেন সৌভ-রাজ শাল্বের অতিশয় প্রিয়পাত্র। তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করে যাদবদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম সহ প্রায় সমস্ত যাদব-বীর তখন ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। তাহলেও উপস্থিত যাদবরা তাঁকে যথাসাধ্য বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেন নি।

"কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরেই শুনতে পেলেন সব। তিনি তৎক্ষণাৎ মহাদেবকে প্রণাম করে চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে সৌভ-নগর যাত্রা করলেন। তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে শাল্বকে সমরে আহ্বান জানালেন। একে তো তখন সৌভ-নগর ছিল প্রায় এক ক্রোশ উঁচুতে, তার উপরে শাল্ব ছিলেন মায়াবী। শাল্ব সেখানে বসেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেও কৃষ্ণ যখন সুবিধা করতে পারলেন না, তখন তিনি দানবান্তকারী দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র এবং অরাতিকুলবিমর্দন সুদর্শন-চক্র ব্যবহার করলেন। সুদর্শন প্রথমে সৌভ-নগরকে দ্বিখণ্ডিত করে মাটিতে ফেলে দিল, তারপরে শাল্বকে নিহত করল।"

"সৌভ-নগর এক ক্রোশ উঁচুতে ! ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কাকা !" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞেস করে, "সৌভ তো একটা জনপদ ?"

"না। মহাভারতের বর্ণনা পড়ে মনে হয় সৌভ একটা আকাশ-যান, মানে বিমান।" সরকারদা উত্তর দেন।

"তখনকার দিনেও এরোপ্লেন ছিল ?"

"রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে তো মনে হয় ছিল। কিন্তু সেকথা

থাক্, এবারে আমরা আসল কথায় আসি।"

"ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে চার ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসী হলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তাঁরা প্রথমে এলেন কাম্যবনে। সেখানে সঞ্জয় ও বিদুর তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে তাঁরা দ্বৈতবনে এলেন। এদিকে শাল্বকে নিহত করে দ্বারকায় ফিরেই কৃষ্ণ শুনতে পেলেন সব। দুঃখসন্তপ্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন দৈতবনে। পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখে তিনি দুর্যোধনদের ওপর খুবই রেগে গেলেন। যুধিষ্ঠিরকে বললেন—পৃথিবী অবশ্যই দুরাত্মা দুর্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনের রক্ত পান করবে। আমরা এখুনি ওদের পরাজিত করে আপনাকে সিংহাসনে বসাবো। আমরা দুযোধনের অনুগত নৃপতিদেরও ক্ষমা করব না, কারণ যে ঘৃণিত লোকের অনুগামী হয় সেও বধ্য আর তাই সনাতন ধর্ম।

"অমিততেজা কেশবকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে পার্থ প্রমাদ গণলেন। তিনি কৃষ্ণকে শান্ত করবার জন্য বলতে থাকলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার তো এমন ক্রুদ্ধ হওয়া সাজে না। তুমি না যত্রসায়ংগৃহ মুনি হয়ে দশ হাজার বছর গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করেছিলে, কেবল জল পান করে এগারো বছর পুষ্করে বাস করেছিলে, উর্ধ্ববাহু হয়ে বদ্রীনাথে শুধু বায়ু ভক্ষণ করে একপায়ে একশ' বছর দাঁড়িয়ে ছিলে? যজ্ঞের সময় তুমিই তো উত্তরীয় বস্ত্র-বিবর্জিত হয়ে সরস্বতী তীরে বারো বছর কাটিয়েছিলে। মহামুনি ব্যাস আমাকে বলেছেন লোকপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, কারণ তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত। তুমি তপোনিধান ও নিত্যস্বরূপ।

"তুমি নরকলেবর পরিগ্রহ করে মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হলেও তুমিই নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, ধর্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দশদিক, অজ, চরাচরগুরু এবং স্রষ্টা। তুমি দেবমাতা অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে ইন্দ্র-কনিষ্ঠ বিষ্ণু বলে বিখ্যাত হয়েছ। তুমি বালক হয়েও তিন পায়ে পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গকে আবৃত করেছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ

করে প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ নিষ্কণ্টক করেছ, রুক্মিরাজকে পরাজিত করে তাঁর বোন রুক্মিণীকে সহধর্মিণী করেছ। অবশেষে তুমি দ্বারকা নগরীকে আত্মসাৎ করে মহাসাগরের অন্তর্গত করবে।

"হে মধুসূদন, তুমি নৃশংসতা কপটতা ক্রোধ ও মাৎসর্যের বশীভূত নও। তুমি তো কখনও মিথ্যা কথা বলো না। প্রলয়কালে তুমিই তো মীনরূপে বেদকে রক্ষা করেছিলে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা তোমারই নাভিমূল থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। তুমিই তোমার ললাট থেকে ত্রিলোচনকে সৃষ্টি করে মধু-কৈটভকে দগ্ধ করেছিলে। তুমি শৈশব ও কৈশোরে বলদেবের সঙ্গে ব্রজে ও মথুরায় যে লীলা করেছ, তা কেউ কোনকালে করতে পারেন নি, পারবেনও না। সুতরাং তোমার তো এমন ধৈর্য হারালে চলবে না কেশব, তুমি শান্ত হও।

"অর্জুনের কথায় কৃষ্ণ যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি শান্তস্বরে অর্জুনকে বললেন—হে পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা নর-নারায়ণ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। সুতরাং তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

"দ্রৌপদী চোখের জল ফেলে কৌরব-সভায় তাঁর অপমানের কথা কৃষ্ণকে জানালেন। কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যারা সেদিন তোমাকে অপমান করেছে, তোমার স্বামীরা তাদের সবাইকে হত্যা করবে। আজ তুমি যেমন চোখের জল ফেলছ, তখন তাদের স্ত্রীরাও এমনি অশ্রুপাত করবে এবং তাদের সে অশ্রুধারা কোনদিন শুকোবে না। আমি সত্য করে বলছি, তুমি রাজরাণী হবে। যদি কখনও আকাশ ভেঙে পড়ে, হিমাচল শীর্ণ হয়, সমুদ্র শুকিয়ে যায় কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, তাহলেও এই সত্য মিথ্যে হবে না।

"দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তিনি তাঁকে পাশা খেলার সময় উপস্থিত না হতে পারার কারণ জানালেন, শাল্ব-বধের কাহিনী শোনালেন। বললেন—আমি তখন দ্বারকায় থাকলে কিছুতেই আপনাকে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে দিতাম না। আপনি তো জানেন যে স্ত্রী, দ্যুত, মৃগয়া এবং সুরায় আসক্ত হলে মানুষ অধঃপাতে যায়। আমি সেদিন উপস্থিত থাকলে হয় দুর্যোধন মারা

যেত, না হয় পাশা খেলা বন্ধ হত। যাকৃগে, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখন ফলভোগ করতেই হবে। কারণ বাধ একবার ভেঙে গেলে বন্যা রোধ করা খুবই কঠিন কাজ।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুভদ্রা ও অভিমন্যু সহ দ্বারকায় ফিরে এলেন।"

থামলেন সরকারদা। সত্যানন্দা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, বনবাসের সময় দ্রৌপদীর ছেলেরা কোথায় ছিলেন?"

"কখনও তাঁদের মামাবাড়িতে, কখনও দ্বারকায়। তবে তারা দ্বারকায় থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। সুভদ্রা তাদের খুবই যত্ন করতেন। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও অভিমন্যু তাদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন।"

"তারপরে কৃষ্ণ কি করলেন কাকু?" এবারে বিউটির প্রশ্ন।

মৃদু হেসে সরকারদা বিউটিকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান যে বনবাসের সময় দ্রৌপদী ও পঞ্চ-পাণ্ডব ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছিলেন?"

বিউটি বেণী দুলিয়ে মাথা নাড়ে।

সরকারদা বলতে থাকেন, "তীর্থ-পরিক্রমায় বেরিয়ে তাঁরা মহর্ষি লোমশের সঙ্গে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন।"

"আমরা প্রভাসে যাব না মামু?"

"হ্যাঁ।" আমি বিউটির প্রশ্নের উত্তর দিই। বলি, "আমরা বেট দ্বারকা দেখে প্রভাস যাব।"

সরকারদা আবার শুরু করেন, "খবর পেয়ে বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন শাম্ব সাত্যকি এবং অন্যান্য যাদবরা দ্বারকা থেকে ছুটে গেলেন সেখানে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের পোশাক এবং চেহারা দেখে তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন। বলরাম ও সাত্যকি দুর্যোধনের ওপর খুবই রেগে গেলেন। সাত্যকি বললেন—আমি বলদেব কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন যাঁদের সহায় তাঁরা কেন এমন ভিক্ষুকের মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াবে? চল, আমরা আজই সসৈন্যে হস্তিনাপুর যাত্রা করি। বৃষ্ণি ভোজ এবং অন্ধকদেরও সঙ্গে নিই। ধৃতরাষ্ট্রদের নিশ্চিহ্ন করে মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করি। তা না করলে আমরা

কর্তব্যহীনতার পরিচয় দেব।

"সাত্যকির কথায় উত্তেজিত যাদবরা সবাই কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। একটুকাল নীরব থেকে বাসুদেব সাত্যকিকে লক্ষ্য করে সবিনয়ে বললেন—আপনি যা বললেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। সত্যই ধৃতরাষ্ট্রদের ধ্বংস করে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের পরমতম কর্তব্য। কিন্তু আপনারা তো ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জানেন। তিনি কিছুতেই অন্যের জয়লব্ধ রাজ্য গ্রহণ করবেন না। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং পাণ্ডবরাই তা পূর্ণ করবে। আপনারা শুধু আর কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

"যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণকেই সমর্থন করলেন। তিনি যাদবদের বললেন—তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড়ই আনন্দ পেলাম। এখন তোমরা দ্বারকায় ফিরে যাও। আমরাও যাত্রা করি। সুখের দিন ফিরে আসবে। তখন আবার দেখা হবে।" সরকারদা চুপ করলেন।

বিউটির বোধহয় তাঁকে থামতে দেবার ইচ্ছে নেই। তাই সে বলে বসল, "আচ্ছা কাকু, পাণ্ডবদের জব্দ করবার জন্য দুর্যোধন তো স-শিষ্য দুর্বাশাকে এই কাম্যবনেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"সে কখন?"

"অনেক পরে। বনপর্বের দু-শ' বাষট্টি অধ্যায়ে।"

"দু-শ' বাষট্টি!" বিউটি বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" সরকারদা বলেন, "কাশীদাসী মহাভারতে আদিপর্ব সবচেয়ে বড় হলেও মূল-মহাভারতের আঠারটি পর্বের মধ্যে শান্তিপর্ব হল সবচেয়ে বড়, তারপরেই বনপর্ব। তিনশ' চোদ্দটি অধ্যায় আছে বনপর্বে। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা দীর্ঘকাল কাম্যবনে কাটিয়েছেন। তীর্থযাত্রার আগে ও পরে। দুর্বাশা এসেছিলেন একেবারে শেষদিকে, আমরা এখনও সেখানে আসি নি। শ্রীকৃষ্ণ দু-বার কাম্যবনে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।"

"কাম্যবনটা কোথায় ?"

"এই তো মুশকিলে ফেললে। মহাভারতের মধ্যে আবার ভূগোলের প্রশ্ন কেন ?" সরকারদা হাসতে হাসতে বলেন।

বিউটি লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোয়। বেচারীর কৌতূহলটা নিবৃত্ত করা যাক্। আমি বলি, "কাম্যবন বর্তমান রাজস্থানের ভরতপুর জেলার কামাঁ তহশিল। এখন আর বন নেই, ছোট শহর। দূরত্ব ভরতপুর থেকে ৩৫ মাইল। কাম্যবন শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের অন্যতম। ভক্ত-বৈষ্ণবরা বন-পরিক্রমার সময়ে কাম্যবনে রাত কাটান। মথুরা থেকে বাসে করেও কাম্যবনে যাওয়া যায়।"

"শঙ্কু মহারাজের 'মধু বৃন্দাবনে' বইতে কাম্যবনের কথা পড়েছি।" আমি থামতেই কল্পনাদি বলে ওঠেন। আবার আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে থাকি।

কল্পনাদি বলে চলেছেন, "কাম্যবনে অনেক দর্শন আছে—বিমলাকুণ্ড ও ধর্মরাজের কুয়ো, যেখানে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। আছে কামেশ্বর শিব, রাধাগোবিন্দ ও রাধাগোপীনাথ মন্দির। আছে চরণ-পাহাড়ী, ব্যোমাসুরের গুহা, ভোজনথালী ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলী প্রভৃতি "

থামলেন কল্পনাদি। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রীতিমত ঘেমে গিয়েছি।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে আসি। চোখে-মুখে জল দিই।

বাথরুম থেকে বের হতেই দেখা হয় বড় ঠাকুরমার সঙ্গে। কেন যেন তিনি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুরমা অভিযোগ করেন, "দাদা ছাখি আইজ-কাইল আমাগো একদম ছাখা-শুনা করতে আছো না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। গত কয়েকদিন সত্যই ওঁদের খোঁজ-খবর করতে পারি নি।

ঠাকুরমা আবার বলেন, "একবার চলো না আমাগো জাগায়।"

ওঁদের জায়গা অর্থাৎ গাড়ির অপর প্রান্তে কিচেনের পাশের

খোপটি।

উকিলবাবু ও সামন্তবাবুর খোপ পেরিয়ে ঠাকুরমাদের জায়গায় আসি। মেজ ঠাকুরমা ও ছোট ঠাকুরমাও খুশি হন আমাকে দেখে। তাঁরাও একই অভিযোগ করেন।

বড় ঠাকুরমা বলেন, "দাদা, একটু আচার খাও।"

"এখন থাক্। একটু বাদেই তো চা আসবে।" আমি আপত্তি করি।

"তাহলে একটু চানাচুর খাও।"

এবারে আর আপত্তি করতে পারি না। সীটের পাশে রাখা বোতল ও কৌটোর সারি থেকে একটি কৌটো খুলে তিনি খানিকটা চানাচুর আমার হাতে দিলেন। আগেই বলেছি ঠাকুরমারা অতিশয় পর্যটনপটু। সূঁচ-সুতো থেকে ওষুধ পর্যন্ত যখন যা দরকার, ওঁদের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।

এঁরা সকলেই ব্যবসায়ী পরিবারের বৃদ্ধা বিধবা, সুতরাং স্বচ্ছল অবস্থা। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা হাওড়ায় এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই তাঁরা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। এবং মানুষের প্রয়োজনের যেহেতু কোন সীমারেখা নেই, সেইহেতু জিনিসপত্রগুলোর পরিমাণ একটু বেশি।

"দাদা, একটা লেবেঞ্চুশ খাবা নাকি?" ছোট ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন।

শেষ চানাচুরটুকু মুখের ভেতরে চালান করে দিয়ে বলি, "লজেন্স কিনলেন নাকি?"

"হ।"

"কোথায়?"

"ঐ যে পরশু যেখানে শ্বেত-পাথরের মন্দির ছাখ্‌লাম।"

"মাউন্ট আবুতে?"

ছোট ঠাকুরমা মাথা নাড়েন। তিনি আমার হাতে একটি লজেন্স গুঁজে দেন।

মেজ ঠাকুরমা বলেন, "দাদা, কয়দিন ধরিয়াই তোমারে একটা কথা

কমু ভাবতে আছি। কওয়া আর হইয়া ওঠে নাই।"

"বেশ তো, বলুন না!"

"তুমি তো সব মন্দিরের কথা খাতায় লেইখ্যা লইতে আছো?"

বুঝতে পারছি তিনি আমার ডায়েরী লেখার কথা বলছেন। বলি, "একটু-আধটু লিখে নিচ্ছি আব কি। অনেকেই তো লিখছেন।"

"হ, তা ল্যাখ্‌তে আছে। তোমার ছ্যাখা-ছ্যাখি অনেকেই ল্যাখ্‌তে আরম্ভ করছে।"

ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন। জয়পুরে সেদিন প্রথম যখন পথে বেবিয়ে ডায়েবী লিখতে শুরু করেছিলাম, তখন বেশ কয়েকজন কৌতূহলী সহযাত্রী আমাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করেছিলেন। সবাইকে একই উত্তর দিয়েছিলাম—এটা আমার একটা 'হবি', বেড়াতে বেরুলেই 'নোট্‌স' রাখি।

—কি করবেন এই নোট্‌স দিয়ে?

—বুড়ো বয়সে যখন আর বেড়াবার শক্তি থাকবে না, তখন এগুলো পড়ব বসে বসে।

জানি না সেদিন তাঁরা আমার সে কথা বিশ্বাস কবেছিলেন কিনা। তবে পরের দিন আজমীরে দেখেছি আমার কয়েকজন সহযাত্রী খাতা-পেন্সিল নিয়ে পথে বেরিয়েছেন এবং আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা ডায়েরী লিখছেন। বলা-বাহুল্য সে প্রতিযোগিতা আজও শেষ হয় নি।

এবারে বড় ঠাকুরমা কাজের কথাটি বলেন, "তোমার খাতাব থিকা মন্দিরগুলার নাম আর দর্শনের তারিখ লেইখ্যা এ্যাকটা ফর্দ আমাগো কইরা দেবা?"

"জায়গাগুলার নামও লেইখ্যা দিও।" ছোট ঠাকুরমা যোগ করেন

"বেশ তো, এ আর একটা কঠিন কাজ কি?" আমি বলি, "সব দেখা হোক্, নিশ্চয়ই আপনাদের একটা লিষ্ট আমি করে দেব।"

"বাইচ্যা থাকো বাবা!" প্রায় সমবেত স্বরে ঠাকুরমারা আশীর্বাদ করেন আমাকে।

আর ঠিক তখুনি পাশের খোপ থেকে বাণেশ্বর বলে ওঠে, "ঘোষদা, সীটে চলুন। চা নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি উঠে দাঁড়াই।

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যের একটু পরে ট্রেন রাজকোট পৌঁছল। বেশ বড় জংশন। এখান থেকে ট্রেন যায় ভেরাভল এবং ওখা অর্থাৎ প্রভাস ও দ্বারকা। রাজকোট জেলা জামনগর জেলার পূর্ব-সীমা। দ্বারকা জামনগর জেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। রাজকোট শহর জেলার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত।

বীরামগাম ও রাজকোটের মাঝে আমরা তিনটি জংশন পেরিয়েছি। সুরেন্দ্রনগর, থান ও ওয়ানকানের জংশন। সুরেন্দ্রনগর থেকে ট্রেন যায় ভবনগর।

কিন্তু ভবনগরের কথা থাক্, তার চেয়ে বরং রাজকোটের কথাই ভাবা যাক। রাজকোট ষোড়শ শতাব্দীর শহর। বর্তমান জনসংখ্যা তিন লক্ষের কিছু বেশি। আয়তন পঁচিশ বর্গমাইলের মতো। মহাত্মা গান্ধী তাঁর শৈশবের কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছেন এই শহরে। তিনি যে বাড়িটিতে বাস করতেন, সেটি এখন পুণ্যতীর্থে পরিণত। নাম—'বাপুনো দেলো'।

আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে রাজকোটে। যেমন ওয়েস্ট্‌সন মিউজিয়াম ও রাষ্ট্রীয় শালা। ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই যাদুঘরটি রাজকোটের বিখ্যাত জুবিলী গার্ডেনে অবস্থিত এবং মহাত্মাজীর উপস্থিতিতে ১৯২১ সালে স্থাপিত।

কিন্তু সে-সব কিছুই দেখতে পারব না আমরা। কারণ দেখা তো দূরের কথা ম্যানেজার গাড়ি থেকে নামতে পর্যন্ত দিল না।

আমরা মেহসানা থেকে ২৪৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি। প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা লেগেছে। এখান থেকে দ্বারকা রেলপথে ২১৮ কিলোমিটার, দশ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে আমাদের। আগামীকাল

সকাল আটটা নাগাদ আমরা দ্বারকা পৌঁছব। অতএব দ্বারকা এখনও বহু দূর।

এখানে গাড়ি কাটা কিংবা জোড়া লাগাবার ঝামেলা নেই। ট্যাঙ্কে জল ভরাবার ব্যবস্থা বাণেশ্বরই করে ফেলল। সুতরাং ম্যানেজার নিশ্চিন্তে তাসের আড্ডায় বসে রইল।

না। ম্যানেজার বোধহয় আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারল না। সহসা রমানাথ এসে হাজির হয়েছে। রমানাথ ত্রিপাঠী প্রধান পাচক। সে বড় একটা কিচেন ছেড়ে বাইরে আসে না। একান্ত প্রয়োজন হলে সহকারী গৌড়কে পাঠায়। সুতরাং বিস্মিত হলাম।

শুধু আমরা নই, ম্যানেজারও। সে জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার রমানাথ ?"

"আজ্ঞে গার্ডসাহেব বলছেন গাড়ির ভেতর রান্না করতে পারবে না, স্টোভ নিবিয়ে দাও।"

সর্বনাশ ! রান্না করতে পারবে না কি ! এতগুলো লোক তাহলে খাবে কি ? অথচ এ গাড়িতে কিচেন নেই বলে রান্না করা সত্যই বে-আইনী।

পাঁচু কিন্তু নির্বিকার। সে রমানাথের কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাসের কল্ দিচ্ছে। লোকটা তো অদ্ভুত ! এতবড একটা দুঃসংবাদ শুনেও তাস খেলছে !

ডাকাডাকি শেষ হলে পাঁচু রমানাথের দিকে একবার তাকায়। তারপরে নিজের হাতের তাসের দিকে নজর রেখে জিজ্ঞেস করে, "গার্ডের সঙ্গে ক'জন আছে ?"

"আজ্ঞে দু'জন।"

"বাণেশ্বরকে দিয়ে এক পট চা আর বারোখানা বিস্কুট গার্ডের কামরায় পাঠিয়ে দাও।"

"স্টোভ নেভাব না তাহলে ?"

"না না।" পাঁচু প্রায় ধমকের স্বরে রমানাথকে বলে, "স্টোভ নেভাবে কি ? বরং একটা কাজ......"

"কি ?"

ম্যানেজার নিরুত্তর। সে আবার তাসে ডুবে গিয়েছে। কি একটু ভেবে নিয়ে সে সশব্দে ইশ্‌কাবনের টেক্কাটাকে তুরূপ করে। তারপরে ধীরে-সুস্থে রমানাথের দিকে তাকায়। বলে, "দু' কৌটো চাল বেশি নিও।"

রমানাথ চলে যায়। তাস খেলা চলতে থাকে। পাঁচু যতই নির্বিকার থাক্, আমি মনে মনে একটু চিন্তিত না হয়ে পারি না।

রাজকোট থেকে ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই আবার একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসি। বাণেশ্বর চা-বিস্কুট নিয়ে নেমে যায়। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি।

ছোট স্টেশন, কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তখনও। ব্যাপার কি ? দরজা দিয়ে গলা বাড়াই। না, লাইন ক্লিয়ার রয়েছে। তাহলে গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন ?

পেছনে তাকাতেই কারণটা বুঝতে পারি। আমাদের গাড়ির ঠিক আগেই গার্ডের গাড়ি। গার্ডসাহেব সবুজ আলো হাতে নিয়ে বাণেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন, ড্রাইভারকে আলো দেখাচ্ছেন না।

কথা বোধ হয় শেষ হয়েছে। বাণেশ্বর ফিরে আসছে। এবারে গার্ডসাহেব আলো দেখালেন। গাড়ি চলতে শুরু করে। বাণেশ্বর গাড়িতে উঠে আসে।

দরজা বন্ধ করে বাণেশ্বরকে জিজ্ঞেস করি, "গার্ডসাহেব এতক্ষণ কি বলছিলেন তোমাকে ?"

"রাতে কি রান্না হয়েছে ?"

"তুমি বললে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"তা তিনি কি বললেন ?"

"বললেন—তিন থালি খাবার পাঠিয়ে দিও।"

অন্তর্যামী ম্যানেজারকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে জায়গায় ফিরে আসি।

■। সরকারদাকে ওরা রেহাই দেবে না। আবার কৃষ্ণকে সুথার আ■র বসেছে। আমিও সামিল হই।

সরকারদা বলে চলেছেন, "পাণ্ডবরা তীর্থদর্শন শেষ করে কাম্য বনে ফিরেছেন শুনে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে দ্বারকা থেকে কাম্যবনে পৌঁছলেন। কুশলাদি বিনিময়েব পরে দ্রৌপদী সত্যভামাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কৃষ্ণ এসে বসলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। কথায় কথায় কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ, রাজ্যলাভের চেয়ে ধর্মরক্ষা অনেক বড়। আপনি সত্যপথে থেকে সরলভাবে সেই ধর্মকে রক্ষা করে ইহলোক এবং পরলোক জয় করেছেন। ভোগের ভেতরেও দান সত্য তপ শ্রদ্ধা ক্ষমা ও ধৃতির কথা বিস্মৃত হন নি। নিজের স্ত্রীকে সবার সামনে বিবসনা করার চেষ্টা করতে দেখেও আপনি সেই দুর্বিসহ নৃশংসাচার সহ্য করেছেন। এখন যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে বলুন, আমরা কৌরবকুল নির্মূল করে আপনাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করি। আরেকটি কথা, সেদিন সভায় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার যেন অন্যথা না হয়। আপনি আদেশ করলেই যাদবরা আপনার শত্রুদের বিনাশ করবে।

"যুধিষ্ঠির তখন করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন—হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদের অদ্বিতীয় গতি। বিপদ ও সম্পদে আমরা সর্বাদাই তোমার শরণাপন্ন। - তুমিই আমাদের কর্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞামত আমাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস প্রায় সম্পূর্ণ, তবে এর পরেও এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। তারপরে আমরা তোমার পরামর্শমত কাজ করব।

"ঠিক এই সময় অজর ও অমর মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় সেখানে উপস্থিত হলেন। কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব তাঁকে বললেন—আপনি পাণ্ডবদের কাছে যা কীর্তন করতে এসেছেন, তা কীর্তন করুন।

"রূপগুণ-সম্পন্ন ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয় তখন বিভিন্ন কাহিনী বলে পাণ্ডবদের নানা উপদেশ দান করতে থাকলেন। তিনি তাঁদের

'দ্বি...তি-মহাত্মা-কথন' থেকে শুরু করে কার্তিকের মহিষাসুর সং...পর্যন্ত বহু কাহিনী শোনালেন। বনপর্বের আটচল্লিশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে এই সব কাহিনী ও উপদেশ।"

"আটচল্লিশ অধ্যায়!" বিউটি বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" সরকারদা বলেন, "একশ' চুবাশি থেকে দু-শ' একত্রিশ অধ্যায়। এবারে আমি তার পরের তিনটি অধ্যায় বলছি।"

"বেশ, বলুন।" বিউটি বেণী দুলিয়ে অনুমতি দেয়।

সরকারদা শুরু করেন, "এদিকে সত্যভামা কথায় কথায় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, পাণ্ডবদের তুমি এমন বশ করলে কেমন করে? ব্রত উপবাস স্নান মন্ত্র, কোন ওষুধ কিংবা কামশাস্ত্রের বশীকরণ বিদ্যায়? আমাকে একটু বলে দাও, যাতে আমিও কৃষ্ণকে বশ করতে পারি।

"পতিব্রতা দ্রৌপদী উত্তর করলেন—তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, তোমার তো এমন প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারণ কেবল অসৎ স্ত্রীরাই বশীকরণ বিদ্যার সাহায্য নেয়। যাক্ গে, আমার কথা আমি তোমাকে বলছি, শোন। আমি কাম ক্রোধ ও অহংকার বিসর্জন দিয়ে সর্বদা সপত্নীদের সঙ্গে স্বামীসেবা করি। অভিমান ত্যাগ করে স্বামীদের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করি। তাঁদের সঙ্গে কোনদিন কলহ করি না। কখনও দ্রুতপায়ে চলাফেরা কিংবা কুৎসিত ভাবে বসি না। শত সুন্দর হলেও স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষ গন্ধর্ব, এমনকি দেবতাকে পর্যন্ত মনে স্থান দিই না। আমি সর্বদা গুরুজনদের উপদেশ মনে রাখি। কখনও শাশুড়ীর নিন্দা করি না। অসৎ রমণীদের মতো ব্যবহার কিংবা দুষ্টা স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। আমি সমস্ত গৃহকর্ম নিজেই করি। মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন, আমি তাঁদের পরিচর্যা করতাম। বাড়ির ঝি-চাকরদের দেখাশোনাও আমি নিজেই করতাম। আমি একা রাজকোষাগারের তত্ত্বাবধান করতাম। দিবা-রাত্রি সমান জ্ঞান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে সহচরী করে আমি সর্বদা স্বামীদের আরাধনা করি। কখনও তাদের না খাইয়ে নিজে খাই না। কারণ পতিকে আশ্রয় করে

বেঁচে থাকাই স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম।

"দ্রৌপদীর কথায় সত্যভামা বড়ই লজ্জা পেলেন। বললেন—তুমি বোধহয় আমার ওপর রাগ করছো। আমি কিন্তু কিছু মনে করে কথাটা বলি নি তোমাকে, এমনিই ঠাট্টা করেছি।

"দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন—না না, রাগ করব কেন? তোমার কথায় আমি কিছুই মনে করি নি। যাক্ গে, এবারে স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণের জন্য কয়েকটি অব্যর্থ উপায়েব কথা বলছি। সেগুলি অনুসরণ করলে দেখবে তোমার স্বামী অন্য কোন নারীর দিকে তাকাবেন না পর্যন্ত।

"সত্যভামাও হেসে বললেন—বেশ, বলো।

"দ্রৌপদী বলতে শুরু করলেন—তুমি কৃষ্ণের প্রাত প্রতিদিন অকৃত্রিম-প্রণয় প্রকাশ করে তাঁব বেশভূষা, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেবে। ঘরের বাইরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেই উঠে দাঁড়াবে এবং তিনি ঘরে ঢুকলে তাঁকে বসতে দিয়ে তাঁর সেবা করবে। তিনি দাস-দাসীকে কোন ফরমাস করলে তুমি নিজে সেই কাজ করে দেবে। স্বামী তোমাকে যে-সব কথা বলবেন, তা গোপনীয় না হলেও কাউকে প্রকাশ করবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

"—স্বামীর প্রিয়পাত্রের সেবা-যত্ন করবে, কিন্তু অন্য পুরুষদের সামনে সংযত এবং মৌনী হয়ে থাকবে। প্রদ্যুম্ন এবং শাম্ব তোমার ছেলে হলেও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনও তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করো না। সর্বদা সত্যকুল ও পুণ্যশীলা নারীদের সঙ্গে সখ্যতা করবে এবং ক্রূর কলহপ্রিয় অতিভোজী অসৎ ও চপলাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করবে।

"দ্রৌপদী ও সত্যভামার কথাবার্তা শেষ হবার পরে শ্রীকৃষ্ণ কাম্য-বন থেকে সস্ত্রীক দ্বারকা যাত্রা করলেন।"

"তারপরে মহাভারতে আমরা কখন আবার কৃষ্ণকে দেখতে পাই কাকু?" সরকারদা থামতেই বিউটি জিজ্ঞেস করে।

সরকারদা সহাস্যে উত্তর দেন, "এইবারে তোমার সেই দুর্বাসাকে

জব্দ করবার কাহিনী। দুর্যোধনের অনুরোধে পাণ্ডবদের জব্দ করতে এসে দুর্বাসা নিজেই জব্দ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।”

“বেশ, বলুন।” বিউটি উৎসাহিত।

সরকারদা বলে চলেন, “দশ হাজার শিষ্যসহ মহাযশাঃ দুর্বাসা কাম্যবনে এলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে তাঁকে পরম আদরে বরণ করে করজোড়ে বললেন—আপনারা তাড়াতাড়ি স্নান ও আহ্নিক সেরে আসুন, ইতিমধ্যে রান্না হয়ে যাবে। রমণীরত্ন দ্রৌপদী বিপদে পড়লেন। ঘরে যে কিছুই নেই, কেমন করে তিনি এতগুলো মানুষের অন্ন জোগাড় করবেন। আর না করলেও তো কোন উপায় নেই। দুর্বাসা যে অত্যন্ত অবিবেচক ও ক্রুদ্ধ-স্বভাব।

“নিরুপায় কৃষ্ণা তখন কৃষ্ণ-স্তব করতে শুরু করলেন। বললেন—হে বিশ্বাত্মন, বিশ্বসংহারকারীণ বিপন্নপাল! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরেণ্য, হে অনন্ত, হে পরমারাধ্য পুরাণপুরুষ! আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

“অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি পাশে ঘুমিয়ে-থাকা রুক্মিণীকে কিছু না বলেই দ্বারকা থেকে ছুটে গেলেন কাম্যবনে। দ্রৌপদী তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলতে পারার আগেই কৃষ্ণ বললেন—আগে আমাকে কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

“দ্রৌপদী করুণকণ্ঠে বললেন—আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন তো আর কিছু নেই!

“কৃত্রিম রাগ করে কৃষ্ণ বললেন—দেখো, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, এখন হাসিঠাট্টা ভাল লাগছে না, শিগগীর কিছু খেতে দাও, আচ্ছা, তোমার এঁটো থালাটা নিয়ে এসো দেখি।

“অসহায়া দ্রৌপদী চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই থালা এনে শ্রীকৃষ্ণের সামনে ধরলেন। থালার কোণে কয়েক কণা শাকান্ন শুকিয়ে ছিল। সখীসহায় শ্রীকৃষ্ণ সযত্নে সেই শাকান্ন মুখে দিয়ে বললেন—তোমার অন্নে বিশ্বাত্মা তুষ্ট হল। এখন মেজদাকে বল, ব্রাহ্মণদের খেতে ডাকুক।

"এদিকে দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যরা তখন সবে স্নান সেরে ঘাটে উঠেছেন। হঠাৎ তাঁদের মনে হল পেট ভরে গিয়েছে, ভীষণ খাওয়া হয়েছে। একসঙ্গে সবার ঢেকুর উঠতে থাকল।

"দুর্বাসা প্রমাদ গণলেন। ঢেকুর তুলতে তুলতে তিনি কোনমতে শিষ্যদের বললেন—এ যে দেখছি স্নান করেই পেট ভরে গেল। আর তো কিছু খেতে পারব না আজ। বনবাসী পাণ্ডবদের জব্দ করতে এসে তো ভারী বিপদে পড়ে গেলাম। ওরা ধার্মিক ব্রতধারী তপস্বী ও নারায়ণপরায়ণ। খাবার নষ্ট করার জন্য ওরা যদি একবার আমাদের প্রতি কোপ দৃষ্টিপাত করে, তাহলে যে আমরা ভস্ম হয়ে যাব। এসো আমরা এখান থেকেই পালিয়ে…"

সরকারদাকে থামতে হয়। বিউটি হো হো করে হেসে ওঠে।

বিউটির হাসি থামলে তিনি আবার বলতে থাকেন, "কাজেই ভীম নদীতীরে বহু খোঁজাখুঁজি করেও দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যদের টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। তিনি ফিরে এসে কৃষ্ণকে সশিষ্য দুর্বাসার অদৃশ্য হবার সংবাদ দিলেন।

"কৃষ্ণ তখন পাণ্ডবদের বললেন—তোমাদের বিপদ দেখে পাঞ্চালী আমাকে শরণ করেছিল, আমি তাই ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। দুর্বাসার থেকে আর তোমাদের কোন ভয় নেই। সে তোমাদের তেজে ভয় পেয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। তোমরা ধর্মের অনুগত, অধর্ম কখনও তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। প্রতিকূল অবস্থায় তোমাদের কখনও ভয় পাবার কারণ নেই। এখন তোমরা আমাকে বিদায় দাও।"

"তারপরই বোধহয় আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাই বিরাট রাজসভায় ?"

"হ্যাঁ।" সরকারদা কল্পনাদির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, "আপনারা জানেন অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা বিরাট-রাজবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিরাটরাজার সেনাপতি কীচক সৈরিন্ধ্রিরূপী দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করলেন। ভীম কীচক ও তার ভাইদের হত্যা করলেন।

"কীচিক মারা গিয়েছে শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার প্ররোচনায় দুর্যোধন

সসৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বথামা কর্ণ ও কৃপাচার্য প্রভৃতি সহ বিরাটরাজের গোধন অপহরণ করতে আসেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন কৌরবদের পরাজিত করে বিরাটরাজার গোধন উদ্ধার করেন। পরিচয় পাবার পরে কৃতজ্ঞ বিরাটরাজ অর্জুনকে উত্তরার পানিগ্রহণ করবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু অর্জ্ন সম্মত হলেন না। তিনি বললেন—আমি উত্তরার পিতৃতুল্য। সুতরাং আমার প্রথম পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হবে।

"বিরাটরাজের দূতের কাছে সংবাদ পেয়ে বলরাম সুভদ্রা অভিমন্যু ও তাঁর ভাইদের এবং অন্যান্য যাদবদের নিয়ে বাসুদেব বিরাটনগরে এলেন। খবর পেয়ে দ্রুপদরাজ এবং কাশীরাজসহ পাণ্ডবদের আত্মীয়-স্বজনরাও অনেকেই সেখানে উপস্থিত হলেন। মহাসমারোহে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল।

"বিয়ের পরে পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সেখানে সভা বসল। কৃষ্ণ প্রস্তাব করলেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। অতএব এখন যাতে দুর্যোধন তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়, আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত। আসুন, আমরা সন্ধি-প্রস্তাব সহ কোন ধার্মিক কুলীন ও প্রমাদশূন্য পুরুষকে দুযোধনের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করি।

"বলরাম কৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু সাত্যকি এবং দ্রুপদ যুদ্ধঘোষণার পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রুপদরাজকে বললেন—আপনি বয়সে ও জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দোণ ও কৃপাচায আপনার সখা, ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে যথেষ্ট মান্য করেন। আবার আপনি পাণ্ডবদের পরমাত্মীয়। আমাদেরও একই অবস্থা। আমাদের কাছে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েই সমান। সুতরাং একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে যাতে গৃহযুদ্ধ পরিহার করা যায়। তবে দুর্যোধন যদি একান্তই সন্ধিতে সম্মত না হয়, তাহলে যুদ্ধ করতেই হবে।

"দ্রুপদ তাঁর সভাপণ্ডিতকে দূতরূপে দুর্যোধনের কাছে পাঠাতে সম্মত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বজনসহ দ্বারকায় ফিরে এলেন।"

একবার থামলেন সরকারদা। একটু বাদে আবার বলতে থাকলেন, "এবারে আমি আপনাদের কাছে যে কাহিনীটি বর্ণনা করব, সেটি মহাভারতকার উদ্যোগ পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও অসামান্য, কারণ সেটি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমাদের কাছেও ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সেটি যেখানে সংঘটিত হয়েছিল, আমরা আগামীকাল সেই দেব-রতি দ্বারকায় পদার্পণ করব। যাক্‌গে, এবার মূল কাহিনীতে আসা-যাক্।

"বিরাটনগর থেকে দ্বারকাধীশ দ্বারকায় ফিরে এলেন। দুর্যোধনের কাছে দূত পাঠিয়েও পাণ্ডবরা কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। কারণ তাঁরা শুনেছিলেন, দুর্যোধন শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অর্জুন তাই দ্বারকা রওনা হলেন। যথা সময়ে দুর্যোধন সংবাদ পেলেন, অর্জুন দ্বারকায় আসছেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগশালী ঘোড়ায় চড়ে দ্বারকা রওনা হলেন।

"দুর্যোধন ও অর্জুন একই দিনে দ্বারকায় পৌঁছলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিদ্রাভিভূত।"

"কপট নিদ্রা।" দিদি মন্তব্য করেন।

"অনেকে তাই বলেন বটে।" সরকারদা উত্তর দেন, কিন্তু মহাভারতে কপটতার কোন উল্লেখ নেই। মহাভারতকার বলেছেন, প্রথমে দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শয়নগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি নিদ্রামগ্ন বাসুদেবের মাথার কাছে প্রশস্ত আসনে উপবেশন করলেন। ধনঞ্জয় একটু পরে সেখানে এলেন। তিনি বিনীতভাবে যদুপতির পায়ের কাছে বসে রইলেন।

"কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণের ঘুম ভাঙল। তিনি প্রথমে পার্থকে দেখলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। অর্জুন বললেন—আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

"ঠিক তখুনি মাথার কাছ থেকে দুর্যোধন বলে উঠলেন—আমিও একই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি বাসুদেব! যদিও জানি তোমার কাছে আমরা দুজনেই সমান, কিন্তু আমি আগে এসেছি। সুতরাং

আমার দাবী অগ্রগণ্য। সাধুরা প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন কবেন। তুমিও আজ সেই সদাচার পালন কর।

"কৃষ্ণ বললেন—আপনি যে আগে এসেছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি অর্জুনকে আগে দেখেছি। তার ওপরে সে আপনার চেয়ে ছোট। সুতরাং তাব কাছেই আমি প্রথমে সাহায্যের প্রস্তাব রাখব।

"তারপরে বাসুদেব সব্যসাচীকে বললেন—আমার সমযোদ্ধা এক অর্বুদ নারায়ণী-সৈন্য এক পক্ষ পাবে, অপর পক্ষ পাবে অস্ত্রহীন আমাকে। তুমি কাকে চাও?

"—তোমাকে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

"—আমি কিন্তু কখনই যুদ্ধ করব না। কৃষ্ণ অর্জুনকে মনে করিয়ে দেন।

"অকম্পিত কণ্ঠে অর্জুন উত্তর দেন—তাহলেও আমি তোমাকেই চাই।

"—বেশ, তবে তাই হোক।

"অর্জুনের নির্বুদ্ধিতা দেখে দুর্যোধন পুলকিত হলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণী সেনা-নিবাসের দিকে যাত্রা করলেন।

"দুর্যোধন চলে যাবার পরে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি যুদ্ধ করব না জেনেও তুমি আমাকে নিলে কেন?

"—কারণ তুমি সহায় হলে, আমি একাই কৌরবদের বিনাশ করতে পারব। আর নারায়ণ ও নারায়ণী-সেনার মধ্যে তো নারায়ণকেই গ্রহণ করা উচিত। এখন তুমি আমার সারথি হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।

"পার্থসারথি প্রসন্নকণ্ঠে বলে উঠলেন—তথাস্তু!"

॥ সাত ॥

সকালে ঘুম ভাঙল মতির মুখ দেখে। সে চা নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসি। তাই তো, এ যে দেখছি সাড়ে ছ'টা বাজে!

তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতে নিই। জ্ঞান জানলাটা খুলে দেয়। গাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঙ্গল-লাইন, কাজেই উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি আসার পরে আমাদের গাড়ি ছাড়ল।

পথের পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটু পরিবর্তন এসেছে। গাছপালা শস্যক্ষেত্র সবই আছে, তবে লালামাটিতে বালির ভাগ বেড়েছে। শুধু বালি নয়, তার সঙ্গে পাথরও মিশে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদেই আমি দ্বারকা পৌঁছচ্ছি। আমার বহুকালের বাসনা পূর্ণ হবে আজ। গঙ্গা থেকে গোমতী বহুদূর। বাসনা থাকলেই তীর্থদর্শন হয় না। তার জন্য সময় সুযোগ এবং অর্থের প্রয়োজন। সবই যখন জোগাড় হল, তখম সহসা শান্ত গুজরাত অশান্ত হয়ে উঠল—শুরু হল রাজনৈতিক আন্দোলন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে রওনা হলাম। ঠিক ছিল দোল-পূর্ণিমার দিনে আমরা মন-দ্বারকায় পৌঁছব। কিন্তু কয়লার অভাবে গাড়ি বাতিল হয়ে যাওয়ায় পথে দেরি হয়ে গেল। শেষ বাধা এলো শ্রীর অসুখ। সব বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা দ্বারকা পৌঁছব। সহযাত্রীরা যে-যার গোছগাছ করছেন। স্নানের কাপড়-চোপড় ও পুজোর জিনিসপত্র বের করছেন। আমার কোন আয়োজনের প্রয়োজন নেই, আমি শুধু দ্বারকাধীশকে দর্শন করতে এসেছি, মন-দ্বারকার ধূলি মাথায় মাখতে এসেছি। মনে মনে তাই দ্বারকার কথাই ভাবতে থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, হরিবংশ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্বারকার কথা আছে। দ্বারকা-মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে শর্যাতি নামে জনৈক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। উত্তানবর্হি, আনর্ত ও ভূরিসেন নামে তাঁর তিন ছেলে ছিল। শর্যাতি ছিলেন বড়ই

দাম্ভিক এবং নাস্তিক। বড় এবং ছোট ছেলে বাবার স্বভাব পেলেও মেজ ছেলে আনর্ত ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। কথায় কথায় তিনি একদিন পিতাকে বললেন—আপনি রাজা হলেও রাজ্য আপনার নয়।

—কার তাহলে? ক্রুদ্ধ পিতা প্রশ্ন করলেন।

ভক্ত-পুত্র নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—ভগবানের।

পুত্রের এই অবাধ্যতা বরদাস্ত করলেন না অহংকারী পিতা। তিনি তৎক্ষণাৎ আনর্তকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

সহায়-সম্বলহীন আনর্ত হাঁটতে হাঁটতে সাগর-সৈকতে উপস্থিত হলেন। তিনি বৈকুণ্ঠপতিকে স্মরণ করতে থাকলেন।

ভক্তের ভগবান তখন বৈকুণ্ঠ থেকে শতযোজন ভূখণ্ড উৎপাটিত করে ভীমানাদি সাগরে স্থাপন করলেন। মর্ত্যের সেই বৈকুণ্ঠই করুণাময় কৃষ্ণের দ্বারকা। আমরা আজ সেখানেই চলেছি। কিন্তু আমাদের কথা থাক্, দেবদত্ত-দ্বারকার পুণ্য কথাই ভাবা যাক্।

আনর্ত ও তাঁর বাশধরগণ বহুকাল সুখে রাজত্ব করেন এখানে। কথিত আছে, আনর্তের এক ছেলের নাম ছিল রেবত। তাঁর নাম থেকেই রৈবতক পাহাড়ের নাম হয়। অনেকে অবশ্য বলেন, বলরামের স্ত্রী রেবতীর নামানুসারে রৈবতক পাহাড়ের নাম হয়েছে। যে-কারণেই নামকরণ হয়ে থাক্, মহাভারতে বহুবার রৈবতক পাহাড়ের উল্লেখ আছে। সেযুগে যাদবদের শৈলাবাস ছিল রৈবতক। পণ্ডিতরা বলেন একালের গির্নার পাহাড়ই সেকালের রৈবতক। জুনাগড় শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গিনার পাহাড় হিন্দু ও জৈনদের একটি পবিত্রস্থান। কেউ-বা বলেন, রৈবতকই নাকি কুশস্থলী নগরী নির্মাণ করেন। পরে পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করলে আনর্তের বংশধরগণ কুশস্থলী ত্যাগ করেন।

কারও মতে, বৈবস্বত মনুর প্রপৌত্র রেবত কুশস্থলী নগরীর পত্তন করেন। আবার অনেকে বলেন বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুর ভাগনে আনর্ত এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পরশুরাম দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ এনে সেখানে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। আর সেই নগরী ছিল সোনার তৈরি।

জরাসন্ধের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ যখন নতুন নগরী নির্মাণের কথা ভাবছিলেন, তখন গরুড় তাঁকে জনহীন কুশস্থলীর সন্ধান দেন। কৃষ্ণ কুশস্থলীতে প্রাচীন দুর্গের সংস্কার সাধন এবং অসংখ্য দ্বারযুক্ত প্রাচীর নির্মাণ করেন। তাই তখন কুশস্থলীর নাম হয় দ্বারাবতী বা দ্বারকা।

শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণু-পুরাণে কুশস্থলীকে আনর্ত রাজ্যের রাজধানী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে দ্বারকার প্রাচীন নাম কুশস্থলী।

হরিবংশমে কুশস্থলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—কুশস্থলী অতিশয় রমণীয় ও সুরক্ষিত স্থান। নগরীর চারিদিকে সাগর, তারপরে সোনার প্রাচীর, সুতরাং দেবগণেরও দুর্ভেদ্য। সেখানে নানাবিধ ফল-ফুল জন্মায় এবং সব রকমের রত্নখনি রয়েছে। নগরীতে বহু লোক বাস করেন। বড় বড় বাড়ি, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোরম রাজপথ, বিপুল তোরণ ও রমণীয় গোপুরম প্রভৃতি সবই রয়েছে সেখানে। রাজপথে দিবারাত্র হাতি ঘোড়া রথ এবং পথচারী যাতায়াত করে। নগরীর নিকটেই আনিন্দ্যসুন্দর রৈবতক পাহাড়।

বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাভারতে বলা হয়েছে যে, যাদবগণ বেশিদিন দ্বারকায় রাজত্ব করতে পারেন নি। কারণ গান্ধারীর শাপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাত্র ছত্রিশ বছর পরে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তখুনি তিরানব্বুই বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন এবং সমুদ্র দ্বারকাকে গ্রাস করে।*

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে আজও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। কারও মতে সে দ্বারকা ছিল বর্তমান গুজরাতের আমরেলী জেলার কোড়িনার তালুকে। আবার জনৈক গবেষক দাবী

---

* শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে (একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ) অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর মর্ত্যলোকে প্রকট ছিলেন এবং তিনি যেদিন অন্তর্ধান করেন, সেদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ৫২০৬ বছর আগে (১৯৮০ খ্রীঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের প্রথম ১১ বছর বৃন্দাবন-লীলা। ১১ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত মথুরালীলা এবং ২৩ থেকে ১২৫ বছর দ্বারকালীলা। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ এই বক্তব্য মেনে নেন নি।

করেছেন, তিনি বিমান থেকে বর্তমান দ্বারকার উপকণ্ঠে সমুদ্রের মধ্যে প্লাবিত প্রাচীন দ্বারকাকে দেখতে পেয়েছেন। কেউ বা বলেছেন—বর্তমান দ্বারকার মাটির নিচেই রয়েছে প্রাচীন দ্বারকা। সমুদ্র তীরের অসংখ্য বালিয়াড়ি শহরের তিনদিকে সমুদ্রের বেষ্টনী এবং গোমতীর সংকীর্ণতাকে তাঁরা তাঁদের যুক্তি হিসাবে পেশ করেছেন। বলেছেন—যদি এখানেই দ্বারকা না হবে তাহলে শঙ্কর ও রামানুজের মতো আচার্যরা, কবীর নানক ও বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসীরা এবং নরসিংহ মেহতা ও মীরাবাঈ-এর মতো ভক্তরা কেন এখানে আসবেন? কেন তাঁরা বলবেন, এই সেই দ্বারকা?

এঁদের বক্তব্যকে কিন্তু কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ইদানিং খনন করে বর্তমান দ্বারকার প্রায় চল্লিশ ফুট মাটির নিচে বালি ও পলিমাটি মিশ্রিত বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। সেইসব বাড়ির দেওয়াল ও মেঝেতে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল।

খননকার্যের সময় চীনামাটির বাসনপত্রের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। কাজেই মনে হয়, সেকালের দ্বারকার সঙ্গে রোমের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বে দ্বারকা একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আর সম্ভবতঃ গোমতীর একটি দ্বীপে সেই নগরীর অবস্থিতি ছিল। পরে গোমতী মজে যাওয়ায় দ্বীপটি মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে সমুদ্রের জলোচ্ছাসে দ্বারকা নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। ইদানিং (জানুয়ারী, ১৯৮১) এই উক্তির আরও কিছু পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্‌ ডঃ এস. আর. রাও-য়ের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি এক খননকার্যের ফলে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে বলা যেতে পারে যে পুরাণের বিশেষ করে মহাভারতের কিছু ঘটনা কোন মতেই মিথ্যে নয়। আর তাই ডঃ রাও বলেছেন—বর্তমান দ্বারকা ও তার সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক খননকার্যের প্রয়োজন।

কেবল দ্বারকা নয়, প্রভাস বা সোমনাথ সম্পর্কেও একই কথা।

ইদানিং গুজরাত রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং পুনের ডেকান কলেজ প্রভাসে খননকার্য চালিয়ে প্রমাণ পেয়েছেন যে সেখানেও একটি প্রাচীন উপনগরী ছিল। সম্ভবতঃ সেটির সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ থেকে ১২০০ অব্দ।

অনেকে অবশ্য মনে করেন, যে কারণেই হোক্ সেই প্রথম দ্বারকা ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতকে কচ্ছ উপসাগরের বারেকে (Bareke) দ্বীপে দ্বিতীয় দ্বারকার পত্তন হয়। সেই নগরীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চতুর্থ দশকে সে দ্বারকাও ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁদের মতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমানের এই তৃতীয় দ্বারকার পত্তন হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট এসে গিয়েছে, সুতরাং ভাবনা থামাতে হল। অনেকেই অবশ্য খাবার নিলেন না। রণছোড়জীকে দর্শন না করে তাঁরা জল গ্রহণ করবেন না। আমি ভক্তিহীন দর্শক, সুতরাং জ্ঞানের হাত থেকে থালাখানি হাতে নিই।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নাম লেখা রয়েছে ওখামাটি।

এখান থেকে দ্বারকা ২২ কিলোমিটার। তাহলেও মনে হচ্ছে আমরা আরব সাগরের খুবই কাছে চলে এসেছি। সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না বটে, সামনে একটা পাহাড় রয়েছে। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে পাহাড়টার ওপারেই সাগর। খাল কেটে সাগরের জল এনে এখানে নুনের কারখানা করা হয়েছে। এখন সকাল সওয়া আটটা তার মানে ট্রেন একঘণ্টা লেট।

মৃদুমন্দ বেগে গাড়ি চলেছে। লাইনের ধারে কাঁটাবন আর লাল মাটির রুক্ষ প্রান্তর। আরেকটা স্টেশন এল, নাম গোরিঞ্জা।

গাড়ি চলছে, কিন্তু কেন যে এত আস্তে আস্তে চলছে বুঝতে পারছি না।

আমরা রেলে চেপে দ্বারকা চলেছি, কিন্তু মোটর কিংবা জাহাজে চড়েও দ্বারকা আসা যায়। এখান থেকে নিয়মিত বাস যায় জামনগর পোরবন্দর এবং ওখা। সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ

সপ্তাহে একবার করে বম্বে থেকে ওখা যাতায়াত করে। তবে দ্বারকায় কোন বিমানক্ষেত্র নেই। নিকটতম বিমানক্ষেত্র জামনগর—দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার।

আবার গাড়ি থামল, অরেকটা স্টেশন। নাম বরাদিয়া। টাইম টেবল নেই, ম্যানেজারকেও দেখতে পাচ্ছি না। জানা দরকার এমনি অপ্রয়োজনীয় আরও কতগুলো স্টেশনে থামতে হবে আমাদের এবং দ্বারকা আর কতদূর?

ওটা কি? ঐ যে সীমাহীন সাদা! সমুদ্র কি? হ্যাঁ, তাই তো! সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি দ্বারকা এসে গেল?

গাড়ির অপর প্রান্তে ম্যানেজারের কণ্ঠস্বব শোনা যায়, "দ্বারকা এসে গেছে। বলুন—রণছোড়জী কি…।"

সারা গাড়ি গর্জে ওঠে—"জয়।"

"বলুন—দ্বারকাধীশ কি…।"

"জয়।"

"বলুন—কৃষ্ণ ভগবান কি…"

"জয়।"

জয় জয় আর জয়। শুধু আমাদের গাড়ি নয়, সমস্ত ট্রেনটাই জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ট্রেন থেমেছে দ্বারকায়।

আমি মন-দ্বারকার মাটিতে মাথা ঠেকাই—'দেবগদি' দ্বারকা—স্বর্গের সিংহাসন দ্বারকা।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সী জনৈক দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছুটে আসেন আমাদের কাছে। দু'হাত জোড় করে বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, "পাঁচুবাবু কোথায়?"

বলি, "গাড়িতে রয়েছেন। এখুনি নামবেন। আপনি…"

ভাঙা ভাঙা বাংলায় ভদ্রলোক উত্তর দেন, "আমি পাণ্ডা। আমার নাম মণিলাল জীবরাজ ভট্ট। আসলে আমরা ভট্টাচার্য। দু' পুরুষ ধরে এখানে রয়েছি। শুধু বাঙালীদের তীর্থ দর্শন করাই। আমাদের আদি-নিবাস নদীয়া।"

স্টেশনটি বড় নয়। একটি প্লাটফর্ম। শহরের একপ্রান্তে রেল-

স্টেশন। লোকালয় একটু দূরে বলে মনে হচ্ছে।

ম্যানেজার সদলবলে গাড়ি থেকে নেমে আসে। চীৎকার করে বলতে শুরু করে, "ঠাকুরমা-দিদিমা, মাসি-পিসী, দাদা-বৌদি, মামা-কাকা ও বাবারা! আমরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় এসে গিয়েছি। এখন আমরা টাঙ্গায় চড়ে গোমতীতে স্নান করতে যাব। সেখান থেকে যাব রণছোড়জীর মন্দিরে। দর্শন করে ফিরে আসব গাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার টাঙ্গায় করে রুক্মিণী মায়ের মন্দির, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব, ভদ্রকালী, গোবর্ধনজী, দামোদরজী, মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহতার মন্দির এবং গান্ধীঘাট দর্শন করতে বের হব।"

টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। দ্বারকার পথ। কত অসংখ্যবার হয়তো এই পথ দিয়ে কৃষ্ণ আসা-যাওয়া করেছেন। এসেছেন রুক্মিণী ও সত্যভামা, অর্জুন ও সুভদ্রা—আরও অনেকে। আজ আমি এসেছি। আমি ধন্য। আমি আজ মন-দ্বারকার পথিক।

দ্বারকার কথাই ভেবে চলি—দ্বারকা বিষ্ণুতীর্থ। কিন্তু শৈবতীর্থ হিসাবেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। শিব-পুরাণের মতে নাগেশ শিব হলেন দ্বারকার জ্যোতির্লিঙ্গ। তবে বৈদিক যুগে দ্বারকার নাম তীর্থ হিসাবে পাওয়া যায় না। এমন কি মহাভারতের যুগেও দ্বারকা তীর্থ রূপে স্বীকৃত ছিল না। আর তাই পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে প্রভাসে এসেও দ্বারকায় আসেন নি।

দ্বারকা বর্তমানে ওখামণ্ডল তালুকের সদর। সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই নগরী, বীরামগাম-ওখা মিটারগেজ রেলপথের একটি স্টেশন। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ৩৭৮ কিলোমিটার ও জেলাসদর জামনগর থেকে ১৩৭ কিলোমিটার। ২২°২২´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৬৯°০৫´ পূর্ব দ্রাঘিমায় গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে গড়ে উঠেছে শহরটি। যদিও ভূগোলবিদরা বলেন এটি মূল-গোমতী নয়, তার একটি খাঁড়ি। মূল-গোমতী প্রায় দশ কিলো-মিটার দূর দিয়ে প্রবাহিত। এই খাঁড়িটি সেই নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে একেও সবাই গোমতী বলেন।

অনেকের মতে দ্বারকা নামটি এসেছে দ্বার শব্দ থেকে। প্রাচীন

কালে এটি একটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। আর সেই বন্দরই ছিল ভারতের পশ্চিম প্রবেশদ্বার। দ্বারকা বহুবার জলদস্যুদের শিকার হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এখানে ওয়াঘের জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল। ফলে দ্বারকাকে দ্বারামতী বা দ্বারাবতী অর্থাৎ দ্বার-নগরীও বলা হয়।

দ্বারকা শুধু শঙ্করাচার্যের চারধামের অন্যতমা নয়, প্রাচীন ভারতের সপ্তপুরীর অন্যতমাও বটে। অপর ছ'টি পুরী হল—বারাণসী মথুরা হরিদ্বার অযোধ্যা উজ্জয়নী ও কাঞ্জিভরম।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী দ্বারকা দর্শন করতে আসেন। এই আসা কবে থেকে শুরু হয়েছে জানি না, কিন্তু জানি—এ আসার শেষ নেই। যতদিন জগৎ থাকবে, ততদিন দ্বারকার পথ আমার মতো শত-সহস্র পুণ্যার্থীর প্রবাহে প্রতিদিন মুখরিত হয়ে থাকবে। আর তাই ব্রিটিশ সরকার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ওখামণ্ডল বরোদার গাইকোয়াড়কে উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সাল অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত দ্বারকা বরোদা রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল ১৯৪৯ সাল থেকে। দ্বারকা জামনগর জেলার একটি শহর।

বড় শহর নয়। আয়তন মাত্র ৪২·০৭ বর্গ কিলোমিটার। ৩,০৪৪টি বাড়ি ও ৩,১২৩টি পরিবার নিয়ে শহর। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দ্বারকার স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ১৭,৮০১ জন। তাঁদের মধ্যে ৯,১৮৫ জন পুরুষ ও ৮,৬১৬ জন নারী।

বাড়িগুলির মধ্যে অবশ্যি বেশ কয়েকটি ধর্মশালা রয়েছে। রয়েছে একটি হাসপাতাল এবং হাই স্কুল। এখানে পাশ্চাত্য ঢঙের কোন হোটেল নেই, তবে চারটি দিশী হোটেল রয়েছে। আর আছে রেলওয়ে রিটায়ারিং-রুম জেলা বোর্ড ও নির্মাণ বিভাগের বিশ্রাম-ভবন।

পথের ডানপাশে দেওয়াল-ঘেরা বিরাট একটা কারখানা। পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, আমার অনুমান সত্য—এটাই এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী। শুনেছি এ অঞ্চলে সিমেন্ট তৈরির প্রধান উপকরণ বেন্‌টোনাইট্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্থানীয়রা বেন্‌টোনাইট্‌কে বলেন—মগমাটি।

মনে পড়ছে চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী মেঘালয় সরকারের মাম্‌লু (Mawmluh) সিমেণ্ট কারখানার কথা। দ্বারকা ভারতের পশ্চিমসীমা আর মাম্‌লু পূর্বপ্রান্ত। দু-য়েব মাঝে দূরত্ব যা-ই হোক্‌, দু'জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে বেল্‌টোনাইট্‌ পাওয়া যায়। আর তারই ফলে ভারতের দুই প্রান্তে গড়ে উঠেছে দুটি সিমেণ্ট তৈরির কারখানা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বৈকি।

পাণ্ডাজীকে আবাব জিজ্ঞেস করি, "দ্বারকার প্রধান উৎসব কি কি?"

"অন্নকূট, হোলি, ফুলদোল ও জন্মাষ্টমী।"

হেসে বলি, "একটিও তো শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা নয়, সব ক'টিই যে তাঁব ব্রজলীলা।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" পাণ্ডাজী সবিনয়ে স্বীকার করেন। বলেন, "অন্নকূট হল আমাদের নবান্ন। নতুন ফসল দিয়ে প্রথম দ্বারকানাথের পুজো করা হয়। আর সেদিন থেকেই শুরু হয় আমাদের নববর্ষ। বণছোড়জীর মন্দিরে রঙ খেলে হোলি আরম্ভ হয়। ভজন গান উৎসবের প্রধান অঙ্গ।"

"জন্মাষ্টমীতে কেমন আনন্দ হয়?"

"জন্মাষ্টমী মথুরার উৎসব হলেও দ্বারকায় সেদিন খুবই আনন্দ হয়। বহু পুণ্যার্থী তখন এখানে আসেন। রাতে দ্বারকাধীশ মন্দিরে মহা-সমারোহে কৃষ্ণ ভগবানের জন্মোৎসব পালিত হয়। সেই উৎসবের ধারাবিবরণী আকাশবাণীর রাজকোট কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়।"

একটু থামেন পাণ্ডাজী। তারপরে আবার বলেন, "আমাদের এখানে কিন্তু শিবরাত্রি এবং ভীম-একাদশীতেও মহোৎসব হয়।"

"আচ্ছা, দ্বারকা দর্শনের শ্রেষ্ঠ সময় কখন?"

"শীতকালে মানে নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। গ্রীষ্মকালে বেশ গরম পড়ে দ্বারকায়।"

"কি রকম বৃষ্টি হয় এখানে?"

"খুবই কম। ফলে দ্বারকায় জলাভাব লেগেই আছে।"

স্টেশন থেকে রওনা হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে পথ চলে প্রায় দু-

কিলোমিটারে এসে টাঙ্গা থামল। খানিকটা দূরে বাড়ি-ঘরের পেছনে মন্দিরচূড়া দেখা যাচ্ছে। শুনেছি মন্দিরটি সাততলা এবং একশ' ষাট ফুট উঁচু। ছাপ্পান্ন ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মূল-মন্দিরে উঠতে হয়। চূড়ায় শিখর-কলস ও লাল বর্ডার দেওয়া দ্বারকাধীশের পতাকা সগর্বে উড়ছে। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।

পাণ্ডাজীর পেছনে পেছনে ছোট গলি পেরিয়ে আমরা সাগরতীরে আসি। বাঁধানো পথ থেকে নেমে আসি বেলাভূমিতে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলি। সামনে খানিকটা দূরে উত্তরদিকে বন্দর দেখা যাচ্ছে। দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার। কিছুদিন আগে বন্দরটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়েছে। দ্বারকা বন্দরের বর্তমান নাম রূপেন। দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার। খুব প্রাচীন হলেও, বন্দর এখন মোটেই বড় নয়। কারণ এখানেও জল খুবই কম। জাহাজকে বহু দূরে থাকতে হয়। বন্দরের প্রধান রপ্তানি কাঠ ও মাছ।

আমরা কিন্তু সাগরতীরে এসেও সাগরজলে স্নান করলাম না। পাণ্ডাজীর পেছনে বালি ভেঙে হেঁটে চললাম বাঁদিকে—গোমতীর তীরে। খানিক এগিয়ে বাঁদিকে একটি ছোট মন্দির। মন্দিরের মেঝে বেলাভূমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। পাণ্ডাজী জানালেন—সঙ্গম নারায়ণের মন্দির।

গোমতীর তীরে এলাম। এখানেও দুটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। পাণ্ডাজী জানালেন, "সত্যনারায়ণ ও নৃসিংহদেবের মন্দির। আর এই গোমতীর ওপারেই পঞ্চতীর্থ—পাঁচটি স্বাদু জলের ঝরণা।"

জামা খুলে জলে নামি—গোমতীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করি। গঙ্গাতীরের মানুষ আমি, এসেছি গোমতীর তীরে। বহুকালের বাসনা পূর্ণ হল। আমি আজ রণছোড়জীকে দর্শন করব।

পুণ্যতীর্থের এই পুণ্যধারা যতই প্রাচীন ও পবিত্র হোক্, এখন কিন্তু দ্বারকার গোমতী নামেই নদী। আর তাই হয়তো ইংরেজরা একে খাঁড়ি বলেছেন। সেকালের গোমতী মজে গিয়ে একালে খাঁড়ি হয়েছে। সেকালে নাকি গোমতী ছিল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত

এক সুবিশাল নদী। আগেই বলেছি, তারই এক দ্বীপে ছিল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা। এখন নদী মজে যাওয়ায় দ্বীপটি মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

গোমতী মোটেই গভীর নয়, তার ওপরে নোনা জল এবং এখন ভাঁটা চলছে। তাহলেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে অবগাহন করি। দাদা তো রীতিমত সাঁতার কাটছেন। কে বলবে বাহাত্তুরে বুড়ো! বরিশালের বাঙ্গাল, জল পেয়ে বয়সের কথা ভুলে বসে আছেন।

স্নান করে উঠে আসি পাড়ে—বাঁধানো পাড়ে। স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য এখানে খানিকটা জায়গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের কাপড় বদল করবার জায়গা ঘিরে দেওয়া হয় নি। কেন, তা কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। একে শত শত লোক স্নান করছেন, তার ওপরে প্রবল বাতাস বইছে। কাজেই মেয়েদের পক্ষে এখানে সম্ভ্রম বাঁচিয়ে বেশ পরিবর্তন অসম্ভব। অথচ লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েও তাদের সে কাজটি শেষ করতে হল।

স্নান শেষে সারি বেঁধে মন্দিরে চলেছি—রণছোড়জীর মন্দিরে। পাণ্ডাজী 'লীড' করছেন, ডেপুটি-লীডার পাঁচু। সে বাঁশি বাজাচ্ছে মাঝে মাঝে। এ অধিকার তার অবশ্যই আছে। একে সে আমাদের ম্যানেজার, তার ওপরে ওর পুরো নাম পাঁচুগোপাল দে। অনেকে নাকি ওকে শুধু গোপাল বলেই ডাকেন। গোকুলের গোপালই তো বৃন্দাবনের মুরলীধর, আবার তিনিই এই দ্বারকায় এসে রণছোড়জী।

যে-পথে এসেছিলাম সে-পথে ফিরে যাচ্ছি না কিন্তু। এখন চলেছি পাণ্ডাজীর বাড়িতে। ভিজে কাপড় ও জুতো সেখানে রেখে মন্দিরে যাব।

সংকীর্ণ বাঁধানো পথ। গলি বলাই ঠিক হবে। দু'পাশেই বাড়ি-ঘর। জনৈকা যুবতী জল নিয়ে চলেছে। একটি বা দুটি নয়, চার ঘড়া জল। একটির ওপরে আরেকটি সাজিয়ে ঘড়াগুলো মাথায় নিয়েছে। দু'হাত দুলিয়ে দুলকি চালে ঘরে ফিরছে। বিস্ময়কর ব্যালান্স।

শুধু ব্যালান্স নয়, সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটিকেও না দেখে পারছি না—মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী। সৌরাষ্ট্রের নারীদের সৌন্দর্য-

খ্যাতি সুপ্রাচীন। পুরাণে বলা হয়েছে—

'সৌরাষ্ট্রে পঞ্চরত্নানি নদী নারী তুরঙ্গমাঃ।
চতুর্থং সোমনাথশ্চ পঞ্চমং হরিদর্শনম্ ॥'

সৌরাষ্ট্রে পাঁচটি রত্ন রয়েছে, নদী নারী অশ্ব সোমনাথ এবং হরিদর্শন।

আমরা সৌভাগ্যবান। সৌরাষ্ট্রের নদীতে স্নান সেরে হরিদর্শনে যাবার পথেই তার নারীরত্নের সৌন্দর্য সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করলাম।

ভিজে জামা-কাপড়, জুতো ও ক্যামেরার কেস পাণ্ডাজীর বাড়িতে রেখে আমরা মন্দিরে চলেছি। যথারীতি উকিলবাবু সেখানেই রয়ে গিয়েছেন। উনি তীর্থে এসেও মন্দিরে যান না। সঙ্গে স্ত্রী রয়েছেন। তাঁর দর্শনেই নাকি উকিলবাবুর দর্শন হয়ে যায়। কবি বলে গিয়েছেন 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য', আর এবারে যাত্রায় বেরিয়ে দেখতে পেলাম —সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

তবে কবির সঙ্গে উকিলবাবুর কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর রণছোড়জী অদর্শনের কারণ খরচ কমানো নয়। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসেছেন এবং এজন্য তাঁর পুরো টাকা দিতে হয়েছে। সুতরাং কবির সিদ্ধান্ত উকিলবাবুর ক্ষেত্রে অচল।

উকিলবাবুর মন্দির দর্শন না করার কারণ যা-ই থাক্, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আসার কারণটা বুঝতে পারছি। মিসেস উকিল অতিশয় স্থূলকায়া। যে কোন কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর পক্ষেই এমন স্থূলাঙ্গী স্ত্রীকে একাকিনী ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

সেকালেও শুনেছি গোমতীতে স্নান সেরে দর্শন যেতে হত। তবে তখন স্নানের জন্য সামন্তদের সোয়া চার টাকা এবং পাণ্ডাদের সাড়ে তিন টাকা দক্ষিণা দিতে হত। মন্দির জাতীয়করণের পর যাত্রীরা সেই ব্যয়ভার মুক্ত হয়েছেন।

সেকালের মতো একালেও অবস্থাপন্ন ভক্তরা দ্বারকায় এসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে থাকেন। অনেকে দরিদ্রদের কাপড় ও কম্বল বিতরণ করেন।

একালেও সেকালের মতো গায়ে ছাপ দেবার নিয়ম রয়েছে। পদ্মাকৃতি কিংবা গোলাকার এক টুক্‌রো লোহা গরম করে যাত্রীদের ইচ্ছামত শরীরের কোন অংশে চেপে ধরা হয়। সুদৃশ্য ফোস্কাটি দ্বারকা দর্শনের নিদর্শন রূপে ভক্তের অঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

একালেও স্বচ্ছল যাত্রীরা রণছোড়জীকে রঙীন পোশাক উপহার দেন। শুনেছি মন্দির-সংলগ্ন বাজারে রণছোড়জীর পোশাক কিনতে পাওয়া যায়। সরকার মন্দির অধিগ্রহণ করার পরে কি অবস্থা বলতে পারব না, তবে আগে যাত্রীদের কিনে দেওয়া পোশাক রণছোড়জীর গায়ে বড়.একটা উঠত না। ফিরে যেত দোকানদারের কাছে। আবার পরদিন কোন যাত্রী সেই পোশাকটিকেই কিনে নিয়ে আসতেন।

গোমতীর তীর মন্দির থেকে তেমন দূরে নয়, তাহলেও কয়েক মিনিট হাঁটতে হয়েছে আমাদের। অথচ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার'-এ পড়েছি—'·· temple of Dwarkanath is built on the north bank of Gomti···'

তাহলে কি মাত্র ছেষট্টি বছর আগেও গোমতী এমন মজে যায় নি? তখনও কি গোমতীর পুণ্যধারা দ্বারকাধীশ মন্দিরের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হত?

হয়তো হবে। ভারতের বহু মজে-যাওয়া নদীই তো গত শতকে নাব্য ছিল। আর নদীমাতৃক দেশে এই মজে-যাওয়া নদীগুলো এখন পরিণত হয়েছে স্থায়ী অভিশাপে। ভারতের প্রধান নদীগুলোকে নাব্য করে তুলতে পারলে শুধু যে বন্যারোধ এবং পরিবহণের উন্নতি হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে আমরা লক্ষ লক্ষ একর পলিময় ভূখণ্ড উদ্ধার করতে পারব।

কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকালে ভগীরথ হাতুড়ি-বাটালি এবং কোদাল ও খন্তা দিয়ে যা পেরেছেন, একালে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা তা পারব না কেন?

স্থাপত্যকলার বিচারে জগৎ-মন্দিরের গড়নটা সাধারণ হিন্দু-মন্দিরের মতই। কেবল কারুকার্যটা শুনেছি বাইরের দিকে—সারা

মন্দির জুড়ে। ভেতরের দেওয়ালে কোন কারুকার্য নেই। এবং কোন অহিন্দু মন্দিরে ঢুকতে পারেন না।

পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা মন্দির-তোরণে এলাম। তোরণের ঠিক ওপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমূর্তি—আমরা প্রণাম করি।

তোরণ পেরিয়ে অঙ্গন। কিন্তু অঙ্গনে উঠবার আগেই পাণ্ডাজীর সঙ্গে বাঁ-দিকের বারান্দায় আসতে হয়। একটু এগিয়ে ডানদিকে একটি গর্তের ভেতর কুশেশ্বর শিবকে দর্শন করি।

তারপরে এগিয়ে চলি অঙ্গনের দিকে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-তীর্থে এসে এ কি ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে। দ্বারকা নয়, দ্বারকাধীশ নয়, আমি ভেবে চলেছি ইতিহাসের কথা—এই মন্দির নির্মাণের কথা।

না, সে ইতিহাস জানা নেই আমাদের। থাকবে কেমন করে? ভারতে প্রাচীন কীর্তি আছে অসংখ্য, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস নেই একখানিও। তাই কিংবদন্তীকে আমরা ইতিহাসের আসন এগিয়ে দিয়েছি। বলছি, বিশ্বকর্মা একরাতে এই মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। কিংবা কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলের কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের মতো এ মন্দিরটিও নির্মাণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাঁদের অনেকে বলছেন—প্রায় চোদ্দশ' বছর আগে গাঙ্গেয় উপত্যকার জনৈক গুপ্তরাজা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন। তিনি গুজরাত আক্রমণ করে ওখামণ্ডল অধিকার করেছিলেন।

আবার অনেকে এই মন্দিরের আদি-ইতিহাস আবিষ্কারের জন্য আজও নিরলস সাধনা করে চলেছেন। তাঁরা এখানে এক টুকরা কালো পাথর কুড়িয়ে পেয়েছেন, যেটি নাকি পূর্ববর্তী দ্বারকাধীশ বিগ্রহের অংশ। পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দের মুসলমান আক্রমণকারীরা সেই বিগ্রহ বিনষ্ট করে। ঐ অংশটুকু দেখে নাকি মনে হয় যে, বিগ্রহটি খোদাই-বিদ্যার নির্দিষ্ট নিয়মে নির্মিত হয়েছিল।

তাঁরা এই মন্দিরের তিনতলায় সম্বত ১৬২৪ (১৫৬৮ খ্রীঃ) ও জনৈক স্থপতির নাম খোদিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। সেই স্থপতির তত্ত্বাবধানে তখন এই মন্দির মেরামত করা হয়েছিল। ভবনগরের নিকটবর্তী তালাজা থেকে তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। গবেষকরা অনুমান করছেন ঐ প্রস্তরলিপিখানি এই মন্দির নির্মাণের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

ঐতিহাসিকদের আরও গুটিকয়েক গবেষণার বস্তু রয়েছে এই মন্দিরে। যেমন, চারতলায় রয়েছে একটি ছোট মন্দির, যেটি আপাতদৃষ্টিতে অবিকল বৌদ্ধস্তূপের মতো।

এ থেকে অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, এই জগৎ-মন্দির জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দী) আগে নির্মিত। কারণ শঙ্করাচার্যের পরে এ মন্দিরে বৌদ্ধস্তূপ তৈরি করা সম্ভব নয়।

শুনেছি মন্দিরের বিশাল ও বিচিত্র শিখরটিও ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক গবেষকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। দ্বারকাধীশের কাছে প্রার্থনা করি তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্, মূক মুখর হোক্। ইতিহাস কথা বলুক্।

কুশস্থলীর কুশেশ্বরকে দেখে উঠে আসি অঙ্গনে। পাথরের অঙ্গন পেরিয়ে আবার শুরু হল সিঁড়ি—অনেক সিঁড়ি। আমরা উঠতে থাকি।

পাণ্ডাজীকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছি না এখন। তিনি ম্যানেজারকে সাহায্য করতে পেছিয়ে পড়েছেন। তাঁরা দুজনে মিসেস উকিলের দু'খানি বাহু দু-কাঁধে নিয়ে অতিকষ্টে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন। আর মিসেস এক-পা এক-পা করে এক-একটি সিঁড়ি ওপরে উঠছেন। বাণেশ্বর রয়েছে ঠিক তাঁর পেছনে, পড়ে গেলে ধরে ফেলবে—এই আশায় বোধকরি।

দ্বারকানাথ না করুন! বাণেশ্বরের যেন হাত লাগাবার প্রয়োজন না হয়! কারণ মিসেস যদি সত্যি সত্যি পড়ে যান, তাহলে বাণেশ্বর

কিছুতেই তাঁর অধঃপতন রোধ করতে পারবে না। মাঝখান থেকে তাকেও দ্বারকার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

উঠে এলাম মন্দিরে—জগৎ-মন্দিরে। মুহূর্তে আমার সারা শরীরে একটা অভূতপূর্ব পুলকের শিহরণ মূর্ত হয়ে ওঠে। ছুটে আসি গর্ভ-মন্দিরের সামনে। কিন্তু···দেখা হল না তাঁর সঙ্গে। দুর্ভাগ্য আমার। মন্দিরদ্বারে পরদা ঝুলছে। এখন তিনি রাজবেশ পরিধান করছেন।

কয়েকজন ভক্ত পরদার সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই তাঁদের সামিল হলেন। কিন্তু আমি কয়েক পা পেছিয়ে নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই।

নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির নিয়েই মূল-মন্দির। বেলেপাথরের মন্দির। বাইরের সিঁড়ি থেকে শুরু করে ভেতরের বিগ্রহ পর্যন্ত সব কিছুই এখানে পাথরে তৈরি।

মন্দিরের ভেতরে কোন কারুকার্য নেই বটে, কিন্তু দ্বারের ঠিক ওপরে গর্ভ-মন্দিরদ্বারের ওপরে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা ও রণছোড়জীর ছবি। রয়েছে কৃষ্ণলীলার আরও কয়েকখানি ছবি ও একটি দেওয়াল ঘড়ি—এখন সকাল সওয়া দশটা।

মন্দির-গাত্রে একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে—'শ্রীরাম জয়রাম, জয় জয় রাম······যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ করুণাময়।'

একটি বছর বারো বয়সের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে অতর্কিতে সামনে এসে আমার কপালে চন্দন-তিলক এঁকে দিল। তার পরেই কোমল কণ্ঠে বলল—"মহারাজ, পাইসা দে।"

একটা দশ পয়সা হাতে গুঁজে দিতেই তার সারা মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ম্যানেজার ও পাণ্ডাজী মিসেস উকিলকে নিয়ে নির্বিঘ্নে উঠে এসেছেন মন্দিরে এবং বাণেশ্বর অক্ষত রয়েছে। সত্যই মিসেসকে প্রশংসা করতে হয়। এই দেহ নিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মন্দির দর্শন করছেন। করুণাময় কৃষ্ণ কেন তাঁকে মেদমুক্ত করছেন না, বুঝতে পারছি না। তাঁর লীলা সত্যই বুদ্ধির অগম্য।

পাণ্ডাজী মিসেসের হাত ছেড়ে দিয়ে বলেন, "একটু বসুন মা ! বিশ্রাম করুন। ঠাকুরকে রাজবেশ পরানো হচ্ছে। দর্শনের এখনও আধঘণ্টা বাকি।"

শ্রান্ত মিসেস বসে পড়েন মন্দিরের মেঝেতে। পাণ্ডাজী এগিয়ে আসেন আমার কাছে। কথায় কথায় তিনি আমাকে বলে চলেন, "দেখুন, ষাটটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নাট-মন্দিরের ত্রিকোণাকৃতি ছাদটি। স্তম্ভগুলি বেলেপাথর এবং গ্র্যানিট-য়ের তৈরি, এর ওপরে আরও ছ'টি তলা রয়েছে। চতুর্থ তলায় শক্তিমাতার মন্দির আর পঞ্চম তলায় রয়েছে লাড়োয়া মন্দির। পঞ্চম তলার ছাদ অর্থাৎ মূল-মন্দিরটি ১০০ ফুট উঁচু। তার ওপরে ৬০ ফুট উঁচু মোচাকৃতি মন্দিরশীর্ষ। এরই মধ্যে তুটি তলা রয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিমূল অর্থাৎ এই মূল-মন্দিরটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট।"

"এবারে একটু পুজোর কথা বলুন।" সরকারদা পাণ্ডাজীকে অনুরোধ করেন।

পাণ্ডাজী বলেন, "এখানে দিনে সাতবার ও রাতে চারবার ঠাকুরের ভোগ-পুজো হয়। নামে পুজো দিয়ে 'প্রসাদ' পেতে হলে অন্তত একটাকা পঁচিশ পয়সা খরচ করতে হয়। রাজভোগ অর্থাৎ অন্নপ্রসাদ পেতে হলে সওয়া একান্ন টাকার পুজো দিতে হয়।"

"আমি তারই একটি দেব ঠাকুরজী !"

"বেশ, আমাকে টাকা দিন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আরও তুজন দিয়েছেন।"

বুঝতে পারছি তাঁদের একজন সামন্তবাবু অপরজন মাসীমা। তিনি কলকাতা ছাড়ার পরে আজই প্রথম অন্ন গ্রহণ করবেন।

সরকারদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাণ্ডাজী মন্দিরের দপ্তরে চলে গেলেন। আর তার ঠিক পরেই ম্যানেজার আমাকে বলে, "চলুন ঘোষদা ! দর্শনের যখন দেরি আছে, একটু ঘুরে আসা যাক্।"

আমি ম্যানেজারের সঙ্গে নেমে আমি মন্দির থেকে। ঘুরে ঘুরে সব দেখতে থাকি। আরও অনেক মন্দির রয়েছে দেখছি। তোরণ থেকে যে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁচেছি, সেই প্রাঙ্গণের

দু'পাশে সারি সারি মন্দির। সত্যই দর্শনীয়—অম্বাজী, পুরুষোত্তমজী, অনিরুদ্ধজী এবং দুর্বাসা মুনির মন্দির।

একটি দরজা পেরিয়ে আমরা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে পাশের বাড়িতে এলাম। ম্যানেজার বলেন, "এখানে দর্শন করবেন জাম্ববতী, শ্রীরাধিকা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গোপালকৃষ্ণ, সত্যভামা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী তথা রুক্মিণীর মন্দির।"

"রুক্মিণীর মন্দির শুনেছি এখান থেকে অনেকটা দূরে?"

"হ্যাঁ। সেটা বড় মন্দির, আমরা বিকেলে দেখতে যাব। এটা ছোট মন্দির, দর্শন করুন। এই বাড়িটাই আদি সারদা মঠ।

"শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভারতের চারিদিকে যে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন, এটি তারই অন্যতম। পশ্চিম ভারতে ধর্মরক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল এই সারদাপীঠ। আচার্য শঙ্কর প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক মদন মিশ্রকে এই মঠের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, মদন মিশ্র প্রথম জীবনে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-বিরোধী ছিলেন। শঙ্কর তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে নিজের দলে আনেন। সারদাপীঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য অর্থাৎ অধ্যক্ষ হলেন মদন মিশ্রের ৭৭তম উত্তরসাধক।

"শুধু দেব-দেবী ও যাগ-যজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না এঁরা। সারদাপীঠ বিদ্যাসভা এখানে একটি আর্টস কলেজ ও সংস্কৃত আকাদেমী পরিচালনা করেন। তাঁরা ভারতবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষায় পি. এইচ্. ডি. গবেষণায় সাহায্য করেন।"

একবার থামে ম্যানেজার। তারপরে আবার বলে, "সরস্বতী মন্দিরে দেখতে পাবেন আদি শঙ্করাচার্যের গদি ও শয্যা--ঠিক সেইভাবে রেখে-দেওয়া হয়েছে।"

"এখন সারদা মঠ কোথায়?"

"এর পরের বাড়িটাতেই বর্তমান শঙ্করাচার্যের গদি।"

সব মন্দির দর্শন করে আমরা সরস্বতীর মন্দিরে এলাম। প্রবেশ করি সেই পুণ্যগৃহে, যেখানে সেই সর্বত্যাগী সাধক তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনের কয়েকটা দিন কাটিয়ে গিয়েছেন। আমার শরীরের শিরায়

শিরায় পুলকের শিহরণ বয়ে যায়। বার বার মনে হয় আমি ধন্য, আমি আজ সনাতন ধর্মের সেই সুমহান রক্ষকের পদধূলিধন্য নিবাসে উপস্থিত হতে পেরেছি।

আচার্য শঙ্করের স্মৃতিধন্য প্রাচীন সারদাপীঠ দর্শন করে বর্তমান সারদাপীঠে আসি। মূল-মন্দিরটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো। মন্দিরে একটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো বেদীর ওপরে বর্তমান শঙ্করাচার্যের ছবি। মন্দিরের সারা দেওয়াল জুড়েই প্রাক্তন কয়েকজন শঙ্করাচার্যের ফটো। আচার্য শঙ্করের একখানি কাল্পনিক ছবিও রয়েছে।

তা হলেও বার বার প্রণাম করি। ছবিটা কাল্পনিক হলেও সেই সুমহান মহাপুরুষ তো আর কল্পনা নয়। তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, সেটা বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন, তিনি আবির্ভূত না হলে আজ আমার দ্বারকা দর্শন হত কি? তিনিই দ্বারকাধীশ মন্দিরের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলেই আজও হিন্দু-ধর্ম বেঁচে রয়েছে। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। তিনি ছিলেন আশৈশব সরস্বতীর সাধক। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম—' সারদাপীঠ। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনকালে শোধ হবার নয়।

শঙ্করাচার্যের গদি থেকে কৃষ্ণ-সুদামা মন্দির দেখে ত্রিবিক্রমজী তথা বলরামের মন্দিরে এলাম। ম্যানেজার বলে, "এখানে চার আনার কমে দান করা যায় না।"

তাই দিলাম। পূজারী আমার নাম জিজ্ঞেস করে সিকিটি হাতে নিয়ে দাউজীর সামনে গেলেন। তারপর হাত নেড়ে বললেন—ঘোষবাবুর চার আনা, ঠাকুরের চরণে।

বলদেব মন্দিরের বিপরীত দিকে বেণীমাধবের মন্দির। আমরা দর্শন করি। তার পরে রণছোড়জীর রান্নাঘর দেখে ফিরে আসি দ্বারকাধীশ মন্দিরে। এবারে আমরা অন্য একটি তোরণ দিয়ে নাট-মন্দিরে এসেছি। তোরণের সামনে রাধাকৃষ্ণ এবং দেবকীর মন্দির। দেবকীর মন্দিরে সোনালী সিংহাসনে মা দেবকীর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। মন্দিরটি রণছোড়জী মন্দিরের ঠিক সোজাসুজি নাট-মন্দিরের অপর

প্রান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ মা ও ছেলে সর্বদাই দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ম্যানেজারের সঙ্গে নাট-মন্দিরের মাঝখানে আসি। এখনও দর্শন শুরু হয় নি। তবে গর্ভ-মন্দিরের সামনে বেশ ভীড় হয়েছে। এমন কি মিসেস উকিল পর্যন্ত তাঁদের সামিল হয়েছেন। আমিও এগিয়ে চলি।

ম্যানেজার বাধা দেয়। সে সহসা আমার একখানি হাত ধরে।

অবাক হয়ে পেছনে তাকাই। ম্যানেজার গম্ভীরস্বরে বলে, "ঘোষদা, একটা কথা বলব ?"

"বলুন।"

ম্যানেজার আমার হাত ছাড়ে না। আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে, "ঘোষদা ! আপনি দ্বারকায় এসেছেন ?"

অবাক কণ্ঠে উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"আপনি দ্বারকাধীশের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন ?" পাঁচু আবার বলে।

আমার বিস্ময় বাড়ে। তবু উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"আপনার সামনে ঐ পরদার পেছনে রণছোড়জী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অন্তর্যামী, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের, শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথাবার্তা !"

"হ্যাঁ।"

"এবার বলুন আপনি কে ? বলুন, আপনি শঙ্কু মহারাজ কি না ?"

প্রথম দিন থেকেই পাঁচুকে দেখে আমার অত্যন্ত চালাক-চতুর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সে যে এতখানি বিচক্ষণ তা বুঝতে পারি নি।

পাঁচু আবার বলে, "ঘোষদা, এই পবিত্র মন্দিরে দাঁড়িয়ে কারও কিন্তু মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়।"

"জানি।" আমি অসহায় স্বরে উত্তর দিই।

"তাহলে বলুন, আপনি শঙ্কু মহারাজ কি না।"

"আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু রণছোড়জীর সামনে দাঁড়িয়ে আপনিও আমাকে কথা দিন, কথাটা গোপন রাখবেন। কোন কারণেই হাওড়া ফিরে যাবার আগে কাউকে আমার প্রকৃত পরিচয় জানাবেন না।"

"আমি আপনাকে কথা দিলাম ঘোষদা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আর কোন কথা বলার সুযোগ পাই না। ঘণ্টা বাজছে, পরদা সরে যাচ্ছে। রণছোড়জীর জয়ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি ছুটে আসি গর্ভ-মন্দিরের সামনে।

মন্দিরদ্বার রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। তাতে নানা রকমের কারুকার্য।

সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করি। মন ভরে যায়। কষ্টিপাথরের দণ্ডায়-মান অপরূপ একক মূর্তি। মাথার ওপরে রুপোর ছত্র। গায়ে চমৎকার পোশাক। সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কার। হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করে তিনি আমাকে অভয় দান করছেন।

পূজারী আরতি করছেন। তালে তালে ঘণ্টা ও কাঁসর বাজছে। ভক্তবৃন্দ মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন,

—দ্বারকানাথজী কি……জয়!

—কৃষ্ণকান্হাইয়া কি……জয়!

—রণছোড়জী কি……জয়।

একটা শব্দময় আশ্চর্য-সুন্দর ধ্যানগম্ভীর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে আমার চারিপাশে।

পূজারী আরতি শেষ করলেন। তিনি শান্তিবারি বর্ষণ করছেন। আমি বহু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু বেশ কয়েক ফোঁটা শান্তিজল আমার গায়ে পড়ল। আমার মন-প্রাণ স্বর্গীয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হল। আমি কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণকে প্রণাম করলাম।

তাঁর কাছে আমি শ্রীর আশু আরোগ্য কামনা করি, শঙ্করী পূর্ণিমা ও ভৌমিকবাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর বলি—ঠাকুর! তুমি আমার মানসীকে শান্তি দাও, তাকে সুখী কর।

আমি তাঁকে আবার প্রণাম করি। যুগে যুগে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ, কবীর ও নানক, মেহতা ও বিবেকানন্দ এসে যাঁকে প্রণাম করেছেন, আমি সেই প্রাণপুরুষকে প্রণাম করি। যুগাতীত কাল থেকে এই আসমুদ্র-হিমাচলের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যিনি ধারণ করে রয়েছেন, আমি সেই পুরাণ-পুরুষকে প্রণাম করি। আমি বিশ্ব-ইতিহাসের মহোত্তম মহামানবকে প্রণাম করি।

ভক্ত-সাধিকা মীরাবাঈ যাঁর দেহে বিলীন হয়ে রয়েছেন, আমি সেই প্রেমময় পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি। সমবেত ভক্তদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও গাইতে থাকি :

'পিয়া ম্হাঁরে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী।
নৈণাঁ আগে রহজ্যো
ম্হাঁনো ভুল মত জাজ্যো জী॥
ভৌসাগরমেঁ বহী জাত হুঁ
বেগ মহাঁরী সুধ লীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
মিল বিছুড়ন মত কীজ্যো জী॥'

—হে প্রিয়তম, তুমি আমার দু' চোখের সামনে দাঁড়াও। আমার দৃষ্টির সামনে চিরস্থায়ী হও। কৃপা করে তুমি আমাকে ভুলে যেও না। ভবসাগর যে বয়ে যায়, তুমি তাড়াতাড়ি আমার খবর নাও। হে মীরার প্রভু, হে প্রিয়তম গিরিধারী, একবার আমাকে দেখা দিয়ে তুমি যেন আবার আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।

। আট ।

মন-দ্বারকার পথ দিয়ে টাঙ্গা চলেছে ছুটে। রণছোড়জীকে দর্শন করে পরিতৃপ্ত অন্তরে আমরা ফিরে চলেছি গাড়িতে। না, গাড়ি নয় বাড়ি। গাড়িকে বাড়ি করে আমরা আজ দু-সপ্তাহ ধরে রাজস্থান ও গুজরাত ভ্রমণ করছি।

কিন্তু ভ্রমণের কথা নয়; রণছোড়জীর কথাই আলোচনা করছি।

পাণ্ডাজী বলছেন, "আপনারা যে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে এলেন, সেটি রণছোড়জীর আদি-বিগ্রহ নয়, প্রতিনিধি বিগ্রহ। আদি-বিগ্রহ রয়েছেন আমেদাবাদের কাছে ডাকোরে। প্রভাস থেকে আপনারা ডাকোর যাবেন, দর্শন করবেন আদি-রণছোড়জীকে।

"ডাকোরের পাণ্ডারা বলেন, বন্দানো নামে সেখানকার জনৈক দরিদ্র-ভক্তের সঙ্গে রণছোড়জী নিজেই চলে গিয়েছেন সেখানে। আর পণ্ডিতরা বলেন, ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাকোরবাসীরা রণছোড়জীকে চুরি করে নিয়ে যায়।"

"এটি তাহলে দ্বিতীয় বিগ্রহ?" পাণ্ডাজী থামতেই দাদা প্রশ্ন করেন।

পাণ্ডাজী উত্তর দেন, "না, তৃতীয়। দ্বিতীয় বিগ্রহটিও সওয়া দু'শ বছর আগে চুরি হয়ে যায়। তিনি রয়েছেন বেট-দ্বারকায়, আগামী-কাল আপনারা তাঁকে দর্শন করবেন।"

"কিন্তু বেট-দ্বারকায় তো শুনেছি শঙ্খনারায়ণ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মৃদু হেসে পাণ্ডাজী বলেন, "ওরা তাই বলে বটে। না বললে যে সবাই ওদের চোর বলবে। আপনারা কাল যাচ্ছেন সেখানে, দেখতে পাবেন, ওরা যে নামই দিয়ে থাকুক্, তিনিও রণছোড়জী।"

সেই আদি ও অকৃত্রিম সমস্যা—আসল আর নকলের ঝগড়া। এ কলহ চিরকালের। নবদ্বীপ ও মায়াপুর, গোকুল-মহাবন আর গোকুলের মতই বেট-দ্বারকা আর দ্বারকার কলহও মিটবে না কোন কালে। দ্বারকার মানুষরা বলেন, তাঁদের দ্বারকাই আসল দ্বারকা, আবার বেট-দ্বারকার বাসিন্দারা দাবী করেন, তাঁরাই প্রাচীন ও প্রকৃত দ্বারকার অধিবাসী। অতএব আসল আর নকলের কথা থাক্ পাণ্ডাজীর কথা শোনা যাক্। পাণ্ডাজী বলে চলেছেন, "প্রতি বছর এক নির্দিষ্ট তিথিতে বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটি রঙীন পাখী সমুদ্র থেকে সোজা উড়ে আসে দ্বারকাধীশের মন্দিরে। আমরা তার গায়ের রঙ দেখে মৌসুমী বায়ুর গতি ঠিক করতে পারি।

"পাখীটা উড়ে এসে একেবারে গর্ভ-মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের

পায়ের কাছে বসে। নির্বিকার চিত্তে নৈবিদ্যের চাল খেতে সুরু করে। খাওয়া শেষ হবার পরে সে রণছোড়জীর সামনে নাচগান আরম্ভ করে দেয়। ক্লান্তিহীন ভাবে বেশ কিছুক্ষণ একটানা নাচগান করার পরে হঠাৎ সে রণছোড়জীর পায়ের কাছে পড়ে যায়, একটু বাদে সেই অবস্থাতেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।"

"মারা যায়!" আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ।" পাণ্ডাজী বলেন, "আর এ নিয়ম চলে আসছে বহু কাল থেকে, অন্তত সম্রাট আকবরের সময় থেকে। কারণ আবুল ফজল এই পাখীটির কথা বলে গিয়েছেন।"

পাণ্ডাজী বলে চলেছেন দ্বারকা ও দ্বারকাধীশের কথা। শুনতে খারাপ লাগছে না। তবু কেন যেন আমার মনে পড়ছে অন্য কথা। যিনি লুপ্তপ্রায় দ্বারকাকে প্রকট করে তুলেছিলেন, যিনি ধ্বংসপ্রায় হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, আমি ভাবছি সেই আচার্য শঙ্করের বিস্ময়কর জীবনকথা—

বেদান্ত এবং উপনিষদের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যকে সেকালে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও পণ্ডিতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, আর একালে তিনি শঙ্করাবতার রূপে পূজিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তাঁর কোন নির্ভুল জীবনী নেই। এই যুগাবতারের মহাজীবনকে অবলম্বন করে যে-ক'খানি পুস্তক প্রণীত হয়েছে, তা থেকে আমরা তাঁর পার্থিব জীবন সম্পর্কে সামান্য কথাই জানতে পারি।

মাধবাচার্যের 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি মালাবারের কালাদি গ্রামে (বর্তমান কেরালার কানাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম শিবগুরু, মায়ের নাম সতীদেবী। কিন্তু চিদ্বিলাস যতির 'শঙ্কর বিজয়' বইয়ে বলা হয়েছে তাঁর পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম আর্যাম্মা।

আবার আনন্দগিরির 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর মা হলেন পরমাসুন্দরী বিশিষ্টা। বিশ্বজিৎ নামক জনৈক সংসার-বিরাগী ভক্ত-ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিশিষ্টার। বিয়ের পরে স্বামী কিছুদিন ঘরে ছিলেন। তারপরেই তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বনবাসী

হন। বিরহিনী বিশিষ্টা মহাদেবের সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বিশিষ্টার কামনা পূর্ণ করেন। বিশিষ্টা একটি দেবদুর্লভ পুত্রলাভ করলেন। তিনিই শঙ্কর।

ঐ সব গ্রন্থে কিন্তু শঙ্করের জন্ম-তারিখ কিংবা জীবনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও এই যুগাবতারের আবির্ভাবকাল নিয়ে কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ সম্পর্কে এখন প্রধান তিনটি মত হল—শঙ্করাচার্য ৬৮০, ৬৮৬ অথবা ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন।

পাঁচ বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। আর তারপরেই একদিন নদীতে স্নান করতে নেমে তিনি কুমীরের সামনে পড়ে যান। কিন্তু বালক শঙ্কর আশ্চর্য কৌশলে কুমীরের কবলমুক্ত হন।

কৈশোর বয়সেই শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি নর্মদার তীরে গোবিন্দপাদের কাছে দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপরে তপস্যা করতে বদ্রীনাথ চলে যান এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরে জ্যোতির্মঠ (জোশীমঠ) প্রতিষ্ঠা করেন।

এই মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচনে আচার্য শঙ্কর অথর্ববেদের ওপরে এক তর্কসভার আয়োজন করেছিলেন। কারণ হিমালয় হল ঔষধির অক্ষয় ভাণ্ডার আর অথর্ব বেদ হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক। তাই তিনি প্রথম তিনটি বেদ বাদ দিয়ে চতুর্থ বেদের ওপরে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। দূরদর্শী শঙ্করাচার্য নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যে, হিমালয়ের ঐ মঠটির অধ্যক্ষ শুধু দেবপূজাই করবেন না, সেই সঙ্গে ঔষধি নিয়ে গবেষণা করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তোটকাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত জ্যোতির্মঠের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন।

বদ্রীনাথ তখন বৌদ্ধদের অধিকারে। নারায়ণের ধ্যানমূর্তিকে বৌদ্ধমূর্তিরূপে প্রচার করে তাঁরা বদ্রীনাথকে বৌদ্ধতীর্থে রূপান্তরিত করেছিলেন। শঙ্করাচার্য সেখানে গিয়ে বৌদ্ধদের তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেন। বৌদ্ধরা তিব্বতে চলে গেলেন। শঙ্করাচার্য কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীকে হিন্দুতীর্থ রূপে ঘোষণা করলেন। গুরু হয়ে

গেল তীর্থযাত্রা। সে যাত্রা আজও চলছে, চিরকাল চলবে।

গিরিতীর্থ উদ্ধারের পরে আচার্য শঙ্কর কুমারিলের ভট্টপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপরে রওনা হলেন কাশ্মীর। কাশ্মীর তখন সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ পীঠ। শঙ্করাচার্য সেখানে গিয়ে কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মদন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করলেন। উদার মদন মিশ্র শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত প্রচারের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি শঙ্করের সঙ্গী হলেন। আচার্য শঙ্কর দ্বারকায় এসে সারদামঠ প্রতিষ্ঠা করে মদন মিশ্রকে প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

উত্তরে বদ্রীনাথে জ্যোতির্মঠ ও পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ প্রতিষ্ঠার পরে আচার্য শঙ্কর দক্ষিণে রামেশ্বরমে শৃঙ্গেরীমঠ ও পুবে পুরীতে গোবর্ধনমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে সেই মঠ দুটির অধ্যক্ষ মনোনীত করলেন।

তারপরে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে দশনামী তীর্থ ও আশ্রম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করে তাঁদের সবাইকে এই চার মঠের অধীনে আনলেন।

মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। কেউ বলেন বদ্রীনাথ থেকে স্বয়ং শিব শঙ্করাচার্যকে কৈলাসে নিয়ে যান। আবার কেউ বা বলেন ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধরা তাঁকে বদ্রীনাথ থেকে তিব্বতে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আর এ অনুমানকে কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ মানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে বদ্রীনাথ থেকে তিব্বতের দূরত্ব যেমন খুব বেশি নয়, তেমনি পথও মোটেই দুর্গম নয়।

বলা বাহুল্য, শঙ্কর-বিরোধীদের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হয় নি। স্বল্পায়ু জীবনের কর্ম ও সাধনা দিয়ে শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের যে শক্ত ভিত স্থাপন করে গিয়েছেন, আজও সনাতন ধর্ম সেখানে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শঙ্কর শুধু মঠ প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম প্রচার করেন নি, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অসংখ্য সাবলীল অথচ চিন্তাশীল রচনার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম ও শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁর লিখিত ২৬৭ খানি পুঁথির নাম

পাওয়া যায়। তবে পণ্ডিতগণ মনে করেন এগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালের শঙ্কর-শিষ্যদের রচনা। তাহলেও তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং বিবেকচূড়ামণি সহ বহু স্তোত্র রচনা করে গিয়েছেন।

এর অধিকাংশ রচনাই আমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব হয় নি। তাহলেও আমি বলব শঙ্করাচার্য কেবল পণ্ডিত এবং দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুকবি। আব একটি মাত্র স্তোত্রই সহস্রাধিক বছর ধরে কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁকে কবির আসনে সমাসীন করে রেখেছে। সেটি তাঁর সেই অক্ষয় ও অব্যয় গঙ্গাস্তোত্র—

> 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে
> ত্রিভুবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে।
> শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণী বিমলে
> মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে ॥...'

শঙ্করাচার্য সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম। তিনিই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রচারক। তাঁর অদ্বৈতবাদের মূল কথা—এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মই (চৈতন্য বা আত্মা) একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রকাশের আর কোন বাধা থাকে না এবং এই অবস্থার নামই মুক্তি। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানতার অপসারণ অর্থাৎ মুক্তি সম্ভব।

"ভাই নামবে না টাঙ্গা থেকে? আমরা যে এসে গিয়েছি।"

দিদির ডাকে শঙ্করের ভাবনা টুটে যায়, ফিরে আসি বাস্তবে। তাকিয়ে দেখি, টাঙ্গা দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বারকা স্টেশনের সামনে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি। সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি গাড়িতে—আমাদের সচল-বাড়িতে।

গাড়িতে এসেই খাবার পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে রণছোড়জীর প্রসাদ। সরকারদা সামন্তবাবু ও মাসিমা দ্বারকাধীশকে রাজভোগ দিয়েছেন। সত্যই রাজভোগ—ডাল ভাত লুচি ভাজা তরকারী ও মিঠাই। তিন-চারজন লোকের ভরপেট খাবার। ভালই হল, আজ প্রায় দু-সপ্তাহ বাদে মাসিমা চারটি পেট ভরা ডাল-ভাত খেতে পারবেন।

খাবার পরে কেউ শুয়ে পড়েছেন, কেউ তাসের আড্ডায় বসেছেন, কেউ বা মহাভারতের আসর বসার অপেক্ষায় রয়েছেন। আমি বসে বসে 'গোপী তালাও'-য়ের কথা ভাবছি—

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা সংবরণের সংবাদ শুনে বিরহব্যাকুলা গোপিনীরা সেই তালাও বা কুণ্ডের জলে দেহত্যাগ করেছিলেন। জায়গাটার দূরত্ব দ্বারকা থেকে মাত্র ২৪ কিলো-মিটারের মতো, কিন্তু যাতায়াতে বড়ই ঝামেলা। সারাদিনে মাত্র দু'খানি বাস—সকালে ও দুপুরে। দুটিই চলে গিয়েছে। ম্যানেজার জনৈক ট্রাক্-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছিল। সে দু'শো টাকা পেলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ঘুরিয়ে আনতে রাজীও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র আটজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁরাও জন-প্রতি পঁচিশ টাকা খরচ করে গোপী-তালাও দর্শনে অক্ষম। ফলে দ্বারকা এসেও গোপী-তালাও দেখা হল না আমার।

সহসা ম্যানেজার এসে হাজির হয়। দ্বারকাধীশ মন্দিরের সেই ঘটনার পর থেকে সে আর আমার এত কাছে আসে নি। আমি তার দিকে তাকাই। সে বলে, "ঘোষদা! একবার একটু বাইরে আসবেন?"

"কোথায়?" জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়, "এই, প্লাটফর্মে।"

"কোন দরকার আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। চলুন না একবার।"

আর কথা না বাড়িয়ে ম্যানেজারের পেছনে পেছনে গাড়ি থেকে নেমে আসি। ম্যানেজার কথা বলছে না বলে আমিও নীরব। নিঃশব্দে তার সঙ্গে হাঁটতে থাকি। স্টেশন-মাস্টারের অফিস ছাড়িয়ে প্লাটফর্মের

অপরপ্রান্তে আসি।

হঠাৎ ম্যানেজার আমার একখানি হাত ধরে বলে ওঠে, "ঘোষদা! সত্যি বলছি ঘোষদা, আমি এখনও ভাবতে পারছি না, আপনি শঙ্কু মহারাজ···আমি ভাবতে পারছি না, যাঁর লেখা আমার এত ভাল লাগে, তিনি এতদিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছেন! বিশ্বাস করুন, আজ দুপুরে আমি একদম খেতে পারি নি।" পাঁচুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার কম্পন।

হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ওর কাঁধে রাখি। স্নিগ্ধস্বরে বলি, "এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আপনি অযথা এত ভাবছেন কেন ভাই! আমিও আপনারই মতো একজন চাকুরিজীবী অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। আর লেখকরা সবাই মানুষ, তাঁরা কেউ স্বর্গের দেবতা নন।"

"না। মানে এতদিন, বলতে গেলে আপনাকে কোন যত্ন করি নি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ঘোষদা!" পাঁচু আবার আমার একখানি হাত নিজের দু-হাতের মুঠোয় তুলে নেয়।

আমি আবার বলি, "জানি না যত্ন বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? তবে কোন অযত্ন যে করেন নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।"

গাড়িতে ফিরে এসে দেখি সরকারদার কৃষ্ণকথার আসর আরম্ভ হতে চলেছে। আমি নিঃশব্দে দিদির পাশে এসে বসি। সরকারদা শুরু করেন—

"গতকাল আমি আপনাদের কাছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ পর্যন্ত বলেছি।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "তারপরে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখতে পাই উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদের কাছে, যখন ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সঞ্জয় শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনারা জানেন দুর্যোধন ও কর্ণের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ-পুরোহিতকে সসম্মানে বিদায় দিয়েছিলেন এবং তারপরে তিনি শান্তির প্রস্তাব দিয়ে সঞ্জয়কে

পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

"কথায় কথায় সঞ্জয় সেদিন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—কৌরবরা যদি আপনাকে রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তাহলেও আপনার পক্ষে যুদ্ধ করে রাজ্যলাভ করা উচিত হবে না। কারণ আপনি ধার্মিক, আপনার পক্ষে ক্ষমাই শ্রেয়, ভোগের ইচ্ছা সমীচীন নয়। যদি আপনার স্বজনরা আপনাকে যুদ্ধের পরামর্শ দেন, তাহলে বরং তাঁদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে যান, তবু যুদ্ধ সমর্থন করে আপনি স্বর্গের পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না।

"বলাবাহুল্য যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের পরামর্শ মানতে পারলেন না। তবু তিনি বললেন—মহাযশা বাসুদেব আমাদের দু-পক্ষেরই হিতার্থী, সে-ই বলুক, আমার কি করা কর্তব্য ?

"কৃষ্ণ তখন বললেন—আমি দু-পক্ষেরই শুভার্থী। আমিও শান্তি চাই। যুধিষ্ঠির তো তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ছেলেরা লোভী, তারা চোর। যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়, তিনি নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে চাইছেন। এতে তাঁর ধর্মলোপ হবে কেন, তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হবেন কেন ?

"—পাণ্ডবদের ক্ষতি না করে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে তা আমার পক্ষেও পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হবে। কাজেই আমি নিজে একবার কৌরবসভায় যাব, নীতি ও ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী তাঁদের কিছু পরামর্শ দেব। জানি না তাঁরা তা বিবেচনা করবেন কিনা, জানি না দুর্যোধন আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করবে কিনা ? তাহলেও আমি যাব। সঞ্জয় তুমি শুধু ধৃতরাষ্ট্রকে বলো—পাণ্ডবরা যেমন শান্তিকামী, তেমন তাঁরা যুদ্ধ করতেও সমর্থ।

"কৃষ্ণের বক্তব্য শেষ হবার পরে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন—তুমি এখন যেতে পার। তুমি দুর্যোধনকে বলো, সে রাজা, তার অপরের রাজ্য অপহরণ করা উচিত নয়। তাকে বলো, আমরা শান্তি চাই। সে যদি একটি প্রদেশ, নিদেন পক্ষে পাঁচটি গ্রাম—কুশস্থল বৃকস্থল মাকন্দী বারণাবত ও আরেকটি গ্রাম আমাদের দেয়, তাহলেই আমি যুদ্ধ পরিহার করতে প্রস্তুত আছি। সঞ্জয়, আমি সন্ধি অথবা সংগ্রাম

উভয়ের জন্যই প্রস্তুত, তুমি দুর্যোধনকে এই কথাটি ভাল করে বুঝিয়ে দিও।

"সঞ্জয় চলে যাবার পরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—এখন তুমিই আমাদের ত্রাণকর্তা। লুব্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি চাইছেন। আমি মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছি, মনে হচ্ছে দুর্যোধন তাও আমাকে দেবে না। আমরা যেমন কুলক্ষয় চাই না, তেমনি পৈতৃক সম্পত্তিও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই। আর তা ত্যাগ করলে আমি আমার মা ও পরিজনদের প্রতিপালনই বা করব কি ভাবে! মাধব! এখন তুমিই বল, আমাদের কি করা উচিত? কি ভাবে আমি স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা করতে পারি? তোমার চেয়ে আপন আমাদের আর কে আছে বল?

"কৃষ্ণ বললেন—মহারাজ! আপনাদের দু-পক্ষের মঙ্গলের জন্যই আমি কৌরবসভায় যাব। আপনার স্বার্থ হানি না করে আমি সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করব। তবে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির ভরসায় দুর্যোধন নিজেকে প্রবল মনে করছে। কাজেই নরম কথায় কোন কাজ হবে না। আমি তাই সবার সামনে আপনার গুণ ও দুর্যোধনের দোষের কথা বলব, তাকে তিরস্কার করব। তাহলেও সে সন্ধি করবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

"তারপরে দিন-ক্ষণ দেখে কার্তিকমাসের এক সুন্দর সকালে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর রওনা হলেন। রওনা হবার আগে তাঁর নির্দেশে সারথি দারুককে শঙ্খ চক্র গদা ও তূণী প্রভৃতি সমস্ত দিব্যাস্ত্র রথে তুলে নিতে বললেন। কারণ শত্রুকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। শুধু তাই নয়, তিনি সাত্যকিকেও সঙ্গে নিলেন।

"এদিকে কৃষ্ণ আসছেন শুনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পুত্রদের আদেশ দিলেন। বললেন—আমি তাঁকে অশ্বসহ ষোলটি স্বর্ণভূষিত রথ, আটটি মদস্রাবী হাতি, একশ' কুমারী ও রূপসী দাসী, একশ'জন দাস, কম্বল মৃগচর্ম ও বিমলমণি প্রভৃতি উপহার দেব'। দুর্যোধন-সহ আমার সব পুত্র ও পৌত্ররা তাঁকে সংবর্ধনা জানাবে। সালংকারা বারাঙ্গনাগণ ও ঘোমটাহীনা মেয়েরা তাঁকে

বরণ করবে।

"সেইভাবেই সেদিন হস্তিনাপুরে কৃষ্ণকে সংবর্ধনা জানানো হল। কিন্তু কৃষ্ণ সবার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের পরেই বিদুরের বাড়িতে চলে গেলেন। কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে পাণ্ডবদের কুশল-সংবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে বললেন।

"তিনি সেদিন বহু অনুরোধেও দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন না। স্পষ্টবক্তা কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—দুরভিসন্ধির জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়। আমি কেবল বিদুরের অন্ন গ্রহণ করতে পারি।

"রাতে বিদুর তাঁকে বললেন—কেশব, এখানে তোমার আসা উচিত হয় নি। দুর্যোধন অধার্মিক ক্রোধী দুর্বিনীত ও মূর্খ। কৌরব-সভায় সবাই তোমার শত্রু, তুমি কি করে সেখানে যাবে?

"কৃষ্ণ সবিনয়ে বললেন—আপনি প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি সব জেনেও এখানে এসেছি। আমি কুরু-পাণ্ডবের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য একবার শেষ চেষ্টা করব। নইলে লোকে বলবে আমি উভয়ের মিত্র নই। দুর্যোধন যদি আমার কথা না শোনে, তবে সে কালের কবলে পড়বে।

"পরদিন সকালে কৃষ্ণ কৌরবসভায় এলেন। সবাই আসন গ্রহণ করার পরে সুবক্তা কৃষ্ণ সুগম্ভীর স্বরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলতে থাকলেন—ভরতনন্দন! যাতে কুরু-পাণ্ডবের সন্ধি হয়, বীরকুলের বিনাশ না হয়, আমি তারই জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান হয়েও আপনার ছেলেরা অশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য এবং লোভী। এরা ধর্ম ও অর্থ পরিহার করে নিজেদের সবচেয়ে আপনজনের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করছেন। আপনি ইচ্ছা করলেই এ যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। আপনি ছেলেদের শাসন করুন, সন্ধির জন্য যত্নবান হোন। সন্ধি হলে সবারই মঙ্গল। পাণ্ডবরা আপনার সহায় হলে আপনি ইন্দ্রেরও অজেয় হবেন। আর যুদ্ধ হলে অযথাই অসংখ্য প্রাণ নষ্ট হবে। পাণ্ডব ও কৌরব যারাই মারা যাক্, আপনি দুঃখ পাবেন। আপনি তো পাণ্ডবদেরও পিতৃতুল্য। তারা আপনাকে

বলেছে—আপনার আদেশে তারা বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস করেছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নি। আপনি তাদের পিতা, এবারে আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন। তাদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিন। আপনি কুরু-পাণ্ডবদের সৎপথে আনুন, নিজেও সৎপথে থাকুন। আর পাণ্ডবরা এই সভার সভাসদদের বলেছে—এঁরা সবাই ধর্মজ্ঞ। সুতরাং এঁরা যেন অধর্মের সহায় না হন। যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে নষ্ট করে, সে সভা বিনষ্ট হয়।

"একবার কৃষ্ণ একটু থামলেন। তারপরে তিনি সভাসদদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন রাখলেন—এবারে আপনারাই বলুন, আমার বক্তব্য ধর্মসংগত এবং অর্থকর কিনা?

"কৃষ্ণ নীরব হলেন। উপস্থিত রাজারা মনে মনে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেও দুর্যোধনের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহসী হলেন না। তাঁরা নীরব রইলেন।

"মৃদু হেসে কৃষ্ণ তখন আবার ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে বলতে শুরু করলেন—মহারাজ। আমি আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, আপনি ক্ষত্রিয়দের মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত করুন। দয়া করে স্নেহান্ধ হবেন না। নিঃস্বার্থ হয়ে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলুন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, মহারাজা যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু। তা সত্বেও তাঁকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল, শকুনি কপট দ্যূতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করেছে। প্রকাশ্য রাজসভায় নিজের স্ত্রীকে বিবসনা করতে দেখেও তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নি। সেই সত্যাশ্রয়ী ধর্মাত্মার সঙ্গে আপনি অধর্মাচরণ করবেন না।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহারাজ! আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আরও একটি কথা আপনাকে জানাতে চাই—পাণ্ডবরা যেমন আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, তেমনি যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। তারা কি করবে, তা আপনিই স্থির করুন।

"সভাসদ এবং রাজন্যবর্গ নীরব থাকলেও নীরব রইলেন না উপস্থিত ঋষিগণ। কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য শেষ করার পরেই পরশুরাম

মুখ খুললেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পুরাকালের রাজা দম্ভোদ্ভব এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ তপস্বী নর ও নারায়ণের কাহিনী বললেন। বললেন, সেই ক্ষুৎপিপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ নিরস্ত্র দুই ঋষি কেমন করে শক্তিমদে মত্ত সসৈন্য রাজা দম্ভোদ্ভবের দম্ভ চূর্ণ করলেন।

"কাহিনী শেষ করে পরশুরাম ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন—পুরাকালের সেই দুই যোগ-তপস্বী নর ও নারায়ণই একালে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আপনার ছেলেদের পক্ষে পাণ্ডবদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে যুদ্ধে মত দেবেন না।

"পরশুরামের পরে মহর্ষি কণ্ব সুমুখ ও গরুড়ের উপাখ্যান বলে দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন—বৎস, যতদিন তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হচ্ছ, ততদিনই তুমি জীবিত থাকবে। বিরোধ ত্যাগ কর। বাসুদেবকে আশ্রয় করে নিজের কুল রক্ষা কর।

"কণ্বের উপদেশ শেষ হবার পরে নারদ দুর্যোধনকে বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবীর গল্প বললেন। বললেন—অভিমানের ফলে যযাতি স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন আর অতিশয় নির্বন্ধের জন্য গালবও দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তোমাকে বলি, তুমি অভিমান ক্রোধ ও হিংসা ত্যাগ কর। পাণ্ডবরা তোমার ভাই, তুমি তাদের সঙ্গে সন্ধি কর।

"নারদ থামতেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন—কৃষ্ণ তুমি যা বলেছো এবং ঋষিরা যা বললেন, সবই ধর্মসংগত এবং ন্যায্য। কিন্তু বৎস, আমি পরাধীন। আমার ছেলেরা আমার কথা শোনে না। তারা গান্ধারী, বিদুর এবং ভীষ্মদেবের কথাও শোনে না। তুমি বরং আরেকবার দুর্যোধনকে একটু বুঝিয়ে বল।

"কৃষ্ণ তখন মধুরকণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ বংশে জন্মগ্রহণ করেছো, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত। তোমার জ্ঞাতি এবং মিত্রগণ সবাই সন্ধি চান। তোমার সব সৈন্য এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যে পেরে উঠবে না, বিরাটনগরে তুমি একবার তার প্রমাণ পেয়েছো। এবারে আমি তার সঙ্গে থাকব। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়ে কৌরবকুলকে

বিনষ্ট করো না। পাণ্ডবরা বলেছে, তারা তোমাকে যুবরাজ এবং ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজের পদে বরণ করবে। তুমি তাদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষ্মী লাভ কর।

"বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দুর্যোধন উত্তর দিলেন—পাণ্ডবরা দূরের কথা, দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে পরাজিত করতে পারবেন না। আমি বেঁচে থাকতে পাণ্ডবরা রাজ্যের অর্ধাংশ পাবে না। আমি যখন নাবালক ছিলাম, তখন আমার বাবা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তা পালন করতে বাধ্য নই। রাজ্যের অর্ধাংশ কিংবা পাঁচখানি গ্রাম তো দূরের কথা একটা সরু ছুঁচের আগায় যতটুকু মাটি ওঠে, তাও আমি পাণ্ডবদের দেব না।

"—এই তো তোমার শেষ কথা? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

"—হ্যাঁ।

"—এবারে তাহলে আমাকে বিদায় দাও।

"—না। দুর্যোধন উত্তর দিলেন—তুমি আর তোমার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারবে না।

"—মানে!

"—খুব সোজা। আমি তোমাকে বন্দী করলাম।

"কৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার। তিনি একটু হেসে দুর্যোধনকে বললেন—দুর্যোধন, তুমি মোহান্ধ। তুমি ভেবেছো, আমি একা। তাই তুমি আমাকে বন্দী করতে চাইছো। কিন্তু এই দেখো, পঞ্চ-পাণ্ডব অন্ধক বৃষ্ণি আদিত্য রুদ্র ও বসুগণ এবং মহর্ষিরা সবাই আমার সঙ্গে রয়েছেন। এই বলে তিনি অট্টহাসিতে দশদিক প্রকম্পিত করে তুললেন। আর সেই কম্পনের মাঝে সবাই দেখতে পেলেন, তাঁর ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র ও মুখে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ পঞ্চ-পাণ্ডব ও বলরাম প্রভৃতি যাদবগণ আবির্ভূত হচ্ছেন।

"কৃষ্ণের এই ঘোর মূর্তি দেখে সভার প্রায় সবাই সভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর সঞ্জয় ও ঋষিরা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। কারণ তিনি তাঁদের দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন। আর দেখতে পেলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। জনার্দন তাঁকেও দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন।

"দেবতা গন্ধর্ব ও ঋষিদের অনুরোধে কৃষ্ণ পূর্ব-স্বরূপ গ্রহণ করলেন। তারপরে সাত্যকি ও বিদুরের হাত ধরে কৌরবসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রথমে তিনি কুন্তীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব সংবাদ দিলেন, তারপরে কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কর্ণ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন—সব কিছু জেনেও তুমি কেন আমাকে ভোলাতে চাইছো? আমি জানি পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি আর আমি তার উপলক্ষ্য। আমি স্বপ্ন দেখেছি, যুধিষ্ঠির তোমার প্রদত্ত রক্তাক্ত পৃথিবী গ্রাস করছে।"

একবার থামলেন সরকারদা। তারপরে আবার বললেন, "আপনারা জানেন, কুন্তীদেবীও কর্ণকে দলে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নি।"

"হ্যাঁ।" দাদা বলেন, "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।"

সরকারদা কিছু বলতে পারার আগেই উমাদি আবৃত্তি শুরু করেন—

'মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
............যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই॥'

॥ নয় ॥

বিকেল পাঁচটায় আবার টাঙ্গায় সওয়ার হতে হল। এবারে কিন্তু টাঙ্গা চলল ভিন্ন পথে। এ. সি. সি.-র কারখানার পাশ দিয়ে। কর্মচারী কলোনী ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে। ছোট শহর। সুতরাং সময় বেশি লাগল না।

একটি প্রশস্ত বাঁধানো পথের পাশে টাঙ্গা থামল। পাণ্ডাজী বললেন, "এই পথটি ওখা চলে গিয়েছে।"

"তাহলে মোটরে করেও বেট-দ্বারকা যাওয়া যায়?" অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

পাণ্ডাজী জবাব দেন, "বেট-দ্বারকা নয়, ওখা। বেট-দ্বারকা একটা দ্বীপ। কাজেই সেখানে যেতে হলে ওখা থেকে আপনাকে নৌকা কিংবা লঞ্চে চড়তেই হবে।"

"তা লঞ্চ পেলে নৌকোয় চড়ব কেন?"

"বেশ তো, তাই চড়বেন, এখন এগিয়ে চলুন।" ম্যানেজার মাঝখান থেকে অমিয়বাবুকে বলে।

"কোথায়?" অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন।

"ঐ যে সামনে, রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে।" ম্যানেজার ইসারা করে।

তাকিয়ে দেখি খানিকটা দূরে, সাগরের বালুকাবেলায় প্রায় জলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দির। একটি নয়, দুটি মন্দির—একটি ছোট, একটি বড়। চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা। জলের ধারে বলেই বোধহয় নির্মাতারা মন্দিরের ভিত এত উঁচু করেছেন।

পশ্চিমমুখী মন্দির অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে রুক্মিণী মন্দিরটি। সেদিকেই মন্দিরের প্রধান তোরণ। আমরা মন্দিরের পেছনদিকে টাঙ্গা থেকে নেমে বালিময় বেলাভূমির ওপর দিয়ে মন্দিরে চলেছি। পাণ্ডাজী ইসারায় দ্বারকাধীশ মন্দির দেখিয়ে দিলেন। বললেন—রুক্মিণী ও দ্বারকাধীশের দূরত্ব দেড় মাইলের মতো।

দক্ষিণদিকেও ছোট একটি দরজা রয়েছে দেখছি। সেটি দিয়েই অর্থাৎ মন্দিরের বাঁ-পাশ দিয়ে আমরা মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করি। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে।

একই গড়নের দুটি মন্দির—একটি বড়, একটি ছোট। বড়টি ডানদিকে—রুক্মিণী মন্দির, ছোটটি বাঁদিকে—মহাবীর মন্দির। মহাবীর মানে জৈন-তীর্থঙ্কর নয়, রামভক্ত বীর হনুমান। তাঁর সঙ্গে রুক্মিণীর কি সম্পর্ক জানা নেই আমার। তাহলেও কলির দ্বারকায় যখন দ্বাপরের রুক্মিণী মন্দিরে ত্রেতার হনুমানজী হাজির হয়েছেন, তখন আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে দর্শন করব না কেন?

হনুমানজীকে দর্শন করে উঠে আসি শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণী দেবীর মন্দিরে।

মাঝারি আকারের গোল নাট-মন্দির পেরিয়ে গর্ভ-মন্দির। ভেতরে পাথরের বেদীর ওপরে সাদা সিংহাসনে শ্বেত-পাথরের দণ্ডায়মানা রুক্মিণীর চতুর্ভুজা মূর্তি। হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। অর্থাৎ মর্ত্যের কৃষ্ণপ্রিয়া স্বর্গের বিষ্ণুপ্রিয়া হয়েছেন।

পাণ্ডারা বলেছেন—তিনি নাকি স্বামীর ওপর অভিমান করেই চলে এসেছেন এখানে। এবং তিনি তাঁর এই রূপ-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ভক্তদের বোঝাতে চেয়েছেন—কৃষ্ণের মতো স্বামী পেয়েও দেখো, আমি সুখী হই নি। শেষ পর্যন্ত আমাকে বিষ্ণুর শরণ নিতে হয়েছে। অতএব তোমরাও স্বামী এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মায়ায় অন্ধ না হয়ে, শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হও।

বলাবাহুল্য, অনিবার্য কারণেই পাণ্ডারা বলেন নি যে, রুক্মিণী ও লক্ষ্মী যেমন অভিন্না, তেমনি অভিন্ন কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু। স্বর্গের লক্ষ্মী-নারায়ণ মর্ত্যে এসে রুক্মিণী ও কৃষ্ণ হয়েছেন।

রুক্মিণী-মাকে প্রণাম করে আমরা নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। কারুকার্যহীন সাধারণ মন্দির, কেবল দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। রুক্মিণীর বিভিন্ন লীলার ছবি—তাঁর দুর্বাসাপূজন, শাপমোচন, তপস্বীজীবন, শ্রীচরণগঙ্গা প্রাপ্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ।

একজন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ব্রাহ্মণ কাছে আসেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন, বিশ্রাম করুন। পিপাসা পেলে জলপান করুন।"

"জল! জল খাওয়াতে পারেন নাকি ঠাকুরমশাই?" ছোট ঠাকুরমা জলের নাম শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠেছেন।

"কেন পারব না মা!" পূজারী সবিনয়ে নিবেদন করেন, "আপনাদের সেবা করবার জন্যই তো আমরা এখানে রয়েছি। মন্দিরের পেছনে চলে যান, সেখানে ঠাণ্ডা জল রয়েছে।"

এমনিতেই দ্বারকায় জলাভাব। তার ওপরে এ মন্দিরটি লোকালয়ের বাইরে, সমুদ্রের ধারে। এঁরা এত জল পান কোথায়? প্রশ্নটা না করে পারি না।

পূজারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন, "আর বলেন কেন বাবা! দু'মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয়। শুধু জলের জন্যই দৈনিক দশ থেকে পনেরো টাকা খরচ হয়। তাহলেও তো না আনিয়ে পারি না। আপনারা শ্রান্ত হয়ে এখানে আসেন। পিপাসার সময় যদি একটু জলও না দিতে পারি?"

"তা তো বটেই।" উকিলবাবু ধুয়ো ধরেন।

পূজারী বলেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!"

মন্দিরের মেঝেতে বসে পড়ি সবাই। পূজারীও আমাদের পাশে বসেন।

অমিয়বাবু বলেন, "এদিকটায় তো লোকালয় দেখলাম না?"

"না বাবা! কয়েক বছর আগেও এদিকটা জঙ্গল ছিল। ওখার পাকারাস্তা হওয়ায় খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। আগে দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে এই পর্যন্ত শুধু একটি পায়েহাঁটা কাঁচারাস্তা ছিল। সন্ধ্যের পরে কেউ বড় একটা এদিকে আসতেন না। তখনও আমরা এই দেবীস্থানকে যক্ষের মতো আগলে রেখেছি। নিয়মিত মায়ের সেবা-পূজা করেছি। কিন্তু আর বোধহয় পারলাম না।"

"কেন?" সামন্তবাবু প্রশ্ন করেন।

পূজারী উত্তর দেন, "যা দিনকাল পড়েছে, সেবা-পূজা চালানো

যাচ্ছে না। দৈনিক অন্তত পঞ্চাশটি টাকা দরকার, অথচ এখানে যাত্রী-সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা আসেন, তাঁরাও তেমন কিছু একটা দিতে পারেন না। কারণ দ্বারকাধীশ মন্দিরেই তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান।" একটু থেমে পূজারী আবার বলেন, "তাই বলছিলাম, আপনারা অনেকে একসঙ্গে এসেছেন। আপনারা যদি সবাই মিলে এই মাতৃ-মন্দিরের অন্তত দুটি দিনের ব্যয়ভার বহন করেন, তাহলে আমরা বড়ই উপকৃত হব।"

পূজারী চুপ করেন। আমরাও শব্দহীন।

সহসা সামন্তবাবু নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, "এক কাজ করুন। আমি একদিনের খরচ দিচ্ছি, আপনারা সবাই মিলে আরেক দিনের খরচ অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা তুলে দিন। আসুন, আমরা ঠাকুরজীকে অন্তত দুটি দিনের জন্য নিশ্চিন্ত করে যাই।"

"মা আপনাদের মঙ্গল করবেন।" পূজারী সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

পাণ্ডাজী চাঁদা সংগ্রহে লেগে যান। বলা বাহুল্য পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয় না।

টাকা দেবার পরে সামন্তবাবু পূজারীকে বলেন, "এবারে একটু মা-য়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন ঠাকুরজী! পুণ্যতীর্থে বসে পুণ্যকাহিনী শোনা যাক্।"

"ঠিক কথা কইছেন দাদা!" বড়-ঠাকুরমা উচ্ছ্বসিত স্বরে সামন্ত-বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

"কোন্ কাহিনী বলব বলুন?"

"কেন? শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণের কথা কয়েন না!" মেজ-ঠাকুরমা সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ করেন।

"বেশ, বলছি।" পূজারী ঠিক হয়ে বসেন।

সামন্তবাবুর দুই ছেলে ও বিউটি পূজারীর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যায়। আমরাও কর্ণময় হই। পূজারী শুরু করেন—

"বিদর্ভ দেশের রাজা ভীষ্মক। তার পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। বড়ছেলের নাম রুক্মী আর মেয়ের নাম রুক্মিণী। তিনি অসাধারণ

সুন্দরী ও অতিশয় বুদ্ধিমতী। শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শুনে তিনি মনে মনে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন।

"কিন্তু দাদা রুক্মী কৃষ্ণকে ভালচোখে দেখতেন না। তিনি চেদিরাজ দমঘোষের ছেলে শিশুপালের সঙ্গে বোনের বিয়ে ঠিক করলেন। বিয়ের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল।

"নিরুপায় হয়ে রুক্মিণী তখন কৃষ্ণকে একখানি চিঠি লিখলেন। জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেই চিঠি তিনি দ্বারকাধীশের কাছে পাঠালেন।

"দ্বারকানাথ পরম সমাদরে সেই ব্রাহ্মণকে বরণ করলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন—আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

"ব্রাহ্মণ তাঁকে রুক্মিণীর চিঠি দেখালেন। কৃষ্ণ মুখে নির্বিকার ভাব দেখালেও মনে মনে খুবই পুলকিত হয়ে উঠলেন। কারণ রুক্মিণীর রূপ-যৌবনের কথা তাঁরও অজানা ছিল না। বরং তাঁর অবচেতন মনে রুক্মিণীকে পাবার একটা প্রবল বাসনা ছিল। তাহলেও তিনি নির্বিকার কণ্ঠেই ব্রাহ্মণকে বললেন—বেশ তো, আপনিই পড়ুন না চিঠিখানা।

"ব্রাহ্মণ চিঠি পড়তে আরম্ভ করেন। কৃষ্ণের কাছে লেখা রুক্মিণীর চিঠি—প্রেমপত্র। সমগ্র শাস্ত্রে এমন আত্মনিবেদনের মধুর দলিল আর নেই। রুক্মিণী লিখেছেন—

'হে ভুবনসুন্দর! আমি তোমার মনোহর রূপের কথা শুনেছি। হে অচ্যুত! আমি তোমার অনন্ত গুণের কথা শুনেছি। লজ্জাহীনার মতই তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার যশোগাথা আমার যৌবনতপ্ত দেহের তাপজ্বালা নিবারণ করেছে। এজন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দোষ দেবে না। কারণ এ জগতে এমন কোন নারী নেই যে তোমার মতো নয়নাভিরাম পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করতে চায়'।"

সহসা থেমে গেলেন পূজারী।

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই।

তিনি বলেন, "এর পরের কয়েকটা কথা বড়ই সুন্দর। আপনারা তাই ভাগবতকারের ভাষায় শুনে নিন একবার।" তিনি সুর করে

বলতে থাকেন—

> "তস্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া—
> মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো! বিধেহি।
> মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্—
> গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥"

"অর্থটা এট্টু কইয়া ছ্যান্ ঠাকুরমশায়! আমরা সমস্কৃত জানি না।" পূজারী থামতেই বড়-ঠাকুরমা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

মৃদু হেসে পূজারী বলেন, "বলছি মা, বলছি।"

"কয়েন।" ছোট-ঠাকুরমা অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে অনুমতি দান করেন।

পূজারী বলতে থাকেন, "রুক্মিণী কৃষ্ণকে লিখেছেন—হে সর্বব্যাপী, হে সর্বসাক্ষী! আমি তোমাতেই আত্মনিবেদন করেছি। তুমিই আমার প্রাণপতি। হে স্বামি! তুমি এখানে এসে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। হে কমললোচন! তুমি বীর, আমি তোমার! তুমি সিংহ, শিশুপাল শৃগাল। সিংহের ভোগ্যবস্তু যেন শৃগাল স্পর্শ না করতে পারে।

"আরও অনেক কথা সেদিন রুক্মিণী লিখেছিলেন কৃষ্ণকে। তিনি লিখেছিলেন—আমি যদি জন্ম-জন্মান্তরে কোনদিন শ্রীহরির আরাধনা করে থাকি, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আসবে। তুমি এসো! আমার পাণিগ্রহণ কর। দমঘোষের ছেলে যেন আমাকে ছুঁতে না পারে।

"হে অজিত! পরশুদিন আমার বিয়ে। তুমি পত্রপাঠ গোপনে এখানে চলে এসো। আমাকে গ্রহণ কর। জানি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সেই সঙ্গে এও জানি—সে-যুদ্ধে তোমার জয় সুনিশ্চিত। তুমি বীরত্বের কনেপণ দিয়ে আমাকে লাভ কর, রাক্ষসমতে আমাকে বিয়ে কর।

"হয়তো জিজ্ঞেস করবে—অন্তঃপুর থেকে কিভাবে তুমি আমাকে হরণ করবে? ভয় নেই, বিয়ের দিন রাজপথেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার। কুলপ্রথা অনুযায়ী সেদিন আমি অম্বিকার মন্দিরে যাব। মন্দির থেকে ফেরার পথে তুমি আমাকে হরণ করে নিও।

"তুমি ব্রহ্মা ও শিবের আরাধ্য। তোমার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও আমি যদি তোমার করুণালাভে বঞ্চিতা হই, তবে আমি আত্মঘাতিনী হব। তোমার ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করব, যাতে অন্তত শতজন্ম পরেও একদিন তোমাকে আমি মনের মতো করে কাছে পাই।"...

পূজারীর কথা আর কানে আসছে না আমার। মনে পড়ছে মহাকবি মধুসূদনের বীরাঙ্গনা-কাব্যের তৃতীয় সর্গের কথা। সর্গটির নাম 'রুক্মিণী পত্রিকা'। শেষ অনুচ্ছেদটিতে রুক্মিণী যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে লিখেছিলেন—

'আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত ; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে,
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!'

পূজারী ঠিকই বলেছেন, এমন অভিনব পত্র আমাদের শাস্ত্রে আর নেই বলেই সম্ভবতঃ মধুসূদন পত্রখানিকে তাঁর অমরকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের ভাবনা থাক্, শ্রীমধুসূদনের কথাই শোনা যাক্। পূজারী বলে চলেছেন—

"ব্রাহ্মণের পত্রপাঠ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৎসল মদনমোহন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সারথি দারুককে রথ বের করার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন—আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

"মা, বাবা ও দাদা বলদেবের অনুমতি নিয়ে শ্রীহরি রওনা হলেন বিদর্ভের পথে। কিন্তু তিনি চলে যাবার পরেই বলরামের মনে পড়ল কথাটা। শিশুপাল নিশ্চয়ই তাঁর সব সাকরেদদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বিশেষ করে জরাসন্ধ তো উপস্থিত থাকবেই।

সুতরাং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং একা কৃষ্ণের পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত হবে। তাই বলদেবও তাঁর চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণের পেছনে বিদর্ভ দেশে রওনা হলেন।

"এদিকে ব্রাহ্মণের দেরি দেখে রুক্মিণী অধীর হয়ে উঠলেন। তবে কি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেমপত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন? তাঁর আত্মদান কি বৃথা হল? আর তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে যে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

"এই সময় সহসা তাঁর বামাঙ্গ স্পন্দিত হল। রুক্মিণী চমকে উঠলেন। আর সে চমক ভাঙবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন সহাস্য মুখে ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে সুসংবাদ জানাতেই রুক্মিণী আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠলেন। কৃতজ্ঞ প্রেমিকা ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

"সারা বিদর্ভ দেশ তখন উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে। পুত্র শিশুপালকে নিয়ে দমঘোষ বিদর্ভে এসেছেন। শোভাযাত্রা সহকারে রাজপথ দিয়ে চলেছেন। সঙ্গে বরযাত্রী শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্র প্রভৃতি। পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে বিদর্ভের নারী-পুরুষ তাঁদের সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে ভীষ্মক-রাজপ্রাসাদের দিকে।

"এমন সময় গরুড়ধ্বজ রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভে পৌঁছলেন। সবাই ভাবলেন তিনিও বরযাত্রী এসেছেন। কারণ শিশুপাল তাঁর পিসতুতো ভাই। পুরনারীরা অবশ্য না বলে পারলেন না—আহা! দ্বারকানাথের সঙ্গে আমাদের রাজকন্যের বিয়ে হলে বড়ই ভাল হত, দুটিতে চমৎকার মানাতো।...দুয়েকজন তো সবাইকে শুনিয়েই বলে ফেললেন—আমাদের সমস্ত পুণ্যের বিনিময়েও যদি রাসবিহারী রুক্মিণীকে গ্রহণ করেন, তাহলেও আমরা ধন্য হব। বলা বাহুল্য, অন্তর্যামী কৃষ্ণ সবই শুনতে পেলেন। তিনি নীরবে এগিয়ে চললেন। তবে তাঁর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন বিদর্ভের নারী-পুরুষরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন বৈকি।

"ইতিমধ্যে রাজা ভীষ্মক রাজপ্রাসাদে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণ

শেষ করে রুক্মিণীকে অম্বিকা-মন্দিরে যেতে বললেন। প্রহরী ও সখীদের সঙ্গে রুক্মিণী বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে, হৃদয়ে গোবিন্দ-পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন অম্বিকা-মন্দিরের পথে। পথেই শিশুপাল ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। ততক্ষণে বরযাত্রীদেব শোভাযাত্রা থেমে গিয়েছে। রাজা ও রাজপুত্ররা অপলক নয়নে রমণীয়া রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁরা মদনবাণে জর্জরিত হলেন। বাজন্যবর্গ শিশুপালের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলেন।

"কিন্তু রুক্মিণী তাঁদেব দিকে না তাকিয়ে কৃষ্ণের ধ্যানে তদগত হয়ে এগিয়ে চললেন। তিনি অম্বিকা-মন্দিরে প্রবেশ করলেন। এখানে রুক্মিণীর রূপ বর্ণনা কবতে গিয়ে ভাগবতকার বলেছেন—ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তির মতো রুক্মিণীর সৌন্দর্য। তাঁর কটিদেশ সুন্দর। তিনি পীনপয়োধরা। দু'কানের দুটি কুণ্ডল তাঁর মুখখানিকে আবও সুন্দব করে তুলেছিল। একছড়া বত্নময় চন্দ্রহার তাঁর সুগঠিত নিতম্বকে আবও বমণীয় কবে তুলেছিল। তিনি হরিণী-নয়না ও কেশবতী। তাঁর কালো কেশেব ভয়ে যেন কাজলপরা চোখদুটি সর্বদা সশঙ্কিত। তাঁকে দেখলে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরেরও মোহ সৃষ্টি হয়। তাঁর কোমল পা-দুখানির পুণ্য-স্পর্শ পেয়ে পথের ধূলি ধন্য হয়ে উঠেছিল, দীপ্তিমান নূপুবের গানে বিদর্ভের বাতাস উতলা-আকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি কলহংসীর মতো এগিয়ে চলেছিলেন।

"মন্দিরে প্রবেশ করে রুক্মিণী তাঁর ইষ্টদেবীব সামনে দাঁড়িয়ে কায়মনোবাক্যে কামনা করলেন—

'নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবম্।

ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্'॥"

এবারে আর ঠাকুরমা অর্থ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন না। কারণ তিনি কিছু বলতে পারার আগেই পূজারী আবার বলতে শুরু করলেন, "রুক্মিণী বললেন—হে অম্বিকা! গণেশাদি দেবগণের মঙ্গল-স্বরূপিণী জননী, আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি পতিত্বে বরণ করতে চাই, তুমি অনুমোদন কর।

"সখীদের হাত ধরে রুক্মিণী বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তেমনি নূপুরকলিত ছন্দে তিনি এগিয়ে চললেন। কিন্তু এবারে আর নতমস্তকে নয়, এবারে তিনি ঘোমটা তুলে সলজ্জ দৃষ্টিতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা রাজা ও রাজপুত্রদের দিকে তাকাচ্ছেন মাঝে মাঝে। বীরবৃন্দ আরও বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভাবলেন—রুক্মিণী আমার প্রতি আসক্তা। অথচ তাঁর পটোলচেরা চোখদুটি তখন কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন দ্বারকানাথকে। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ল—শুভদৃষ্টি হল।

"শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে এগিয়ে এলেন রুক্মিণীর দিকে। রুক্মিণীর দেহরক্ষী এবং উপস্থিত রাজারা কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দু'হাতে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে ঝড়ের বেগে ফিরে এলেন রথে। দারুক প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলল গরুড়ধ্বজ। রুক্মিণী পরম নিশ্চিন্তে গোবিন্দের বুকে মুখ লুকালেন।

"গরুড়ধ্বজ অদৃশ্য হবার পরে রুক্মী ও শিশুপাল বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সম্বিৎ ফিরে এলো রুক্মীণীর রক্ষীবাহিনী এবং অন্যান্য রাজাদের। চিৎকারে চারিদিক ফাটিয়ে তাঁরা গরুড়ধ্বজের পেছনে ছুটলেন। চিৎকার করে কৃষ্ণকে ক্রমাগত যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকলেন।

"দারুককে রথ থামাতে বললেন বাসুদেব। রুক্মিণী অবাক হলেন। তাকিয়ে দেখলেন জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব ও রুক্মী প্রভৃতি সসৈন্যে ধেয়ে আসছেন। তিনি সভয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন। কোমল কণ্ঠে কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন—মাস্ম ভৈঃ! ভয় নেই।

"রুক্মিণী নির্ভয় হলেন।

"শুরু হল যুদ্ধ। ভয়ানক যুদ্ধ। একদিকে একা কৃষ্ণ। অপরদিকে হাজার হাজার যোদ্ধা।

"কিন্তু বেশিক্ষণ কৃষ্ণকে একা যুদ্ধ করতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সসৈন্যে বলরাম সেখানে হাজির হলেন। শত্রুরা সুবিধা

করতে পারলেন না। তাঁরা পরাজিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বন্দী করলেন। রুক্মিণী কৃষ্ণের কাছে দাদার প্রাণভিক্ষা করলেন। রুক্মী ছিলেন অতিশয় কৃষ্ণ-বিদ্বেষী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা না করলেও একেবারে ক্ষমা করলেন না। তিনি তলোয়ার দিয়ে রুক্মীর চুল কেটে দিয়ে তাঁকে রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।

"শত্রুরা পালিয়ে যাবার পরে বিজয়ী বলরাম এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। রুক্মীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্যে তিনি ভাইকে তিরস্কার করলেন। তিনি সসম্মানে রুক্মীকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর দাদার সঙ্গে কৃষ্ণ এমন খারাপ ব্যবহার করার জন্য তিনি রুক্মিণীকেও সান্ত্বনা দান করলেন। তারপরে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে নিয়ে সগৌরবে বলরাম দ্বারকায় ফিরে এলেন।

"অবশেষে এক শুভদিনে শুভলগ্নে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল—লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন হল। সেদিন দ্বারকা উৎসব-নগরী। সর্বত্র আলো আর ফুলের ছড়াছড়ি। দ্বারকানাথের বিয়েতে দ্বারকার নর-নারী সেদিন দিনের কাজ ও রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। আকাশের তারা, বনের পাখী আর সাগরের ঢেউ পর্যন্ত সেই আনন্দ-যজ্ঞের সরিক হয়েছিল। বিয়েটা অবশ্য রাক্ষস-মতেই হয়েছে, কারণ কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করে এনেছিলেন।"

থামলেন পূজারী। আমরা উঠে দাঁড়াতে চাই। সময় কম। আরও বহু দর্শন বাকি রয়েছে।

কিন্তু পূজারী ইসারায় আমাদের উঠতে নিষেধ করলেন। গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনারা সকলেই জানেন শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবী। কাজেই আপনাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—তাঁদের মিলনকে কেন্দ্র করে আবার এমন মহোৎসবের কি প্রয়োজন ছিল?"

আমরা পূজারীর দিকে তাকাই, কিন্তু কোন কথা বলি না। একটু বাদে তিনি নিজেই আবার বলেন, "ভক্তবৃন্দ! আমি বলব প্রয়োজন ছিল। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ চিরমিলনে মিলিত, কারণ সেটি নিত্য-

লোক। মর্ত্যলোকের সঙ্গে সে মিলনের কোন সম্পর্ক নেই। মানুষের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মর্ত্যলীলায় তাঁদের মানুষের মতই আচরণ করতে হয়েছে। আর বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যের সঙ্গে মর্ত্যের মাধুর্য যুক্ত হবার জন্যই কৃষ্ণলীলা এমন মনোহর, এত জনপ্রিয়।"

"আচ্ছা, ঠাকুরজী। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?" পূজারী থামতেই সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

পূজারী বলেন, "বেশ, বলুন কি কথা?"

"এই মন্দিরে অন্যান্য ছবির সঙ্গে একখানি ছবি দেখলাম—দুর্বাসা-পূজন। ওটির তাৎপর্য তো বুঝতে পারলাম না। দুর্বাসা তো বনবাসের সময় পঞ্চ-পাণ্ডবের অতিথি হয়েছিলেন একবার। কৃষ্ণ-রুক্মিণী আবার কবে তাঁর সেবা করলেন?"

"করেছিলেন।" একটু হেসে পূজারী বলেন, "মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ১৫৯ অধ্যায়ে আপনারা এ কাহিনী পাবেন।"

"একটু বলুন না!" সাহাবাবু অনুরোধ করেন।

পূজারী বলতে থাকেন, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে শরশয্যায় শুয়ে মহাজ্ঞানী ভীষ্ম পাণ্ডবদের যে-সব অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তা নিয়েই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব।"

সরকারদা মাথা নাড়েন। পূজারী বলে চলেন, "একদিন যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—পিতামহ! কোন্ ফল এবং উন্নতির আশায় আপনি ব্রাহ্মণসেবা করেন, এবারে তাই বলুন!

"ভীষ্মদেব কৃষ্ণকে দেখিয়ে বললেন—এই মহামতি বাসুদেব তোমার কাছে সেকথা বলবেন। কারণ ইনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ইনি শুভ ও অশুভ এবং অচিন্ত্যনীয়।

"তখন কৃষ্ণ তাঁদের কাছে দুর্বাসা-পূজনের কাহিনী বললেন।..."

"ভণিতা না কইরা কাহিনীটা কি, তাই কইয়া ফ্যালেন।" বড়-ঠাকুরমা ধৈর্যহীনা।

আমরা নির্বাক্। পূজারী বড়-ঠাকুরমার বক্তব্য বুঝতে না পেরেই বলতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, দুর্বাসা একবার নগর ও

গ্রামের পথে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকলেন—আমি দুর্বাসা। আমি শ্রান্ত ক্ষুধার্ত। তোমরা কে আমাকে আশ্রয় ও খাদ্য দেবে!

"—মুনি ঋষি বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে আতিথ্যদান করা পরম সৌভাগ্যের। তবু কেউ তাঁকে ভয়ে আশ্রয় দিতে চাইছেন না দেখে, আমি তখন তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার বাড়িতে বসে তিনি কোনদিন সামান্য কিছু মুখে দিতেন, কোনদিন বা কয়েক হাজার মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতেন, কখনও হাসতেন, কখনও বা কাঁদতেন। একদিন তিনি তাঁর শয়নকক্ষের শয্যাদ্রব্য ও সুন্দরী সেবিকাদের ভস্ম করে বাইরে এলেন। এসেই আমাকে বললেন—আমার খুব পরমান্ন খেতে ইচ্ছে করছে। এখুনি আমাকে গরম মিষ্টান্ন খাওয়াও।

"—আমি আগের থেকে তাঁর মনের কথা জানতে পেরে মিষ্টান্ন রান্না করতে বলেছিলাম। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাঁর সামনে গরম পায়েস এনে দিলাম। তিনি তার থেকে খানিকটা খেয়ে নিয়ে থালাখানি ঠেলে দিলেন আমার দিকে। কর্কশকণ্ঠে আদেশ দিলেন, বাসুদেব! এই মিষ্টান্ন তোমার সারা গায়ে মাখো।

"—আমি তখুনি সেই গরম মিষ্টান্ন আমার গায়ে ও মাথায় মেখে ফেললাম। শুধু পায়ের তলায় মাখতে পারলাম না। এই সময় রুক্মিণী সেখানে এসে উপস্থিত হল। মহর্ষি সেই এঁটো গরম পায়েস তার গায়েও মেখে দিলেন। তারপরে আমার রথে উঠে রুক্মিণীকে বললেন, আমাকে টেনে নিয়ে চলো। রুক্মিণী ঘোড়ার মতো রথ টানতে থাকল। তিনিও আমার সামনেই ঘোড়ার মতো রুক্মিণীকে চাবুক মারতে শুরু করে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম।

"—কিছুক্ষণ বাদে রুক্মিণী আর তাঁকে বইতে পারল না। দুর্বাসা রেগে রথ থেকে নেমে পড়লেন। নোংরা পথ দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। আর বার বার বলতে থাকলাম, ভগবান! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

"—প্রসন্ন হলেন। অবশেষে মহর্ষি দুর্বাসা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি কাছে যাবার পরে বললেন, বাসুদেব! তুমি জিতেন্দ্রিয়। তুমি সম্পূর্ণভাবে ক্রোধকে 'জয় করেছো। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন

হয়েছি। অন্ন যেমন দেবতা ও মানুষের প্রিয়, তেমনি তুমিও সবার প্রিয়পাত্র হবে। তুমি গায়ে ও মাথায় পায়েস মেখেছো, কাজেই তোমাকে কেউ অস্ত্রবিদ্ধ করতে পারবে না। আমার এই উচ্ছিষ্ট পায়েস আজীবন তোমার বর্মের কাজ করবে। তবে তুমি পায়ের তলায় পায়েস না মেখে ভুল করলে। কেউ সেখানে শরনিক্ষেপ করলে, তোমার বিপদ ঘটবে।*

"—তারপরে দুর্বাসা মুনি রুক্মিণীকে বললেন, তুমিও ইহলোকে অশেষ যশ ও কীর্তি অর্জন করবে। জরা, ব্যাধি ও বিবর্ণতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি পবিত্র গন্ধ-বিশিষ্টা হয়ে তোমার পতির প্রিয়তম সেবিকা ও সখী হবে। ষোল হাজার স্ত্রীর মধ্যে তোমাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবেন।

"গল্প শেষ করে কৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে বললেন—আপনি আমার যেসব গুণের কথা বলেছেন সবই সত্য। কিন্তু ব্রাহ্মণসেবার ফলেই আমি এইসব গুণের অধিকারী হয়েছি।"

॥ দশ ॥

রুক্মিণী-মন্দির থেকে শহুরে পথ ধরে মাইলখানেক এসে আবার টাঙ্গা থেকে নামতে হল। পথের পাশে ছোট একটি তোরণ দেখিয়ে পাণ্ডাজী বলেন, "ভদ্রকালী-মায়ের মন্দির।"

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। পাথরের বেদির ওপরে ভদ্র-কালীর মুখমণ্ডল। শুধুই মুখখানি, শরীরের অন্য কোন অংশ নেই। কিন্তু মায়ের সেই বদনমণ্ডলে পরম প্রশান্তি। তিনি ত্রিনয়নী—অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। মহাকালের প্রণয়নী মহাদেবী আমাদের অভয় দান করছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

তাঁরই কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। ভদ্র-

* মৌষলপর্বে জরা ব্যাধ মৃগভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলায় বাণ মেরেছিল বলেই তিনি বাণবিদ্ধ হয়েছিলেন।

কালী কালীমা-য়ের আরেক রূপ। কালীর উগ্র ও শান্ত দুই রূপের কথাই বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবী-মাহাত্ম্য, ভবিষ্যপুরাণ ও দেবীপুরাণ প্রভৃতিতে মহাকালী উগ্ররূপা। কিন্তু বিষ্ণুধর্মোত্তরে বর্ণিত ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর।

সেই শান্ত ও সুন্দর অভয়দায়িনী দেবীকে দর্শন করেই আমরা প্রশান্তচিত্তে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। পাণ্ডাজী বলেন, "এই মন্দিরটি ভারতের একান্নপীঠের অন্যতম।"

কথাটি আমার সারা শরীরে একটা শিহরণ বইয়ে দেয়। কোথায় কলকাতা আর কোথায় দ্বারকা! অথচ উভয়েই সতীপীঠ—একই মা-য়েব অংশ। মা-ভগবতী তো আমার ভারতমাতারই আরেক রূপ। আর ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত আমাদের এই জন্মভূমি যে চিরকালের পুণ্যতীর্থ-ভারত।

ভদ্রকালীর মন্দির থেকে মাইলখানেক এসে সিদ্ধেশ্বর-মহাদেবের মন্দির। পথের পাশে খানিকটা খোলা জায়গা। তারই ঠিক মাঝখানে একটি সুবিশাল বটগাছ। মন্দিরটিকে ছায়াশীতল ও রমণীয় করে রেখেছে।

বটতলার বাঁয়ে মন্দিরদ্বার। আমরা ভেতরে আসি। প্রথমেই নাট-মন্দির—শ্বেতপাথরের মেঝে, ঠিক মাঝখানে কালোপাথরের নন্দীমূর্তি।

নাট-মন্দিরের পরেই গর্ভ-মন্দির। দরজার ওপরে রামেশ্বরমের ছবি—রাম লক্ষ্মণ ও হনুমান শিবপূজা করছেন। খানিকটা দূরে, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে, হরপার্বতী ও গণেশ পুজো দেখছেন।

গর্ভ-মন্দিরের মেঝেও শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কিন্তু নাট-মন্দিরের মেঝে থেকে খানিকটা নিচু। ঠিক মধ্যস্থলে লুক্কায়িত শিবলিঙ্গ। পাশেই পেতলের সাপ—নাগরাজ ফণা তুলে শিবের মাথাটিকে ঢেকে রেখেছেন। মন্দিরের সিলিং থেকে ঝোলানো শেকলের সঙ্গে একটি কলসী ঝুলছে। তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে মহাদেবের মাথায়।

পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে একটি ছোটখাটো পার্বতী-মূর্তি আর

পাশের দেওয়ালে রয়েছেন গঙ্গা-মূর্তি। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে সবাইকে প্রণাম করি।

পাণ্ডাজীর পেছনে বেরিয়ে আসি পথে। আমাদের টাঙ্গাগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু পাণ্ডাজী টাঙ্গায় উঠতে দেন না। বলেন—রাস্তা পেরিয়েই গান্ধীঘাট। দর্শন করে একেবারে টাঙ্গায় উঠবেন।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। টাঙ্গায় চড়া এবং নামা দুটিই কঠিন কাজ। তার চেয়ে খানিকটা হাঁটা ঢের ভাল। আমরা হেঁটে চলি।

বেশিদূর হাঁটতে হয় না। বাঁক ফিরতেই সমুদ্রকে দেখতে পাই। ব্যস, আর যায় কোথায়, বিউটি এবং তার দু-ভাই, মানে সামন্তবাবুর দুই ছেলে দে ছুট!

আমরা সাগরতীরে আসি—শান্ত সাগর। সিমেন্ট-বাঁধানো গোলাকার ঘাট। মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পরে এখানে তাঁর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

ঘাটের ওপরে শ্বেতপাথরের বেশ উঁচু বেদির ওপরে নীলপাথরের গান্ধীমূর্তি। চারিদিকে রেলিং-ঘেরা। তাহলেও ভেতরে যেতে অসুবিধে নেই কোন। এবং মনে হচ্ছে সেই বীরপুঙ্গবরা প্রায়ই বাপুজীর পদতলে গিয়ে হাজির হয়। নইলে মহাত্মা গান্ধীর মর্মরমূর্তির বেদীতে 'Bobby' ও 'Pakeejah' প্রভৃতি লেখা থাকবে কেন?

গান্ধী স্মৃতিরক্ষা সমিতি এই মূর্তিটির রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন, জানা নেই আমার। তবে সে ব্যবস্থা যা-ই হয়ে থাক্, মূর্তিটিকে যে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সমিতির সদস্যরা খবর না দিয়ে একবার এখানে এলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

গান্ধীঘাটে দাঁড়িয়ে উত্তরে দেখতে পাচ্ছি দ্বারকার লাইট-হাউস আর দক্ষিণে দ্বারকানাথের মন্দির।

বিউটি ভাইদের নিয়ে একেবারে বেলাভূমিতে নেমে গিয়েছে। সেজদি এবং বৌদিও দেখছি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন। তাঁদেরও বোধহয় বিউটির মতো ছেলে-মানুষী করার বাসনা হয়েছে। আর

তাঁদেরই বা দোষ দিয়ে কি হবে? সত্তর বছরের দাদাও যে নিচে নামছেন।

আমিও নেমে আসি নিচে, সাগর সৈকতে। বিউটিদের ছবি নিই। ছবি নিই সাগর ও তার বাতিঘরের। ছবি নিই দ্বারকাধীশ মন্দির ও গান্ধীঘাটের।

গান্ধীঘাট থেকে গোবর্ধনজী, দামোদরজী, মীরাবাঈ ও নরসিংহ মেহতার মন্দির দর্শন করে আবার দ্বারকাধীশ মন্দিরে এলাম। গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। একটু বাদেই শুরু হবে সন্ধ্যারতি। আমরা সেই আরতি দেখতেই এসেছি।

টাঙ্গা থেকে নামতেই মেয়েটি ছুটে এসে আমার একখানি হাত ধরে। সেই বারো বছরের কিশোরীটি—সকালে যে আমার কপালে চন্দন-তিলক পরিয়ে দিয়েছিল, যাকে আমি একটি সিকি দেবার পরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছিল।

সকালে সে বলেছিল—বাবুজি, সন্ধ্যাব সময় আরতি দেখতে এসো। দেখবে কেমন সুন্দব আরতি। আমিও আসব। আবার তাহলে দেখা হবে তোমার সঙ্গে। আমি আমার বোনদের নিয়ে আসব বাবুজি।

তাই এসেছে। ছোট ছোট তিনটি বোন। তারাও তাদের দিদির মতই সুন্দরী। যেমন ফুটফুটে রঙ, তেমনি নাক মুখ চোখ। স্বাস্থ্যও খারাপ নয়।

সকালেই মেয়েটি বলেছে আমাকে—ওর মা নেই, বাবার খুব অসুখ। তাই চন্দন-তিলকের পরিবর্তে পুণ্যার্থীরা তাকে যা দেন, তা দিয়েই ওদের সংসার চলে। কিন্তু আর কতদিন পুণ্যার্থীরা ওকে চন্দনের বিনিময়ে পয়সা দেবেন? বড়জোর চাব-পাঁচ বছর। তারপরে আর কেউ তাকে এভাবে পয়সা দেবে না। তাদের দাবী বাড়বে, তারা ওর দেহটিকে দখল করতে চাইবে। অথচ পেটের দায়ে সেদিনও পথে বেরুতে হবে ওকে। সেদিন দেহের বিনিময়ে ওকে পেটের ক্ষুধা মেটাতে হবে।

ঠাকুর, তোমার আপন দেশে কেন এই অবিচার? হে পুরাণপুরুষ!

তুমি আরেকবার আবির্ভূত হও। সমস্ত অন্যায় ও অবিচারকে দূর করে তোমার এই প্রিয় পৃথিবীকে আবার মানুষের পৃথিবীতে পরিণত করো।

সন্ধ্যারতি দর্শন করে আমরা নেমে আসি দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে। বিদায় নিই রণছোড়জীর কাছ থেকে। জানি না আর কোনদিন আমার দ্বারকায় আসার সুযোগ হবে কিনা? কিন্তু না হলেও তোমার মনোহর মূর্তি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে। দ্বারকা আজ থেকে আমার মন-দ্বারকা হয়ে রইল।

টাঙ্গায় উঠে দাদা পাণ্ডাজীকে প্রশ্ন করেন, "আমরা কি এখন গাড়িতে ফিরে যাচ্ছি?"

"না। এখন আমরা তোতাদ্রি মঠে যাচ্ছি, সেখান থেকে গাড়িতে ফিরব।"

"তোতাদ্রি মঠ আবার কোথায়? সেখানে কি দরকার?"

"স্টেশনের কাছেই, বড় রাস্তার ওপরে। দরকার মানে, সেটি বাঙালীদের মঠ ও ধর্মশালা। বাঙালী যাত্রীরা সবাই একবার যান সেখানে। তাছাড়া আজ ভাগবত-পাঠের দিন। ভালই লাগবে আপনাদের।"

দাদা আর কোন আপত্তি করেন না। টাঙ্গা ছুটে চলেছে মন-দ্বারকার পথে। দাদা বোধকরি ভাগবতের কথা ভাবছেন মনে মনে। আমি কিন্তু ভেবে চলেছি নিজের কথা, আমার জন্মভূমি বরিশাল আর এই দ্বারকার কথা। কোথায় বরিশাল আর কোথায় দ্বারকা?

বঙ্গ-বিভাগ আমার বহু ক্ষতি করেছিল। আমার সুন্দর ও সরল জীবনটাকে কুৎসিত ও জটিল করে তুলেছিল। তাহলেও বঙ্গ-বিভাগ আমার এবং আমার মতো লক্ষ লক্ষ পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুহারাকে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে। আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষরা বড়ই ঘরকুনো ছিলাম। কাজেই বঙ্গ-বিভাগ না হলে আমি লেখক হতাম কিনা জানি না, কিন্তু পর্যটক যে হতে পারতাম না, তা হলফ্ করে বলতে পারি। তাই বার বার মনে হচ্ছে, কোথাকার মানুষ আমি আজ কোথায় এসেছি? কোথায় বঙ্গোপসাগর আর কোথায়

কচ্ছোপসাগর ? কোথায় বরিশাল আর কোথায় দ্বারকা ?

ভূতাত্ত্বিকরা বলেছেন—গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভারতের সবচেয়ে নতুন মাটি, আর গুজরাত ভারতের সর্বপ্রাচীন ভূখণ্ডের অন্তর্গত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় মনুষ্য-সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দের পরে। আর নর্মদা-উপত্যকায় মনুষ্য বসবাস শুরু হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেরও আগে। গুজরাত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম পীঠস্থানগুলির অন্যতম।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে যুগে যুগে দলে দলে মানুষ ভারতে এসেছে। কেউ এসেছে লুট করতে, কেউ বা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে। তারা প্রত্যেকেই গুজরাতে তাদের কিছু চিহ্ন রেখেছে। কেউ এখানকার শিল্প ও সংস্কৃতি ও বাণিজ্যে নিজেদের অবদান অবিস্মরণীয় করেছে, কেউবা ধ্বংসের বন্যায় সারা গুজরাতকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুজরাতের স্থান সুপ্রাচীন। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগ থেকেই গুজরাতের সঙ্গে ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পরে স্থানীয় রাজারা গুজরাত শাসন করতে থাকেন এবং সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ উপদ্বীপটি রাজপুতদের অধিকারে আসে। তারপরে পাঠান ও মোগলরা গুজরাত অধিকার করেন।

প্রাচীন গুজরাতের প্রাচীনতম অধিবাসীরা হল—ভীল ও গোন্দ্ প্রভৃতি উপজাতীয়রা এবং গির অরণ্যের সিংহরা। ভারতে আর কোথাও সিংহ নেই। দুঃখের কথা, আদি অধিবাসীদের মতো সিংহও ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল গুজরাত থেকে। সিংহ সংরক্ষণের সঙ্গে আদিবাসীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে সে ব্যবস্থায় তাঁদের সত্যিকারের কতখানি সুবিধে হয়েছে, বলতে পারব না।

মুসলমানদের পরে গুজরাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ব্রিটিশরা গুজরাতে ২০২টি দেশীয় রাজ্যের পত্তন দেন। ভারত স্বাধীন হবার পরে জুনাগড়ের নবাব ছাড়া, অন্য সব দেশীয় রাজারা সৌরাষ্ট্র যুক্ত-রাজ্য নাম দিয়ে গুজরাতে যোগদান করেন। জুনাগড়ের

নবাব পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাপালনে অক্ষম হবার জন্য ভারত সরকার তাঁর সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন নি। *

এখনও গুজরাতে জৈন জনসংখ্যা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। আর তাই অধিকাংশ গুজরাতী নিরামিষভোজী। সম্রাট অশোকের সময় থেকে ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম গুজরাতে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল।

সবরমতী নদীর তীর থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে গান্ধীনগরে গুজরাতের নতুন রাজধানী তৈরি করা হয়েছে। উপদ্বীপের অধিবাসীরা সারারাজ্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় অধিবাসী। তারা স্নেহশীল এবং অতিথিবৎসলও বটে।

"ভাই, কি ভাবছো?"

দিদির প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা দ্বারকাধীশ মন্দিরে সন্ধ্যারতি দর্শনের পরে তোতাদ্রি মঠে যাচ্ছি। সেখানে খানিকক্ষণ ভাগবত-পাঠ শুনে গাড়িতে ফিরব। আজ রাতেই আমরা দ্বারকার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কাল বেট-দ্বারকা দর্শন করব।

টাঙ্গা ছুটে চলেছে দ্বারকার পথ ধরে। আমি টাঙ্গায় বসে ভাবছিলাম দ্বারকা ও গুজরাতের কথা, আমার নিজের কথা। দিদির ডাকে সেই ভাবনার অবসান হয়েছে।

দিদি আবার বললেন, "আচ্ছা ভাই, তখন কৃষ্ণকথার আসরে সরকারদা কর্ণ-কুন্তী সংবাদের কাহিনী বললেন। কিন্তু সে কাহিনীটা তো মহাভারতে নেই।"

"আপনি বোধহয় কাশীদাসী মহাভারতের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ করে-ছিলেন। তৎকালীন বাঙালী সমাজের যুগোপযোগী তাঁর সেই অনুবাদে মূল-মহাভারতের বহু কাহিনী বাদ পড়েছে। কিন্তু মূল-মহাভারতে এ কাহিনীটি রয়েছে।"

"মূল-মহাভারত মানে সংস্কৃত মহাভারতে?"

"সংস্কৃতে তো বটেই। তাছাড়া হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এবং

কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা অনুবাদেও আছে। এমন কি রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদেও রয়েছে।"

"আচ্ছা আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"বেশ, করুন।"

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ণ-কুন্তী সংবাদে লিখেছেন—পুণ্যজাহ্নবীর তীরে কর্ণ যখন বন্দনায় রত ছিলেন, তখন কুন্তীদেবী তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে আনবার চেষ্টা করতে এসেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা তো হস্তিনাপুরের। সেখানে গঙ্গা কোথায়, সেখানে তো যমুনা !"

"রবীন্দ্রনাথ মূল-মহাভারতকেই অনুসরণ করেছেন। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের ১৩৫ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে আছে—কুন্তীদেবী ভাল করে কর্তব্য স্থির করে আশার ওপরে ভরসা রেখে কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য ভাগীরথীর দিকে যেতে থাকলেন। মহাভারতকারের ভাষায় –

"ইতি কুন্তী বিনিশ্চিত্য কার্যনিশ্চয়মুত্তমম্।
কার্যার্থমভিনিশ্চিত্য যযৌ ভাগীরথীং প্রতি॥"

"তাহলে মহাভারতকার এতবড় একটা ভুল করলেন কেন ?"

"কি ভুল ?"

"এই যে যমুনার জায়গায় গঙ্গা লিখেছেন !"

"গঙ্গা নয়, ভাগীরথী।" আমি দিদির ভুল ধরিয়ে দিই।

দিদি বলেন, "ঐ একই কথা।"

"না।" আমি বলি, "গাড়োয়ালে জাহ্নবী ও ভাগীরথী গঙ্গার উপনদী আর বাংলায় ভাগীরথী গঙ্গার শাখানদী। ভাগীরথী কিংবা জাহ্নবী মানে গঙ্গা নয়। গোমুখীর ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে বদ্রীনাথের অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হবার পরে মিলিতধারার নাম হয়েছে গঙ্গা। আবার বাংলায় এসে গিরিয়ায় সেই গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হবার পরে ধারা দুটির নাম হয়েছে ভাগীরথী ও পদ্মা।

"গঙ্গা তো শুধু সাধারণ একটি নদী নয়, গঙ্গা উত্তর ও পূর্ব-ভারতের প্রায় সমস্ত নদীর মিলিতধারা। আপনারা জানেন প্রয়াগে যমুনা গঙ্গায় বিলীন হয়েছে। সুতরাং যমুনাকে গঙ্গার একটি উপনদী

বলা যেতে পারে। আর এই উপনদীকে যে সেকালে ভাগীরথী বলা হোত না, এমন কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।"

জানি না, দিদি আমার যুক্তি মেনে নিতে পারলেন কিনা! কিন্তু তিনি আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন না। টাঙ্গা নিশ্চল হয়েছে। আমরা তোতাদ্রি মঠে পৌঁছে গিয়েছি।

পথের পাশেই তোতাদ্রি মঠ। সকালে স্টেশন থেকে মন্দিরে যাবার সময় আমরা এ পথ দিয়েই গিয়েছি। কেউ বলে দেয় নি বলে বুঝতে পারি নি যে, এটাই তোতাদ্রি মঠ। তখন দিনের আলোয় দেখতে পারি নি। এখন রাতের অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে দেখি।

টাঙ্গা থেকে নেমে পাণ্ডাজীর পেছনে মঠে প্রবেশ করি। বিরাট এলাকা জুড়ে মঠ। কয়েকখানি বাড়ি। কোনটি সাধুদের জন্য, কোনটি যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট অর্থাৎ ধর্মশালা। আবার কোনটিতে মন্দির। মাঝে মাঝেই বাগান—শুধু ফুলের নয়, ফল আর সবজির বাগানও আছে। আর আছে কয়েকটি বড় বড় গাছ। ভারী শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। আপসোস হচ্ছে দিনে আসি নি বলে। খাওয়ার পরে দুপুরের যে সময়টা গাড়িতে বসে কাটিয়েছি, সেই সময়ে অনায়াসে এই রমণীয় আশ্রমটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যেত!

আমরা নাট-মন্দিরে আসি। পাণ্ডাজী ঠিকই বলেছেন, সত্যই ভাগবত-পাঠের আসর বসেছে। জনৈক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী পাঠ করছেন। যে যেখানে পারলাম, বসে পড়লাম। পাঠক বলে চলেছেন—

"সমাগত সুধীবৃন্দ, এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিরাশী অধ্যায় পাঠ করব। এই অধ্যায়ে ভাগবতকার কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলনের কাহিনী কীর্তন করেছেন। সেকালে মানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেই স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র একটি সর্বভারতীয় তীর্থ। তাই সেবারে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী নর-নারী কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন যাদব কৌরব পাণ্ডব এবং গোপ-গোপীরা।

"সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে, শেষ হয়েছে পুণ্যস্নান। পুণ্যার্থীরা পুলকিত অন্তরে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন। এই সময় ধীরে ধীরে নন্দরাজ ও যশোদা যাদবদের কাছে এলেন। তাঁদের পেছনে অন্যান্য গোপ-গোপীরা। তাঁদের দেখতে পেয়ে প্রত্যেক যাদব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বসুদেব এগিয়ে এসে নন্দরাজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"কৃষ্ণ-বলরামও নন্দ-যশোদাকে দেখতে পেলেন। মুহূর্তে তাঁদের মনে ব্রজভাবের উদয় হল।

"কৃষ্ণ বলে উঠলেন—বাবা!

"বলবাম বললেন—মা!

"আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হলেন তাঁরা। ছুটে এসে নন্দ-যশোদার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

"নন্দ-যশোদা রাম-কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিলেন। সবার চোখে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে থাকল। সবাই শব্দহীন ও নিশ্চল। অথচ তাঁদের বুকের ভেতরে তখন বহু বছরের না-বলা কত কথাই না জমা হয়ে ছিল।

"কিছুক্ষণ পরে বলরাম দেখতে পেলেন একটু দূরে ব্রজবধূরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। তাঁদের দেখে বলদেব বুঝতে পারলেন যে, এখুনি যদি কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত না হন, তাহলে তাঁদের প্রাণপাখী অন্তর-খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। 'মহোৎকণ্ঠাস্ফুটৎ হৃদয়াঃ প্রাণান্ জহতীরিব।'

"এই অবস্থা দেখে বিদগ্ধচূড়ামণি বলদেব বাবার কোল ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ধীরপদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেলেন।

"দাদার চলে যাবার শব্দ পেয়ে গোপালও মায়ের কোল থেকে মুখ তুললেন। দেখতে পেলেন গোপীদের। তাঁদের বিরহবিধুরা মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল রাসবিহারীর। অতি সন্তর্পণে প্রেমাতুরা জননী যশোদার কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাছেই এক নির্জন স্থানে মদনমোহন মিলিত হলেন ব্রজবালাদের সঙ্গে।

"সেই সময়ে গোপীদের মনের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামীও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শুধু বলেছেন, গোপীদের কৃষ্ণানুরাগ ও কৃষ্ণবিরহবেদনা অতুলনীয়।

"যাই হোক গোপীজনবল্লভকে এতকাল পরে কাছে পেয়ে গোপীরা তাঁদের নয়নের মণিকে দু'চোখ দিয়ে আকর্ষণ করতে থাকলেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের দু-চোখের দুয়ার দিয়েই তাঁরা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। প্রগাঢ় আলিঙ্গনের ফলে তাঁরো কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাব প্রাপ্ত হলেন। আর তারপরেই তাঁরা আনন্দ-মূর্চ্ছা লাভ করলেন।

"রাসবিহারী তখন বিভূতিশক্তি প্রকাশ করে একই সময়ে এক-সঙ্গে সমস্ত গোপীকে একইভাবে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গনের গাঢ়তায় গোপীদের মূর্চ্ছা দূর হল।

"কৃষ্ণ তখন সহাস্যে সখীদের জিজ্ঞেস করলেন—আশাকরি তোমাদের বিরহজ্বালা জুড়িয়েছে। তারপরে অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন। বললেন—এতদিন তোমাদের কাছে না আসার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভিমান করেছো। কিন্তু বিশ্বাস করো বৃহত্তর কর্তব্য সাধনের জন্যই সেদিন আমাকে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যেতে হয়েছে আর ঐ একই কারণে আমি মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছি।

"—জানি না তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা? কিন্তু না করলেও আমাকে বলতে হবে। কর্তব্যের প্রয়োজনে আমি দীর্ঘকাল তোমাদের কাছে আসতে পারি নি কিন্তু এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও আমি তোমাদের ভুলে যাই নি। অন্তরের অন্তস্থলে যে আরেকটি অন্তর আছে, তোমরা আমার সেই অন্তরের অন্তরতম স্থানে চিরকালের আসন পেতে রেখেছো। আমি তোমাদের ভুলে যাব কেমন করে? তাহলেও আমি এখুনি তোমাদের সঙ্গে ব্রজে ফিরে যেতে পারব না।

"—কেন? সঙ্গে সঙ্গে সখীরা সমস্বরে প্রশ্ন করলেন। তোমার তো কংসবধ শেষ হয়েছে।

"মৃদু হেসে কৃষ্ণ উত্তর করলেন—কংস তো একজন নয়, জরাসন্ধ শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক-একজন কংস। তবে এদের নির্মূল করতে আমার সময় খুব বেশি লাগবে না। আর তারপরেই আমি বৃন্দাবনে ফিরে যাবো, ফিরে যাবো তোমাদের কাছে।

"গোপীরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই স্তোকবাক্যে মোটেই তুষ্ট হলেন না। তাঁরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে থাকলেন—তা তো বটেই! এই সুদীর্ঘকাল সর্বদা তুমি আমাদের স্মরণ করেছো, আমাদের বিরহে তোমার হৃদয় বারবার বিদীর্ণ হয়ে গেছে। কারণ তুমি মহাপ্রেমিক। আর আমরা? আমাদের অন্তরে কি তোমার মতো প্রেম আছে? আমরা একবারও তোমাকে মনে করি নি। আমরা তোমাকে ভুলে সুখের সাগরে ডুবেছিলাম।

"কৃষ্ণ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না। তারপরে স্নিগ্ধস্বরে বললেন—সখী! তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করো না। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ অথবা বিয়োগ, বিরহ কিংবা মিলন মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সবই সৃষ্টিকর্তার অদৃশ্য হাতের কাজ—'নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি সঃ।'

"সখীরা আরও রেগে গেলেন। তাঁরা চীৎকার করে বলে উঠলেন, ওহে বাগ্মীশিরোমণি! যে ভগবান্‌কে তুমি সমস্ত বিরহ ও মিলনের নিয়ন্তা বলতে চাইছ, আমরা বলি, তুমিই সেই ভগবান্। সুতরাং সব দোষ তোমার।

"একটু ভেবে নিয়ে কৃষ্ণ বললেন—বেশ, তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। আমিই ভগবান্। কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ স্বাধীন, কারও অধীন নন। অথচ আমি অধীন ভগবান্। আমি তোমাদের স্নেহাধীন কারণ তোমরা আমার ভক্ত। আমার বিরহে তোমাদের ভক্তি আরও বেড়ে গিয়েছে। এবং এই বর্ধিত মহাপ্রেমের ফলে তোমরা সর্বাতিশায়ীরূপে আমাকে প্রাপ্ত হবে। আমিও পরম প্রেমধন লাভ করে ধন্য হব।"

একবার একটু থেমে পাঠক আবার বলতে থাকলেন,—

"সমাগত সুধীবৃন্দ! আপনারা জানেন যে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় এই পরম প্রেমধন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

'তোমাদের যে প্রেমগুণ, করে আমা অকর্ষণ,
আনিবে আমায় দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলাসিব রজনী দিবসে ॥'

"কৃষ্ণ তারপরে ব্রজবধূদের বললেন—আরেকটি কথা। আমি যদি ভগবান্ হই তাহলে তো আমার সঙ্গে তোমাদের কখনও বিরহ হতে পারে না। সর্বময় ভগবানের সঙ্গে কারও বিরহ হয় না। নিতান্ত অবিবেকবশতঃই তোমাদের মনে হচ্ছে যে, আমার সঙ্গে তোমাদের বিরহ রয়েছে। কাজেই তোমাদের এই অবিবেক ধ্বংস করবার জন্য কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি।

"বলা বাহুল্য শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশে কোন কাজই হল না। বরং গোপীরা তাঁকে বললেন—আমরা সংসারকূপে পতিতা নই, আমরা তোমার বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিতা। তোমার জন্য আমরা স্বামী ও সংসার ছেড়েছি। তোমাকে পাবার কামনারূপ তিমি আমাদের গ্রাস করতে চাইছে। হে নিষ্ঠুর, যাবার আগে বলে যাও আমরা কেমন করে বাঁচবো?

"কৃষ্ণকে নিরুত্তর দেখে ব্রজবালারা আবার বললেন—হয় তুমি ব্রজে এসে আমাদের বাঁচাও, নয়তো তুমি আমাদের সবাইকে মেরে দ্বারকা চলে যাও। দয়া করে কেবল দুঃখ সইবার জন্য আমাদের বাঁচিয়ে রেখো না,

'কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জিয়াও দুঃখ সহাইবারে।'

"—হয়তো তুমি বলবে, এই তো আমরা তোমাকে পেয়েছি। না। এ পাওয়ায় আমাদের বিরহজ্বালা দূর হচ্ছে না। কারণ

'তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভয়।'

"—হে নিষ্ঠুর! তুমি একবার অন্তত আমাদের অবস্থাটি বিবেচনা কর। আমরা ব্রজবাসী, আমরা যে কিছুতেই বৃন্দাবন ছাড়তে পারি না। তুমি তো জানো,

'অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে মনে এক করি মানি।'

"—আবার আমরা তোমাকেও ছাড়তে পারি না। আমাদের অবস্থা এখন,

'ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়।'

"—বলে দাও। হে ব্রজমাধব, একবার বলে দাও, আমাদের এখন কি উপায় হবে? হয়তো তুমি জিজ্ঞেস করবে, ব্রজের জন্য আমাদের এ আকুলতা কেন? তার উত্তরে আমরা বলব,

'রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাহাঁ গোপবেশ কাহাঁ নির্জন বৃন্দাবন॥
সেইভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥'

"—তোমার বেণু-গীতিতে গীতিময় বৃন্দাবনই আমাদের কাম্য। সে বৃন্দাবন না পেলেই আমাদের মরণ।

'ব্রজ আমার জীবন, তাহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন।'

"—তুমি তো জান, তোমার জন্যই বৃন্দাবন আমাদের এত প্রিয়। তুমি কেমন করে সেই বৃন্দাবনকে ভুলে গেলে?

'বৃন্দাবন গোবর্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জ রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, পিতামাতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্তে কেমনে পাসরিলা॥'

"—তুমি মধু-বৃন্দাবনের অনন্ত সম্পদ, তুমি ব্রজধামের প্রাণধন, তুমি একবার ব্রজে চলো, ব্রজবাসীকে বাঁচাও,

'তুমি ব্রজের জীবন ব্রজরাজের প্রাণধন,

তুমি সকল ব্রজের সম্পদ।
কৃপাদ্রি তোমার মন,   আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ।'

"রাধারাণী ও সখীদের কথায় কৃষ্ণের রাসরজনীর কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন তিনি গোপিনীদের বলেছিলেন—আমি তোমাদের কাছে ঋণী। সে কথাটি যে কতবড় সত্য, কৃষ্ণ তা আজ বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্রজনারীদের বিরহ-সাগরে ডুবিয়ে রেখে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গিয়ে তিনি শুধু তাঁর ঋণের বোঝা বাড়িয়েছেন। বৈষ্ণব-কবি তৎকালীন কৃষ্ণের মানসিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

'শুনিয়া রাধিকা বাণী,   ব্রজ প্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন।
ব্রজলোক প্রেম শুনি,   আপনাকে "ঋণী" মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন॥'

"শ্যামসুন্দর তখন শ্রীরাধিকা ও সখীদের বললেন—

'ব্রজবাসী যতজন,   মাতাপিতা সখাগণ,
সব মোর হয় প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ,   সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥'

"—তোমাদের ভালবাসায় আমি বশীভূত। আমি আমার নই, আমি তোমাদেরই। তোমাদের সঙ্গে আমার এই সুদীর্ঘ বিরহ নিতান্তই দুর্দৈব। কিন্তু দুর্দৈবের ওপর তো কারও হাত নেই! তাই আমার পক্ষে এই বিরহকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

'তোমা সবার প্রেম রসে,   আমাকে করিলে বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া,   আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল॥'

"—রাধে, এই প্রসঙ্গে তোমাকে আরও কয়েকটি কথা বলব। তুমি 'অকৈতব' প্রেমের কথা শুনেছো। অকৈতব শব্দের অর্থ নির্দোষ।

যে প্রেমে কোন কপটতা নেই, কোন স্বার্থগন্ধ এবং সুখানুসন্ধান নেই, আছে শুধু পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুখকামনা, তাই অকৈতব প্রেম। অকৈতব প্রেমে কখনও বিরহ হতে পারে না। কারণ সেই প্রেমের প্রেমিকারা বিরহের সময় নিজের কথা না ভেবে প্রিয়জনের কথা ভাবে। ভাবে যে আমার এই অবস্থার কথা সে যদি জানতে পারে, তাহলে সে আর বাঁচবে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এই বিরহজ্বালাকে মিলন-মালায় রূপান্তরিত করতে হবে।

"তাছাড়া অকৈতব প্রেমেব প্রেমিকা প্রেমিকারা তো উভয়ে উভযকে প্রাণ-মন সমর্পণ করেছে। অপরকে সমর্পিত প্রাণ সে কেমন কবে নাশ করবে? সুতরাং তাদের আত্মহত্যা করার অধিকারও নেই।"

একবার থামলেন পাঠক। সামনে রাখা জলের গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "সুধীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্তব্যকে জনৈক বৈষ্ণব-কবি বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

'সেই সতী প্রেমবতী প্রেমবান সেই পতি,
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয় হ'তে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ.
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥'

"শ্রীকৃষ্ণ তারপরে শ্রীরাধিকাকে বললেন—এতক্ষণ তোমাকে আমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকার কথা বললাম। এবারে আমার কথা শোন!

"—আমি জানতাম, আমার বিরহে তুমি দিন-রাত দগ্ধ হচ্ছ, তুমি মরণোন্মুখ হয়ে আছো। পাছে তুমি আমার বিরহজ্বালায় প্রাণত্যাগ করো, তাই আমি প্রতিদিন নারায়ণের কাছে, তোমার প্রাণভিক্ষা করতাম।

"—অবশেষে নারায়ণ আমাকে এমন শক্তি দান করলেন যে, প্রতিদিন তোমার কাছে এসে তোমাকে দেখতাম, বহুক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে প্রেমক্রীড়া করতাম। ফলে আমাদের দুজনেরই বিরহতাপ

প্রশমিত হত।

"—তুমি কিন্তু আমার এই আসা-যাওয়া টের পেতে না। কারণ যোগমায়া দেবী তোমাকে তা বুঝতে দিতেন না। ফলে তুমি সেই প্রেমক্রীড়াকে তোমার মনের সহজাত আনন্দ বলে ধরে নিতে।

"কৃষ্ণের এই কথাকেও বৈষ্ণব-কবি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন,

'রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আমি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই, যদুপুরী.
তাহা তুমি মান মোর স্ফূর্তি॥'

"কৃষ্ণ সেদিন রাধারাণীকে আরও অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমার প্রতি তোমার যে প্রবল প্রেম, সেই প্রেমবলে আমি তোমারই, শুধু তোমারই। আবার তোমার সেই প্রেমধনকে আমিও পরম সম্পদ বলে মনে করি। সুতরাং আমাদের প্রেমও অকৈতব প্রেম। এ প্রেমের ক্ষয় নেই।

"—আমার বিশ্বাস, যে প্রেম প্রতিদিন অপ্রকটভাবে আমাকে তোমার কাছে আকর্ষণ করেছে, অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রেম প্রকট-ভাবেও আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আবার মধু-বৃন্দাবনে মিলিত হব।

'মোর ভাগ্যে মো বিষয়, তোমার যে প্রেম হয়,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায়া, তোমা সনে,
প্রকটেই আনিবে সত্বর॥'

"রাধারমণ নীরব হলেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে প্রেমগঙ্গা প্রবাহিত হতে থাকল। আনন্দাশ্রুর প্রবাহে রাধারাণীও বাক্যহীনা। দুজনের তখন একই অবস্থা। ভক্তকবির ভাষায়—'লোরে দুঁহু দেখিতে না পায়।'

।। এগারো ।।

গতকাল রাত সাড়ে ন'টায় ট্রেন ছেড়েছে দ্বারকা থেকে। দূরত্ব কম বলেই বোধহয় কাল আমাদের দ্বারকা মেল-য়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। পথে মিঠাপুর নামে একটি মাত্র স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। মিঠাপুর বেশ সমৃদ্ধ জায়গা। সেখানে বিড়লাদের একটি ক্যামিক্যাল্‌স ফ্যাক্টরী রয়েছে। আর আছে মিঠে জল। মিঠাপুরের মিঠে জল ওখাবাসীদের তৃষ্ণা মিটায়। সীমাহীন সাগর-সৈকতে অবস্থিত হয়েও ওখা তার অধিবাসীদের তেষ্টা মেটাতে পারে না। রেলযোগে ওখার পানীয় জল আসে মিঠাপুর থেকে।

কালরাতে তোতাদ্রি মঠে ভাগবত-পাঠ শুনে গাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি ছেড়েছে দ্বারকা থেকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থল ওখায় পৌঁছে গিয়েছি। শুধু আমাদের নয়, দ্বারকা মেল-য়েরও গন্তব্যস্থল ওখা। দ্বারকার নামে ট্রেনটির নাম কিন্তু তার যাত্রাপথ শেষ হয় দ্বারকা ছাড়িয়ে ওখায় এসে। আমরা কাল ওখা এসেছি, আজ বেট-দ্বারকা দর্শন করব বলে।

গুজরাতী ভাষায় বেট (Vet/Bait/Beyt) শব্দের অর্থ দ্বীপ। অর্থাৎ বেট-দ্বারকা মানে দ্বীপ-দ্বারকা। আমরা আজ সেই দ্বীপতীর্থ দর্শক করব।

অনেকে একে ভেট-দ্বারকাও বলেন। ভেট মানে দুই বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ। কিংবা সাক্ষাতের পরে দেওয়া সওগাত বা উপঢৌকন। কথিত আছে ওখানেই বাল্যবন্ধু শ্রীদাম ওরফে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের জন্য একমুঠো চিঁড়ে ভেট নিয়ে এসেছিলেন।

রেলপথে দ্বারকা থেকে ওখার দূরত্ব ৩০·৫ কিলোমিটার, মোটরপথে ৩২ কিঃ মিঃ। বম্বে থেকে জলপথেও ওখা আসা যায়। প্রতি সপ্তাহে সিন্ধিয়া কোম্পানীর একখানি জাহাজ যাওয়া-আসা করে।

ওখা কাথিওয়াড় উপদ্বীপের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত, কচ্ছ উপসাগরের তীরে পশ্চিম-ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। বন্দরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে জনপদ। আয়তন ৪'৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ। ১৯০৮টি বাড়িতে ১০,৬৮৭ জন স্থায়ী বাসিন্দা নিয়ে বর্তমান বন্দর-নগরী ওখা।

প্রাতরাশ সেরে সকাল সওয়া আটটা নাগাদ গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আমরা দ্বারকা দর্শন সেরে বেট-দ্বারকায় যাচ্ছি—সবাই তাই যান।

রেল-লাইন পেরিয়ে বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত এলাকা। সামনে সাগর—সীমাহীন সাগর। পুরী কিংবা দীঘার মতো বিক্ষুব্ধ বারিধি নয়, শান্ত ও সুনীল বারীশ। অথচ শুনেছি সমুদ্র এখানে খুবই গভীর। তাই বারোমাস বড় বড় জাহাজ সোজাসুজি জেটিতে এসে ভিড়তে পারে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের সংকীর্ণ বাঁধানো পথটি এসে প্রশস্ত রাজপথের সঙ্গে মিলিত হল। পথটি অনেকটা বাঁধের মতো। বাঁদিকে বেলাভূমি, ডানদিকে সারি সারি সুদৃশ্য বাংলো। প্রত্যেক বাংলোর সামনে বাগান। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে যাত্রীবাহী বাস ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করছে। আমরা সমুদ্রতীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি।

রেল-স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার এসে স্টিমার-স্টেশন্। একটি বেশ বড় জেটি, যাত্রীদের জন্য মাঝারি বিশ্রামাগার ও ছোট টিকিটঘর নিয়ে স্টেশন্। আমরা টিকিট কেটে লঞ্চে নেমে এলাম। ওখা থেকে বেট-দ্বারকা ৫ কিলোমিটার। ভাড়া ৬০ পয়সা।

লঞ্চ না বলে একে বড় মোটরবোট বলাই উচিত হবে। চারি-পাশে উঁচু বসবার জায়গা। মেয়েরা বিশেষ করে বৃদ্ধারা বসতে চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য লঞ্চ চললেই তাঁরা জলে পড়ে যাবেন এবং একবার জলে পড়ে গেলে আর বাঁচবেন না। অনেক বলে-কয়ে তাঁদের ভয় ভাঙানো গেল।

সকাল ন'টায় লঞ্চ ছাড়ল। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে সোজা পুবে এগিয়ে চললাম। বহু পালতোলা নৌকো নিশ্চিন্তে যাতায়াত করছে। দেখে ভীত সহযাত্রিণীরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন।

ওখা বন্দরের জাহাজঘাট দেখা যাচ্ছে এখন। বেশ কয়েকখানি বড় বড় জাহাজ নোঙর করে আছে। মাল খালাস ও বোঝাই করার কাজ চলেছে।

অনেকটা এগিয়ে এসেছি, সামনে বেট-দ্বারকা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সবুজ-স্বপ্নের দেশ। আর পেছনে ওখাকে দেখাচ্ছে একখানি পটে-আঁকা ছবির মতো। দ্বারকা ও মিঠাপুরকেও দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণে। কিন্তু দ্বারকা কিংবা ওখার কথা আর নয়, বেট-দ্বারকার কথাই ভাবা যাক্। আমরা যে এখন সেখানেই চলেছি।

২২°২৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৬[illegible]৮´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই দ্বীপতীর্থ। জনপ্রিয় নাম শঙ্খোদ্ধার-বেট। মূল ভূখণ্ড বা ওখামণ্ডলের ৫ কি. মি. দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগরের একটি বালি ও প্রস্তরময় সংকীর্ণ দ্বীপ। আকারটি অবিকল শঙ্খের মতো। এখানে প্রচুর শঙ্খ পাওয়া যায়। নিয়মিত রপ্তানি হয়। আগে উড়িষ্যায় পর্যন্ত চালান যেত।

শাঁখের মতো দেখতে বলেই কিন্তু এ দ্বীপের নাম শঙ্খোদ্ধার-বেট নয়। কথিত আছে, বিষ্ণুর সাহায্যে মহাদেব এখানে শঙ্খচূড় দৈত্যকে সংহার করেছিলেন এবং এখানেই নারায়ণ শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসীদেবীর সতীত্বনাশ করে তাঁকে গুল্মে রূপান্তরিত করেন। আর তাই বেট-দ্বারকার অপর নাম রমণ-দ্বীপ। জানি না শ্রীমদ্ভাগবতের কালীয়দমন লীলায় বর্ণিত রমণক-দ্বীপের সঙ্গে বেট-দ্বারকার কোন সম্পর্ক আছে কিনা!*

আরও একটি নাম আছে বেট-দ্বারকার— সানজানা। য়ুরোপীয় বণিকরা যখন প্রথম এদিকে আসেন, তখন সানজানা নামে জনৈক জলদস্যু এখানে রাজত্ব করত। তাই তাঁরা এ দ্বীপের নাম রেখেছিলেন সানজানা।

মাত্র মিনিট পঁচিশ পরেই আমাদের সমুদ্রযাত্রা শেষ হল। লঞ্চ

---

* লেখকের 'মধু-বৃন্দাবনে' (ব্রজপর্ব) দ্রষ্টব্য।

নোঙর করল বেট-দ্বারকার জেটিঘাটে। এখান থেকেই বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। শুনেছি ৬৫৮টি বাড়িতে ৬৬৭টি পরিবার বাস করেন এই দ্বীপে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৩,৬৭১ জন। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, ১৮৭২ জন। দ্বীপের আয়তন ১১.৫ বর্গ কি. মি.। গড়ে বছরে প্রায় লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী এখানে আসেন, আমি তাঁদেরই একজন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খোদ্ধার-লীলার কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই আমার। তাহলেও জন্মাষ্টমী বেট-দ্বারকার বৃহত্তম বাৎসরিক উৎসব। তখন এখানে বেশ বড় মেলা হয়। কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন এটাই শ্রীকৃষ্ণের আসল দ্বারকা।

জেটির বাইরে আসার সময় ৩০ পয়সা করে তীর্থযাত্রী-শুল্ক দিতে হল। এটা স্থানীয় পঞ্চায়েতের আয়। তার মানে কেবলমাত্র তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকেই তাঁরা বছরে হাজার তিরিশ টাকা আয় করে থাকেন।

জেটি পেরিয়ে পথে এলাম—সংকীর্ণ ও চড়াই পথ। খানিকটা সামনে গিয়ে মূল-পথে মিশেছে। সে পথটি সমতল। কয়েক মিনিট পদচারণার পরে আমরা সারি বেঁধে সেই পথে উঠে এলাম। পথের দু-পাশেই বাড়ি-ঘর আর দোকান-পাট। অধিকাংশই মনোহারী দোকান। খেলনা থেকে পুজোর উপকরণ পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমার কলকাতাবাসী সহযাত্রিণীরা অনেকেই প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হল না। ম্যানেজার কড়া নির্দেশ দিল—কেনাকাটা এখন নয়, ফেরার পথে।

বাঁদিকে এগিয়ে চলি। সামান্য খানিকটা হেঁটেই তোরণ। এখান থেকেই বোধকরি মন্দির-এলাকা শুরু হল। কয়েক পা এগিয়ে আবার একটি তোরণ। তারপরেই ডানদিকে মন্দির। প্রথমে পুরনো, পরে নতুন মন্দির। পুরনো মন্দিরটি জরাজীর্ণ, এখন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

অনেকে বলেন, শঙ্খচূড়ের মৃত্যুর পরে সত্যযুগে নির্মিত হয়েছিল ঐ মন্দিরটি। আমার কিন্তু মন্দিরের গড়ন ও অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে

এটি কলিযুগে নির্মিত। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থাও এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করছে। আর শঙ্খচূড়ের কাহিনী কিছুতেই সত্যযুগের হতে পারে না। কারণ সেটি কৃষ্ণলীলার পরে অনুষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পুরাতাত্ত্বিকরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে, বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বেট-দ্বারকার আদি-নারায়ণ মন্দিরটি সম্ভবতঃ কোন বৌদ্ধস্তূপের ওপরে নির্মিত। রাজস্থানী ইতিহাসের জনক কর্ণেল টড্* ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানে অনেক বুদ্ধমূর্তি দর্শন করেছেন। মাত্র কয়েক বছর আগেও সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী এখানকার পাঠাগার থেকে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি বোম্বাই নিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া পুরাতাত্ত্বিকরা এখানে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের আরও বহু নিদর্শন পেয়েছেন।

তবে এই দ্বীপে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৈদিক দেব-দেবী পুজার প্রচলন ছিল, তাঁরও অসংখ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

একখানি পাথরে খোদিত একটি অপূর্ব-সুন্দর প্রাচীন নব-মাতৃকা অথবা নব-গ্রহ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। শুনেছি সেটি এই মন্দিরের কোন দেওয়ালেই স্থাপিত করা হয়েছে। মূর্তিটি নাকি ইতিহাস ও পুবাতাত্ত্বিক গবেষকদের এক মূল্যবান সংগ্রহ।

বেট-দ্বারকায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন মূর্তিটিও লক্ষ্মী-নারায়ণের। মহাকাল এখনও সেই মূর্তিটিকে নষ্ট করে ফেলতে পারে নি। এমনকি নারায়ণের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায়। সেই মূর্তিটি নিয়েও বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ পণ্ডিতরা মনে করছেন, সেটির সাহায্যে এই দ্বীপের প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাসের অবলুপ্ত অধ্যায়কে উদ্ধার করা সম্ভব।

একটি বড় দরজা পেরিয়ে আমরা নতুন মন্দিরে প্রবেশ করি। দারোয়ান ছুটে আসে আমার কাছে। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই সে ছোঁ-মেরে আমার কাঁধ থেকে ক্যামেরাটি নিয়ে নেয়। বলে, ফেরার সময় ফেরত নিয়ে যাবেন।

---

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

ভারতের অধিকাংশ বড় মন্দিরেই ক্যামেরার প্রতি এই ভীতি দেখতে পেয়েছি। বিগ্রহ তো দূরের কথা, নাট-মন্দিরের ভেতরে পর্যন্ত ছবি তুলতে দেওয়া হয় না। কেন তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। কারণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে দেখেছি, তাঁরা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। জিদের বশেই তাঁরা এই অর্থহীন নিয়মটি চালু রাখতে বদ্ধপরিকর।

দারোয়ানের হাতে ক্যামেরাটি সমর্পণ করে নিঃশব্দে নাট-মন্দিরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। মন্দির তো নয়, একটি ছোট দুর্গ। বাইরের দিকে একটিমাত্র দরজা। তিনদিকেই উঁচু এবং মজবুত দেওয়াল। মন্দির মোটেই প্রাচীন নয়। মাত্র ১৮৫ বছর আগে কচ্ছের তৎকালীন রাও এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। তখন মুসলমান রাজত্বকাল শেষ হয়ে গিয়েছে তবু এ মন্দিরকে যথাসাধ্য সুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

নাট-মন্দিরটি বেশ প্রশস্ত। মেঝেতে মূল্যবান টাইল্‌স। তবে দেওয়ালে কোন কারুকার্য দেখতে পাচ্ছি না। স্তম্ভগুলি কাঠের তৈরি। প্রাচীন মন্দিরটির গড়নও নাকি এমনি ছিল।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গেরুয়া পরিহিত বারোজন তরুণ ব্রহ্মচারী সমবেতকণ্ঠে কীর্তন করছেন। একটু দূরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে জনৈক ভক্ত একক-ভজন গাইছেন: সুন্দর একটি উৎসবের পরিবেশ রচিত হয়েছে।

কিছুক্ষণ গান শুনে আমরা দর্শন শুরু করি। নাট-মন্দিরের দু-ধারে পাশাপাশি তিনটি করে ছ'টি ছোট মন্দির রয়েছে। প্রথমেই দরজার দু-পাশে রাধারাণী ও রুক্মিণীদেবীর মন্দির। নির্মাতারা বোধ করি মন্দিরের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলার মাঝে মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

ব্রজেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বরীকে প্রণাম করে আমরা অন্যান্য মন্দিরগুলি দর্শন করি—দ্বারকানাথ সত্যভামা জাম্ববতী ও দেবকী-মায়ের মন্দির। বলরাম প্রদ্যুম্ন গরুড় অম্বিকা বেণীমাধব এবং পুরুষোত্তম ভগবানেরও মূর্তি রয়েছে এখানে। আমরা তাঁদের প্রণাম করি।

মন্দিরগুলো ছোট হলেও সুসজ্জিত। প্রত্যেকটি মন্দিরের দরজা রুপোর পাতে মোড়া। তার ওপরে সুন্দর কারুকার্য। দরজার সামনে খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। মেয়েরা ঢুকতে পারে সেই অংশে। আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে হল।

এই ছোট মন্দির ছ'টি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মুসলমান আক্রমণের পরে প্রথম নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বাহিনী কর্ণেল ডনোভ্যানের নেতৃত্বে সেগুলি ধ্বংস করে ফেলে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এমন নজীর খুব বেশি নেই। যাই হোক্, অনুতপ্ত ব্রিটিশ শাসকেরা সে বছরই বরোদার গায়কোয়াড়কে আবার মন্দিরগুলি পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন।

ব্রহ্মচারীদের কীর্তন শেষ হয়ে গেল। তাঁরা চলে গেলেন মন্দির থেকে। ভক্তের ভজন শেষ হয় নি। কিন্তু আমরা তাঁর পাশে আর না দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাট-মন্দিরের দেওয়ালে টাঙানো রঙীন ছবিগুলো দেখতে থাকি। ভরতের পাদুকা-পূজন, গরুড়ের দেহত্যাগ, মা-যশোদার গো-দোহন, রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে উপদেশ দান ও বিশ্বরূপ-দর্শন প্রভৃতির ছবি রয়েছে এখানে।

দর্শন সেরে নাট-মন্দির থেকে গর্ভ-মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই মন্দির—শঙ্খনারায়ণের মন্দির। মন্দিরের গড়ন অনেকটা দ্বারকার মন্দিরের মতো, তবে আকারে অনেক ছোট।

এখন দর্শন বন্ধ, দরজার সামনে পর্দা ঝুলছে। জনৈক ব্রহ্মচারী জানালেন, "একটু বাদেই দর্শন শুরু হবে। আপনারা ততক্ষণে নারায়ণের গদি ঘুরে আসুন।"

সহযাত্রী অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন, "কোথায় গদি?"

"এই তো পাশেই।" ব্রহ্মচারী ইশারায় দেখিয়ে দেন।

ষোড়শী সহযাত্রিণী বিউটি জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খনারায়ণ দৈনিক ক'বার দর্শন দান করেন?"

"চারবার। সকাল সাড়ে সাতটা ও সাড়ে ন'টায় এবং বেলা বারোটা ও বিকেল পাঁচটায়। সন্ধ্যে আটটায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।"

বিউটি কলেজে পড়া আধুনিকা। সুতরাং সে ঘড়ি দেখে পাল্টা-প্রশ্ন করে, "সাড়ে ন'টা তো বেজে গিয়েছে, এখনও দর্শন শুরু হয় নি কেন ?"

ব্রহ্মচারী লজ্জা পান। সবিনয়ে বলেন, "এখুনি শুরু হবে। আপনারা ততক্ষণে গদিটা একবার ঘুরে আসুন।"

গর্ভ-মন্দিরের পাশেই মন্দির কর্তৃপক্ষের গদি বা অফিস। মাঝারি আকারের একখানি ঘর। একপাশে একটা লোহার সিন্দুক ও কিছু খাতাপত্র, আরেক পাশে একখানি খাটিয়া। খাটিয়ার দিকে দেওয়ালে কয়েকখানি কৃষ্ণলীলার রঙীন ছবি, তার মধ্যে কৃষ্ণ-সুদামার ছবিখানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

॥ বারো ॥

জনৈক স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন প্রৌঢ় খাটিয়ার ওপরে আধশোয়া হয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী সবিনয়ে বললেন, "মন্দিরের অধ্যক্ষ।"

আমরা ভেতরে ঢুকে দু-হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করি। তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "নমস্কার। বসুন. বসুন।"

আমরা আপত্তি না করে বসে পড়ি।

অধ্যক্ষ ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বলতে শুরু করেন, "এই যে বে[illegible] দ্বারকায় আপনারা আজ এসেছেন এটাই আসল দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণে[illegible] দ্বারকা, মহাভারত এবং পুরাণের দ্বারকা। আপনারা বহুদূর থেকে তীর্থদর্শনে এসেছেন, আপনারা সকলেই ভক্ত—কৃষ্ণভক্ত। আপনারা জানেন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চাশ অধ্যায়ের উনপঞ্চাশ শ্লোকে[illegible] শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী নির্মাণের কাহিনী বলা হয়েছে—

'ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ ॥'

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মন্ত্রণা করে সমুদ্রের ভেতরে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ এবং সেই দুর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য নগর

নির্মাণ করলেন।

"অথচ আপনারা যে দ্বারকা দেখে এসেছেন সে দ্বারকায় এক-দিকে সমুদ্র, সে দ্বারকা সাগরের ভেতরে নয়। আর দেখুন, আমাদের এই বেট-দ্বারকার চারিদিকেই সমুদ্র। সুতরাং এই হচ্ছে আসল দ্বারকা। এখানেই ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাজপুরী, এখানেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্যবন্ধু সুদামার সেবা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের আশি ও একাশি অধ্যায়ে ভগবদনুগ্রহে ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধি-লাভের সে কাহিনী বলা হয়েছে।"

থামলেন অধ্যক্ষ। এতক্ষণে কৃষ্ণ-সুদামা ছবিখানি টাঙিয়ে রাখবার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই সহযাত্রী বড়-ঠাকুরমা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল ভাষায় প্রশ্ন রাখলেন, "গল্পটা এট্টু কয়েন না ঠাকুরমশায়!"

অধ্যক্ষ ফরমাশটা বুঝতে না পেরে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিতেই তিনি সহাস্যে আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন কংসবধের পরে কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। তখন শ্রীদাম বা সুদামা নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক ছিলেন তাঁদের সহপাঠী। লেখাপড়া শিখে শ্রীদাম বেদজ্ঞ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও বিষয়াসক্তিশূন্য। ফলে তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি। কৃষ্ণ যখন পরম ঐশ্বর্যশালী ও যশস্বী হয়ে দ্বারকায় রাজত্ব করছেন, সুদামার তখন দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোটানো দায়।

"সুদামার ব্রাহ্মণী সুরূপা রোজই ভাত কলমীশাক ও তেঁতুল-পাতার অম্বল রেঁধে স্বামী ও ছেলের পাতে দেন। স্বামী নিঃশব্দে খেয়ে ওঠেন। কিন্তু একদিন শিশুপুত্র বেণু বলে বসল—আমি রোজ রোজ এ খাবার খেতে পারব না। আমি আজ পায়েস খাব।

"সুদামা গর্জে উঠলেন। সুরূপাকে বললেন—দেখ, তোমার এই ছেলের জ্বালায় আমি দেশান্তরী হব।

"সুরূপা স্বামীকে বললেন—আহা! দুধের শিশু বৈ তো নয়, একটা আবদার করেছে। আমি সই-য়ের কাছ থেকে চাল দুধ ও

মিষ্টি চেয়ে এনে ওকে একটু মিষ্টান্ন করে দিচ্ছি।

"—এমন আবদার ভাল নয়। সুদামা বললেন—ও আমাকে নির্ঘাৎ দেশান্তরি করে ছাড়বে। তুমি দেখে নিও।

"পায়েস খেয়ে বেণু ঘুমিয়ে পড়ার পরে সুরূপা স্বামীকে বললেন—তুমি বলছিলে না দেশান্তরী হবে। তা একবার দ্বারকায় যাও না। যদুপতির সঙ্গে এক টোলে পড়েছো। তিনি এখন দ্বারকার রাজা। শুনেছি তাঁর কাছে যে যা চায়, তাই পায়। আমাদের জন্যে নয়, বেণুর জন্য কিছু চেয়ে আনো। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

"—কিন্তু দ্বারকা যে বহুদুর।

"—তা হোক্ গে। কত লোকই তো যাচ্ছে সেখানে।

"—বেণুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে কি?

"—কটা দিন যেমন করে পারি, কাটিয়ে দেব।

"—এতদিন পরে যাচ্ছি, সখার জন্য তো কিছু নিয়ে যেতে হয়।

"সুরূপা পরদিন সকালে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চারমুঠো চিঁড়ে চেয়ে এনে সুদামার কোঁচড়ে বেঁধে দিলেন। বেণুকে কাঁধে নিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারকার পথে যাত্রা করলেন।

"পথে তাঁর মহাবিপদ হল। একটা বানর বেণুকে চুরি করে নিয়ে গেল। তিনদিন অনাহারে দেবালয়ে ধর্ণা দিয়েও ছেলেকে ফিরে পেলেন না। ভাবলেন—কার জন্য দ্বারকায় যাওয়া? তবু যাই। দ্বারকাধীশের কাছে নাকি যে যা চায়, তাই পায়। দেখি যদি বেণুকে ফিরে পাই!

"সুদামা দ্বারকায় এলেন। রাজপ্রাসাদ অর্থাৎ এই মন্দিরের সামনে আসতেই দ্বারকাধীশ ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন—সখা, ভাল আছো তো?

"—হ্যাঁ। সুদামা উত্তর দিলেন। ভক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের দারিদ্র্য ও পুত্র-হরণের কথা বলতে পারলেন না ভগবানকে।

"শ্রীকৃষ্ণ শৈশব-সখাকে পরম-সমাদরে ভেতরে নিয়ে এলেন। তিনি পা ধুইয়ে সুদামাকে অভ্যর্থনা-কক্ষে এনে বসালেন। তাঁকে অর্ঘ্যদান

করলেন। মণিমুক্তো-খচিত সুবর্ণময় প্রাসাদের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দেখে সুদামা অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন, তিনি ঘামতে আরম্ভ করলেন। আর ঠিক তখুনি রুক্মিণী এলেন সেখানে। সুদামাকে প্রণাম করে বললেন—সখা, পায়ের ধুলো দিন।

"কোনমতে সামলে নিয়ে সুদামা সহাস্যে বললেন—পাব কোথায়? সবই যে আমার সখা ধুইয়ে দিয়েছে।

"রুক্মিণী বললেন—এবার তাহলে খেতে চলুন।

"সুদামা খেতে বসলেন। কেশব তাঁর পাশে বসে রইলেন। রুক্মিণী নিজে পরিবেশন করলেন। এত যত্ন করে সুদামাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি, এমন সুস্বাদু খাবারও তিনি খান নি কোনদিন।

"খাবার পরে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে এলেন। সহসা কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে—সখা, সখী আমার জন্য কি উপহার পাঠিয়েছে?

"সুদামা মুশকিলে পড়লেন। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি সেই চিঁড়ে বার করেন কেমন করে? তিনি চুপ করে রইলেন।

"কৃষ্ণ বললেন—নিশ্চয়ই কিছু এনেছো। বলেই অন্তর্যামী কৃষ্ণ সুদামার কোঁচড় থেকে সেই চিঁড়ে কেড়ে নিলেন। একমুঠো মুখের ভেতর চালান করে দিয়ে পরমানন্দে চিবুতে থাকলেন। লজ্জিত বদনে সুদামা নীরবে বসে রইলেন

"খাওয়া শেষ হলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সখা, তুমি এমন ভোজ্য লুকিয়ে রেখেছিলে! জীবনে আর দু-দিন এমন অমৃত আস্বাদন করেছি—একদিন বিদুরের ঘরে খুদ, আরেকদিন পাঞ্চালীর উচ্ছিষ্ট শাকান্ন। এই বলে কৃষ্ণ আবার যেই আরেকমুঠো চিঁড়ে মুখে দিতে যাবেন অমনি রুক্মিণী ছুটে এসে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—প্রভু, তুমি একমুঠো গ্রহণ করার পরেই আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে বিকিয়ে গিয়েছি। আর তোমার কি আছে যে তুমি আরেকমুঠো খেতে যাচ্ছো?

"কৃষ্ণ হেসে সুদামাকে বললেন—সখা, এবার শুয়ে পড়।

"কিন্তু সেই দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েই সুদামার মনে হল তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। আর তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ

এবং রুক্মিণী তাঁর পা টিপতে শুরু করে দিলেন।

"ঘুম ভাঙার পরে সুদামা দেখলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর বেণুর কথা মনে পড়ল। তিনি কৃষ্ণকে সব খুলে বললেন। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—বেণুকে চাও, পাবে। কিন্তু আসল ছেড়ে নকল কেন? স্বপ্ন নিয়ে আর ভুলে থেকো না। এই বিশ্ব-সংসার স্বপ্ন, কেবল আমিই সত্য। আমাকে জানো, বন্ধন ঘুচে যাবে।

"বিস্মিত ব্রাহ্মণ বললেন—বেণু স্বপ্ন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

"—পারবে না। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—সমাধি না হলে একথা বুঝতে পারা যায় না। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় মনে হয়, সব সত্য। কিন্তু চোখ মেললেই স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। আবার তেমনি সংসার-স্বপ্ন চোখ বুজলে মিলিয়ে যায়। জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন কর, দেখবে সব স্বপ্ন—সব মায়া।

"সব স্বপ্ন, সব মায়া—এই কথা ভাবতে ভাবতে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সুরূপার পরামর্শমতো নিজের দারিদ্র্যের কথা তিনি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না কৃষ্ণকে, কোন সাহায্যই চাইতে পারলেন না দ্বারকানাথের কাছে।

"কিন্তু তিনি তো আন্তর্যামী। কাজেই সুদামা ঘরে ফিরে সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, তাঁর ভাঙা কুটিরের জায়গায় এক সুবিশাল প্রাসাদ। ধন-রত্ন দাস-দাসী কোন কিছুরই অভাব নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর, বেণুকে কোলে নিয়ে সুরূপা সহাস্যবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই প্রাসাদের সামনে। তিনি সুদামাকে সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছেন।

"সুদামা ভাবলেন—প্রভু যা বলেছেন, তাই ঠিক। সব স্বপ্ন, সব মায়া।"

অধ্যক্ষ থামতেই ছোট-ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "সেই সুদামাপুরী কোথায় ছিল ঠাকুরমশাই?"

"পোরবন্দরে। সমুদ্রের তীর দিয়ে হেঁটে গেলে সোজা পথে ওখা থেকে দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু রেলে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে

যেতে হয়।"

একবার থামলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার শুরু করেন, "ভক্তবৃন্দ! আপনারা বহুদূর থেকে এই পরম পবিত্র তীর্থে আগমন করেছেন। অনেক টাকা খরচ করে আপনাদের এখানে আসতে হয়েছে। ফিরে যেতেও বহু টাকা খরচ হবে। হয়তো আপনাদের হাতে উদ্বৃত্ত খুব সামান্যই আছে। তাহলেও আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা পুজো না দিয়ে এই পবিত্রতীর্থ ত্যাগ করবেন না। ১.২৫ পয়সা থেকে শুরু করে ১০১.০০ টাকার পর্যন্ত পুজো হয় এখানে।

"আমি একটা একশ' এক টাকার পুজো দিতে চাই।" অধ্যক্ষজী কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে সামন্তবাবু হিন্দীতে বলে উঠলেন।

সবাইকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই বোধ করি জবাবদিহির স্বরে সামন্তবাবু সবিনয়ে বাংলায় বলেন, "ভগবান যখন দিয়েছেন আমাকে, তখন তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করব না কেন? তাছাড়া জীবনে আর তো কোনদিন আসাও হবে না এই পুণ্যতীর্থে।"

সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই সাধ্যমত পুজোর টাকা জমা দিলেন। আর তারপরে অতর্কিতে ঘণ্টাধ্বনি মূর্ত হয়ে উঠল। অধ্যক্ষ জানালেন, "দর্শন শুরু হয়ে গেছে। আপনারা মন্দিরে চলে যান। ওখানে বসেই প্রসাদ পেয়ে যাবেন।"

আমরা প্রায় ছুটে আসি মন্দিরে। সমবেত ভক্তবৃন্দের পেছনে এসে দাঁড়াই। সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা সত্যসুন্দর শঙ্খনারায়ণকে অপলক নয়নে দর্শন করি।

গর্ভ-মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে সোনালী সিংহাসন। তারই ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শঙ্খনারায়ণ—কষ্টি-পাথরের দণ্ডায়মান অপরূপ বিগ্রহ। তাঁর সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার, মাথায় সোনার মুকুট। মূর্তিটি অবিকল রণছোড়জীর মতো। দ্বারকার পাণ্ডারা বলেন, স্থানীয়রা এটি দ্বারকা থেকে অপহরণ করে এনেছে। এটি দ্বারকাধীশ মন্দিরের দ্বিতীয় বিগ্রহ। সে যা-ই হয়ে থাক্, আমি

সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি।

—শ্রীশ্রীদ্বারকানাথ জীউ কি···

—জয়!

—ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্খনারায়ণ জীউ কি···

—জয়!

জয়ধ্বনি শেষ হবার আগেই শুরু হয় আরতি—ভোগারতি।

আমি দু-চোখ ভরে অপরূপ আরতি দর্শন করছি আর মনে মনে ভেবে চলেছি সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী—শঙ্খোদ্ধারের পুণ্যকথা—

সে কাহিনীর নায়কও সুদামা—আরেক সুদামা। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হয়েছে সুদামা নামে জনৈক গোপ রাধারাণীর অভিশাপে দৈত্যবংশে জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল শঙ্খচূড়। তিনি তপস্যা করে বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন।

সন্তুষ্ট বিষ্ণু তাঁকে একটি কবচ দান করে বললেন—এই কবচ সঙ্গে থাকলে তুমি অবধ্য।

তপোমুগ্ধ শিব শঙ্খচূড়কে বর দিলেন—যতদিন তোমার স্ত্রী সতী থাকবে, ততদিন তুমি অজেয় এবং অমর রইবে।

কথিত আছে তুলসী নামে রাধারাণীর এক সখী ছিলেন। রাধা একদিন তাঁকে রাধারমণের সঙ্গে সঙ্গমরতা দেখতে পেয়ে অভিশাপ দিলেন—তুই মানবযোনি প্রাপ্ত হ'।

গোপীনাথ তখন অভিশপ্তা তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—রাধার শাপ মিথ্যে হবার নয়, কিন্তু তুমি মানবযোনি প্রাপ্ত হয়েও আমাকে লাভ করবে।

তারপরে এক কার্তিকী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর মায়ের নাম মাধবী।

যৌবনপ্রাপ্তির পরে তুলসী এক গভীর বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এলেন তপস্বিনীর সামনে। বললেন—আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। বল, তুমি কি বর চাও?

তুলসী উত্তর দিলেন—আমি গোলোকের গোপিনী, আমি কৃষ্ণ-

বিরহিনী। পূর্বজন্মে আমি একদিন গোপীনাথের সঙ্গে সঙ্গমকালে তৃপ্ত হবার আগেই মূর্ছিত হয়ে পড়ি। দুর্ভাগ্য আমার, তখুনি রাসেশ্বরী সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারই অভিশাপে আমি আজ মর্ত্যের মানবী। কিন্তু গোবিন্দ-সঙ্গম আমার আজও অসম্পূর্ণ, আমি এখনও কৃষ্ণপ্রেমে অতৃপ্ত। অথচ তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন—আমি তাঁকে লাভ করব। আপনি আমাকে বর দিন, আমি যেন নারায়ণকে পতিরূপে পাই। সেইসঙ্গে আপনি আমার রাধাভীতি মোচন করুন।

—তথাস্তু! ব্রহ্মা তুলসীকে বরদান করলেন। বললেন—তুমি রাধার মতো সুভগা হবে।

কিছুকাল পরে তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিয়ে হল। স্বর্গের রাণী হয়ে তিনি বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু গোবিন্দের চরণে যিনি তাঁর প্রাণ-মন সমর্পণ করেছেন, পার্থিব সুখ-সম্পদ তো তাঁর জন্য নয়।

স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে নিয়ে বিষ্ণুর সামনে হাজির হলেন। সব শুনে বিষ্ণু তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন—শঙ্খচূড়ের শাপমুক্ত হবার সময় সমাগত। তারপরে ভগবান মহাদেবের হাতে একটি শূল দিয়ে তাঁকে বললেন—আপনি এই শূলের সাহায্যে শঙ্খচূড়কে সংহার করুন।

—কিন্তু আপনার মঙ্গল-কবচ তার গলায় রয়েছে, সে যে অবধ্য! মৃদু হেসে নারায়ণ অভয় দিলেন—আমি যথাসময়ে সে কবচ নিয়ে নেব, আপনারা শঙ্খচূড়ের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে দিন।

তবু দেবতারা সেখান থেকে চলে গেলেন না। ভগবান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন। বাধ্য হয়ে ব্রহ্মাকে কথা বলতে হয়। তিনি বলেন—এদিকে যে মহাদেব আবার শঙ্খচূড়কে এক বিচিত্র বর দিয়ে বসে আছেন।

—জানি। অন্তর্যামী ভগবান আবার একটু হাসেন। বলেন —মহাদেব শঙ্খচূড়কে বর দিয়েছেন, তার স্ত্রী তুলসীর সতীত্বনাশ না হলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে না, এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাদেব মাথা নাড়েন।

ভগবান তখন দেবতাদের আবার অভয় দান করেন—সে ব্যবস্থাও

আমি করছি। আপনারা যুদ্ধযাত্রা করুন।

নারায়ণ তারপরে প্রথম ব্রাহ্মণের রূপ নিয়ে শঙ্খচূড়ের কাছে গিয়ে তাঁর মঙ্গল-কবচ নিয়ে এলেন। তারপরে শঙ্খচূড় যখন দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন তিনি তাঁর রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নাশ করলেন। মহাদেব শঙ্খচূড়কে বধ করতে সমর্থ হলেন।

যথাসময়ে তুলসীর কাছে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছল। তুলসী নারায়ণের ছলনা বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি তো এভাবে তাঁকে লাভ করতে চান নি। তাই অভিমানী সতী তাঁকে অভিশাপ দিলেন—হে লম্পট, এই কপটতার জন্য তুমি পাষাণে পরিণত হও। তারপরে পতিহারা রমণী তাঁর পতিহন্তার পায়ে পড়েই কাঁদতে থাকলেন।

ভগবান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমার কামনা পূর্ণ হোক্। তুমি দেহত্যাগ করে আমার কাছে লক্ষ্মীর মত প্রিয়া হবে। তোমার এই মরদেহ হোক্ গণ্ডকীর অমরধারা আর কেশগুচ্ছ অক্ষয় তুলসীগুল্ম। আমিও পরিণত হব নারায়ণ-শিলায়। তোমাকে ছাড়া কেউ কখনও আমার পুজা করতে পারবে না।

সেই থেকে তুলসী নারায়ণ-শিলার সঙ্গিনী হয়ে আছেন। আর এই বেট-দ্বারকার মাটিতেই সেদিন ভগবান ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আমরা আজ সেই পুণ্যতীর্থ দর্শন করে ধন্য হলাম।

॥ তেরো ॥

বেট-দ্বারকা পুণ্যতীর্থ। সুতরাং এখানে স্নান করলে পুণ্যার্জন হয়। সহযাত্রীরা অনেকেই সেই শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করতে ম্যানেজারের সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেলেন। আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি বাজারে। ছোট বাজার। বাঁধানো পথের দু-পাশে সারি-সারি দোকান। মুদি মনোহারী দশকর্মা খেলনা ও খাবারের দোকান। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

বছর বারো বয়সের একটি ছেলে সামনে এসে বলে, "নমস্তে

মহারাজ !"

প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খনারায়ণ মন্দির দর্শন করতে যাবেন ?"

"দর্শন করেছি।" সহাস্যে বলি

"কোথায় ?" ছেলেটি প্রশ্ন করে।

আমি ইশারায় ওপরের মন্দির দেখিয়ে দিই।

এবারে সে একটু হাসে। বলে, "ও তো রণছোড়জীর মন্দির—দ্বারকাধীশ মন্দির। শঙ্খনারায়ণের মন্দির এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে। সেখানে শঙ্খচূড় তালাও আছে। চলুন না, দেখিয়ে আনছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

মনে হচ্ছে ছেলেটি ঠিকই বলছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের গুজরাতী বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রী কে. ডি. জাসানি আমাকে একখানি বইয়ে শঙ্খনারায়ণ মন্দিরের ছবি দেখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এ মন্দিরের কোন মিল খুঁজে পাই নি। তাহলেও ম্যানেজারকে না বলে অচেনা জায়গায় একাকী এই অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। ম্যানেজার যে স্নানার্থীদের নিয়ে গিয়েছেন। কখন ফিরে আসবে জানি না। সে আসার পরে আর হয়তো সময় থাকবে না।

না, শঙ্খনারায়ণ দেখছি খুবই দয়াময়। বাণেশ্বর মন্দির থেকে নেমে আসছে বাজারে। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি কথাটা। সেও সমর্থন করে ছেলেটিকে। বলে, "যান না, ঘুরে আসুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন। আমি ম্যানেজার-বাবুকে বলে দেব।"

দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে চলি ছেলেটির সঙ্গে। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি তাকে, "তোমার নাম কি ?"

"যশবন্ত্।"

"কোন্ ক্লাসে পড় ?"

যশবন্ত্ নিরুত্তর। সে নীরবে হেঁটে চলেছে। মনে হচ্ছে একটু লজ্জা পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বলি, "তুমি বুঝি পড়াশুনা কর না ?"

মুখ তোলে যশবন্ত্। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, "বাড়িতে বাবার কাছে

পড়ি। স্কুলের মাইনে দিতে না পারায় নাম কেটে দিয়েছে। ক্লাস সিক্‌স-য়ে পড়তাম।"

"তোমার বাবা কি করেন?"

"রাজকোটের একটা কারখানায় কাজ করতেন। গতবছর ধর্মঘট হবার পরে চাকরি গেছে। অনেক চেষ্টা করেও আর চাকরি পাননি।"

"তোমরা ক' ভাই-বোন?"

"চার। দিদি, তারপরে আমি। আমার পরে দু-বোন।"

"দিদির বিয়ে হয়েছে?"

"না। সে আমার থেকে মোটে তিন বছরের বড়।"

"তোমাদের তো এখানেই বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"জায়গা-জমি আছে?"

"খুবই সামান্য। বছরে মাস তিনেকের খাবার হয়।"

"বাকি ন' মাস চলে কেমন করে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল। সম্ভবতঃ প্রশ্নটার উত্তর তার জানা থাকলেও বলার মতো নয়।

সেই একই কাহিনী—আসাম থেকে গুজরাত। দূরত্ব যতই হোক্, প্রাকৃতিক পার্থক্য যতই থাক্, সাধারণ মানুষের অবস্থা অপরিবর্তিত। অশিক্ষা আর অস্বাস্থ্য, কর্মাভাব আর উপবাস আজও ভারতের জনজীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

আর কোন প্রশ্ন করি না। নীরবে তার সঙ্গে হেঁটে চলি। আমি পুণ্যার্থী। পুণ্যতীর্থ শঙ্খনারায়ণের মন্দির দর্শন করতে চলেছি। বহুদূর থেকে অনেক টাকা খরচ করে আমি এই পুণ্যতীর্থে এসেছি। আমার কি এই সব সামান্য ব্যাপারে এত বিচলিত হওয়া সাজে? আমি তাই তীর্থের পথে এগিয়ে চলি।

ইতিমধ্যে বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। বাজারের পরে পথের ধারে বাড়ি-ঘর। একটু বাদে তাও শেষ হয়ে গেল। শুরু হল খেতখামার। সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে পথ।

বাঁধানো পথ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মেঠো পথ দিয়ে

চলেছি এগিয়ে—ধুলিময় সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ।

পথের ডান পাশে বেশ বড় একটি দিঘি। জল নেই। দিঘির গর্ভে একটি ইঁদারা। কয়েকটি মেয়ে কলসী মাথায় দিঘির ঘাট বেয়ে নামছে—ইঁদারায় জল আনতে যাচ্ছে।

দিঘির পারে জগন্নাথদেবের মন্দির—নতুন মন্দির। এর সঙ্গে বেট-দ্বারকার প্রাচীনত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তাহলেও দর্শন করি। দর্শন শেষে যশবন্তের সঙ্গে এগিয়ে চলি।

বেশিদূর এগোতে হয় না। একটা বাঁক ফিরেই সামনে সামান্য দূরে মন্দিরচূড়া দেখতে পাই। মন্দিরশীর্ষে পতাকা উড়ছে। যশবন্ত্ দু-হাত জড়ো করে নমস্কার করে। জানায়, "শঙ্খনারায়ণের মন্দির।"

প্রণাম করে এগিয়ে চলি। কয়েক পা হেঁটে মন্দির-তোরণের সামনে আসি। এ মন্দিরটিও পথের ডানদিকে। তোরণের গায়ে লেখা—'শঙ্খনারায়ণ মন্দির। বেট।'

আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। পাথর-বাঁধানো অঙ্গনের বাঁপাশে মন্দির। জাতীয় গ্রন্থাগারে দেখা ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে আসি। রুপোর পাতে মোড়া মন্দিরদ্বার। ওপরে লেখা—'শ্রীশঙ্খনারায়ণ। জয় কৃষ্ণ।'

যিনি শঙ্খনারায়ণ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু উভয়ের লীলা বিভিন্ন যুগের। সুতরাং শঙ্খনারায়ণ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিজয়বার্তা উৎকীর্ণ করবার কোন আপাত কারণ নেই। তাহলেও মন্দির কর্তৃপক্ষকে এর জন্য কোন দোষ দিতে পারছি না। কারণ কৃষ্ণ কেবল নারায়ণ নন, তিনি নর-নারায়ণ। তিনি শুধু মানুষরূপী ভগবান নন, ভগবানরূপী মানুষ। তিনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক, ভারতীয় জীবনধারার উৎস।

তাই শঙ্খোদ্ধার বেট-য়ের এই শঙ্খনারায়ণ মন্দিরে পূজারীরা কৃষ্ণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে স্থাপিত সুসজ্জিত সিংহাসনে সবুজ কাপড় পরানো দণ্ডায়মান কৃষ্ণমূর্তি। আমরা প্রণাম করি।

খুদে পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। অনতি-দূরে একটি ছোট বাড়ি দেখিয়ে যশবন্ত্ বলে, "ধর্মশালা। জয়শালমেরের মহারাজা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্মশালাটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।"

"১৫৯৫ ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"জী।"

তার মানে চারশ' বছর আগেও রাজস্থানের সঙ্গে বেট-দ্বারকার একটা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে যশবন্তকে কোন প্রশ্ন করা বৃথা। তাই নীরবে তার সঙ্গে পথ চলতে থাকি।

আমরা মন্দিরের পেছনে আসি। চারিদিকে বাঁধানো মাঝারি আকারের একটি দিঘি। জল প্রায় নেই বললেই চলে।

যশবন্ত্ জানায়, "এটাই শঙ্খচূড় তালাও। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দামাজী রাও গায়কোয়াড় এটি খনন করিয়ে দেন। শুনেছি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে এর সংস্কারসাধন করা হয়েছে।"

যশবন্তের সঙ্গে ফিরে আসি দ্বারকাধীশের মন্দিরে। এবারে বিদায় নিতে হবে ওর কাছ থেকে। জিজ্ঞেস করি, "কত দিতে হবে তোমাকে ?"

সে চুপ করে থাকে।

আবার জিজ্ঞেস করি, "যাঁদের এমন দর্শন করাতে নিয়ে যাও, তাঁরা কত করে দেন ?"

"যাঁর যা খুশি।" যশবন্ত্ কথা বলে এতক্ষণে, "কেউ পঞ্চাশ পয়সা দেন, আবার কেউ দু-তিন টাকাও দেন।"

পকেট থেকে তিনটি টাকা বের করে হাতে দিই। ওর মুখখানিতে হাসি ফোটে। সকৃতজ্ঞ স্বরে আমার কিশোর পথ-প্রদর্শক বলে, "আমি তাহলে এখন আসি ?"

"কোথায় যাবে ?"

"বাড়ি।"

"কেন ? এখনও তো যাত্রী আসার সময় শেষ হয় নি ?"

"এক কিলো আটা আর কয়েকটা আলু্ কিনে মাকে দিয়ে আবার ফিরে আসব। মানে ঘরে একদম আটা নেই কিনা। সকাল থেকে

খাওয়াও হয় নি কিছু।"

আর কিছু বলতে পারি না তাকে। সেও নীরবে নমস্কার করে আমাকে। তারপরে ধীর পদক্ষেপে নেমে যায় বাজারে, যেখানে শুরু সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, যেখানে আটা এবং আলু কিনতে পাওয়া যায়।

ম্যানেজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্খচূড় তালাও দেখে এলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"এবারে চলুন ফেরা যাক্।"

"ওঁরা সবাই কোথায় ?"

"ঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে।"

"চলুন তাহলে।" আমি ম্যানেজারের সঙ্গে পথ চলা শুরু করি।

ম্যানেজার বলে, "শঙ্খচূড় তালাও-য়ের চারপাশের পাঁচিলটা লক্ষ্য করেছেন ?"

"হ্যাঁ। ভারী সুন্দর !"

"শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে ওটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় পূর্তবিছার, মানে 'Engineering skill in art of massonary'-য়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।"

আমরা সেই সংকীর্ণ পথটি দিয়ে জেটির দিকে নেমে চলেছি। সহযাত্রীদের দেখতে পাচ্ছি সামনে। অনেকেই দোকানে-দোকানে কেনা-কাটায় ব্যস্ত। ম্যানেজার তাঁদের তাড়া লাগিয়ে এগিয়ে চলে। আমাকে বলে, "ব্রিটিশ অধিকারের আগে এই দ্বীপ বেশ কিছুকাল জলদস্যু ওয়াঘের সর্দারের অধীন ছিল। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশরা এই দ্বীপ আক্রমণ্ করে। সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে ওয়াঘেররা যে-সব কামান ব্যবহার করেছিলেন, তার একটি কিছুকাল আগে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেটি এখন এই দ্বীপের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে সমাদৃত।

"ব্রিটিশরা কিন্তু খুব সহজে এ দ্বীপ অধিকার করতে পারে নি।

Edward Tancuerav Willzume এবং Captain M'Cormac নামে তাদের দুজন সেনাধ্যক্ষ সেই অভিযানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখানে তাঁদের কবর রয়েছে।"

আমরা লঞ্চঘাটে পৌঁছুই। একটি কিশোর ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে, "আপনারা সবাই এসে গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। লঞ্চ কোথায়?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে।

"ওপারে।" ছেলেটি উত্তর দেয়।

ম্যানেজার বলে, "এপারে আসতে বলো।"

মাথা নাড়ে ছেলেটি। ভাবি নিশ্চয় ফোন কিংবা ওয়্যারলেস-য়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু না। ছেলেটি তাঁর কাঁধের থলি থেকে একখানি আরশি বের করে রোদে নাড়তে লাগল। নাড়াবার অবশ্য একটা বিশেষ ধরন আছে। প্রতিফলিত আলোকরশ্মিটা চারিদিকে ঘুরছে। রাতে বিমানবন্দরে কিংবা সাগরের বাতিঘরে যেমন আলোর নিশানা দেওয়া হয়, তেমনি আলোর নিশানা দিয়ে ওপারের লঞ্চকে এপারে ডাকা হচ্ছে। বিমানবন্দর কিংবা বাতিঘরে সেই নিশানার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে আর এখানে নি-খরচায় নিশানা হয়ে যাচ্ছে। চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

হাঁটতে হাঁটতে জেটির প্রান্তে এসে দাঁড়াই। কয়েকখানি নৌকো নোঙর করে আছে—পাল তোলা ডিঙ্গি নৌকো। মাঝি-মাল্লারা ক্রমাগত যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে। বোঝাতে চাইছে লঞ্চের চেয়ে নৌকো ভাল। দেখে-শুনে হাওয়া খেয়ে ধীরে-সুস্থে ওপারে পৌঁছন যায়। ভাড়াও কম—লঞ্চে তিরিশ পয়সা আর নৌকোয় বিশ। কিন্তু খুবই কম যাত্রী তাদের সে বক্তৃতায় বিমোহিত হচ্ছেন। এটি গতির যুগ, বেগের যুগ। এ যুগে সময় সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।

দু'খানি লঞ্চ পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে। দেখতে বেশ লাগছে। সামন্তবাবুর ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে। বিউটিও বেশ মজা পেয়েছে। আমার মনে পড়ছে মেয়েটার কথা—স্ত্রীর কথা। আজকের এই

সমুদ্রযাত্রা তার খুবই ভাল লাগত। জানি না সে এখন কেমন আছে! মেহসানা ছাড়ার পরে আর তার কোন খবর পাই নি। দ্বারকাধীশের কৃপায় যদি সে ভাল হয়ে যায়, তাহলে আমেদাবাদে ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে। পূর্ণিমা ও শঙ্করী তাকে নিয়ে অহীনের সঙ্গে আবু-রোড থেকে আমেদাবাদ চলে আসবে। আর ভগবান বিরূপ হলে, অর্থাৎ শ্রী সুস্থ না হয়ে উঠলে ওরা আবু-রোড থেকেই কলকাতায় ফিরে যাবে। পথে কোন গোলমাল না হলে আমরা পরশুদিন বিকেলেই আমেদাবাদ পৌঁছব। কৃষ্ণ কৃপা করলে সেখানে গিয়ে দেখা হবে শ্রীর সঙ্গে।

লঞ্চ দু'খানা এসে গিয়েছে। আনন্দের কথা আমাদের লঞ্চটাই আগে জেটিতে ভিড়েছে। স্বভাবতই আমার সহযাত্রীরা সবিশেষ উল্লসিত।

কিন্তু সে উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ শেষ সময়ে সহসা আবিষ্কৃত হল অমিয়বাবু এখনও ফেরেন নি। তাঁকে এই অচেনা জায়গায় একা ফেলে রেখে আমাদের চলে যাওয়া সমীচীন হবে না। সুতরাং লঞ্চে ওঠা হল না। আমাদের লঞ্চ অন্য যাত্রী নিয়ে ফিরে গেল ওখা। যাবার সময় সারেঙ আশ্বাস দিয়ে গেল—এখুনি ফিরে আসছি।

নিখোঁজ অমিয়বাবুর খোঁজ করার জন্য ম্যানেজার বাণেশ্বরকে মন্দিরে পাঠালো। আমরা গভীর আগ্রহে তাঁর পথ চেয়ে রয়েছি। রয়েছি অমিয়বাবুর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়।

কয়েকটি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে জেটির পাশে একবুক সাগরজলে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। মাঝে মাঝে ডুব দিচ্ছে। আবার একটু বাদেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। "ওরা কি খুঁজছে?"

কথাটা জিজ্ঞেস করি ম্যানেজারকে। সে উত্তর দেয়, "ওরা পয়সা কুড়োচ্ছে।"

"পয়সা!" বিস্মিত হই।

ম্যানেজার বলে, "হ্যাঁ। বেট-দ্বারকা পুণ্যতীর্থ। পুণ্যময় এখানকার মন্দির মাটি ও জল। তাই পুণ্যার্থীরা যাতায়াতের পথে সাগরে

পয়সা ছুঁড়ে দেন। ওরা সেই পয়সা খুঁজছে।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। আরেক তীর্থের বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে এক শীতের সকালে একদল মানুষকে এমনি পয়সা খুঁজতে দেখেছি। এবং সেটি তাদের প্রায় প্রাত্যহিক প্রভাত-কর্ম। যেদিন কিছু কুড়িয়ে পায়, সেদিন চারটি ভাত জোটে। যেদিন পায় না, সেদিন হাসিমুখে উপবাসের দুঃসহ জ্বালা সহ্য করে। সে তীর্থের নাম গঙ্গাসাগর—ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ১২৮ কিলোমিটার।*

গঙ্গাসাগর ও বেট-দ্বারকা দুটিই দ্বীপতীর্থ। দুয়ের মাঝে দূরত্ব অনেক—একটি পূর্ব-ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত, আরেকটি পশ্চিম-ভারতের উত্তরপ্রান্ত। কিন্তু উভয়ের মাঝে কি আশ্চর্য ঐক্য! একেই বোধহয় ইংরেজিতে বলে—'Unity in diversity.' কবির ভাষায়—

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।'

মুহূর্তে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তাই ঠাকুরমাদের বলি, "আপনারা সাগরে পয়সা দিয়েছেন?"

"না তো!" বড়-ঠাকুরমা সবিশেষ বিস্মিতা।

"এখানে কি পয়সা ফ্যালতে হয় নাকি?" ছোট-ঠাকুরমা প্রশ্ন করেন।

আমি কিছু বলতে পারার আগেই ম্যানেজার উত্তর দেয়, "ওমা! তাও জানেন না। সাগর-দেবতা বরুণকে দান না দিলে যে কখনও সাগরতীর্থ দর্শনের পুণ্য হয় না। দিন দিন, যার কাছে যা খুচরো পয়সা আছে—সব জলে ফেলে দিন।"

আর যায় কোথায়? রীতিমত পয়সা-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর জলে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়েগুলোর মাঝে শুরু হল হুল্লোড়। প্রথম বর্ষার জল পেয়ে চাতকও এমন আনন্দিত হয় না। এই আনন্দযজ্ঞের অনেকখানি কৃতিত্ব ম্যানেজারের। অযাচিত সহযোগিতার জন্য মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানাই।

---

* লেখকের 'গঙ্গাসাগর' দ্রষ্টব্য।

লঞ্চ ফিরে এলো, কিন্তু ফিরে এলো না বাণেশ্বর।

না, আসছে। ঐ তো বাণেশ্বর আসছে। কিন্তু সে একা কেন? অমিয়বাবু? অমিয়বাবু কোথায়? আর বাণেশ্বরই বা অমন তাড়াতাড়ি আসছে কেন? অমিয়বাবুর কোন বিপদ! কোন দুর্ঘটনা!

"পাওয়া গেল না ম্যানেজারবাবু!" বাণেশ্বর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে।

"বাজারটা দেখেছিস?"

"হ্যাঁ। মন্দির ঘাট বাজার সবই দেখেছি।"

ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? কাউকে কিছু বলেই বা গেলেন না কেন? অচেনা জায়গা।

"শঙ্খচূড় তালাও পর্যন্ত তো যাস নি?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে।

"না।" বাণেশ্বর উত্তর দেয়।

"কিন্তু অমিয়বাবু সেখানে যান নি।" আমি মাঝখান থেকে বলে উঠি।

"হ্যাঁ। আপনি তো গিয়েছিলেন সেখানে। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয় নি, তখন তিনি যান নি সেখানে। যাবার পথ ঐ একটাই।

ম্যানেজার খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পড়বারই কথা। একটা জল-জ্যান্ত মানুষ স্রেফ্ উবে গেল! এর সবখানি অপযশ তার। কলকাতায় ফিরে সে কোম্পানীকে কি কৈফিয়ত দেবে আর অমিয়বাবুর আত্মীয়-স্বজনদেরই বা কি বলবে?

তাই সে আমাদের বলে, "আপনারা বাণেশ্বরের সঙ্গে চলে যান এই লঞ্চে করে। আমি একটু খোঁজ-খবর করে আসি ভদ্রলোকের।"

এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করে উপায় নেই। অতএব আমরা লঞ্চে উঠি, পাঁচুবাবু ফিরে চলে দ্বারকাধীশের মন্দিরে। মনে মনে বলি, "ঠাকুর! তুমি অমিয়বাবুকে ফিরিয়ে দাও।"

পুণ্যতীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পুণ্যার্থীর কি আর বেশিক্ষণ সহযাত্রীর কথা মনে থাকে? ঘুরে-ফিরে তীর্থের দেবতার কথাই মনে পড়ে তাঁদের। আর মায়া-মমতার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে যে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

তিনি যে দুঃখে অক্ষুব্ধ, সুখে স্পৃহাশূন্য, রাগ অনুরাগ ও ভয়মুক্ত। তিনি স্নেহশূন্য ও দ্বেষশূন্য।

সুতরাং লঞ্চ ছাড়ার পরে সহযাত্রীরা সরকারদার কাছে তাঁর কথাই শুনতে চান। বলেন, "গতকাল আমরা রুক্মিণী-মন্দিরে বসে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণের কাহিনী শুনেছি, আজ আপনি একটু জাম্ববতী ও সত্যভামার কথা বলুন।"

সরকারদা আপত্তি করেন না। বলেন, "ভাগবত থেকে বলব?"

"বলুন।" সহযাত্রীরা অনুমতি দেন।

সরকারদা শুরু করেন, "আপনারা জানেন, ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার একশ' আট পত্নী। তাঁদের প্রত্যেকের দশটি করে সন্তান। সন্তানদের মধ্যে আঠারজন মহারথী। রুক্মিণীর প্রথম পুত্র প্রদ্যুম্ন পিতৃতুল্য গুণশালী। তাঁর ছেলে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্রনাভ। মুষল-পর্বের পরে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন।

"পত্নীদের মধ্যে রুক্মিণীর পরেই জাম্ববতী ও সত্যভামার স্থান। তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ উপাখ্যানই বোধহয় আপনারা আজ শুনতে চাইছেন?"

"হ। ঠিকই কইছেন দাদা।" ছোট-ঠাকুরমা সোচ্চার স্বরে বলে ওঠেন, "আমরা তাই শোনাতে চাই।"

"বেশ, বলছি।"

"কয়েন।"

সরকারদা বলতে শুরু করেন, "এখন যে কাহিনীটি আমি আপনাদের বলব, সেটি ভাগবতকার দশম স্কন্ধের ছাপান্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—সে যুগে সত্রাজিৎ নামে একজন সূর্যভক্ত রাজা ছিলেন। সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে একদিন তাঁকে একটি স্যমন্তক মণি দান করলেন।

"মণিটি প্রতিদিন অষ্টাভার সুবর্ণ প্রসব করত। যেখানে ঐ মণি পূজিত হত, সেখানে দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু এবং কোন দৈহিক বা মানসিক অমঙ্গল থাকতে পারত না।

'সত্রাজিৎ একদিন সেই উজ্জ্বল মণি গলায় বেঁধে দ্বারকায় এলেন।

দ্বারকাবাসীরা ভাবলেন—স্বয়ং সূর্যদেব মাটিতে নেমে এসেছেন। সত্রাজিৎ ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে মণিটিকে নিজের বাড়িতে স্থাপন করলেন।

"কৃষ্ণ সেই মণি দেখতে এসে সত্রাজিৎকে বললেন—এটি আপনি আমাকে দিন, আমি দাদু উগ্রসেনকে উপহার দেব। সত্রাজিৎ সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

"কিছুদিন পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন স্যমন্তক গলায় বেঁধে মৃগয়ায় গেলেন। একটি সিংহ তাঁকে হত্যা করে মণিটি নিয়ে নিল। ভালুকরাজ জাম্ববান সেই সিংহটিকে মেরে স্যমন্তক দখল করলেন। তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে মণিটি দিয়ে দিলেন। সে স্যমন্তককে খেলনা বানালো।

"প্রসেন না ফিরে আসায় সত্রাজিৎ রটিয়ে দিলেন—মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাইকে হত্যা করেছেন। মিথ্যে কলঙ্ক দূর করার জন্য কৃষ্ণ বনে গেলেন। তিনি প্রসেন ও সিংহের মৃতদেহ দেখতে পেলেন। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে কৃষ্ণ জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা গুহাব বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

"জাম্ববানের শিশুপুত্রের হাতে মণিটি দেখতে পেলেন কৃষ্ণ। তিনি তার হাত থেকে স্যমন্তক নিতে গেলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন না। কারণ তখুনি জাম্ববান ছুটে এসে তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। দুজনে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

"জাম্ববান ছিলেন পরম কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে চিনতে পারেন নি। ফলে ভক্ত ও ভগবানের অবিরাম যুদ্ধ চলল। দিন-রাত যুদ্ধ চলতে থাকল।

"ওদিকে কৃষ্ণ ফিরে না আসায় সঙ্গীরা ভাবলেন—কৃষ্ণ আর নেই। তাঁরা বারোদিন অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকায় কান্নার রোল পড়ে গেল। উগ্রসেন বসুদেব দেবকী বলরাম ও রুক্মিণী প্রভৃতি আপনজনেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

"এদিকে আঠাশ দিন অহোরাত্র অবিরাম যুদ্ধের পরে জাম্ববান শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। আর সেদিনই তিনি তাঁর প্রাণপুরুষকে চিনতে

পারলেন। সহসা যুদ্ধ থামিয়ে তিনি বলে উঠলেন—আপনি নিশ্চয়ই সেই পুরাণপুরুষ। আপনি আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন।

"ভক্ত ও ভগবানের পরিচয় হল। ভগবান পরমকৃপায় ভক্তকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন—সত্রাজিতের মিথ্যা কলঙ্ক দূর করার জন্য স্যমন্তকমণি নিতে আমি আপনার গুহায় এসেছি।

"জাম্ববান তাঁর যুবতী কন্যা জাম্ববতীকে আহ্বান করলেন। স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী জাম্ববতী সেখানে এসে তাঁর মনের মানুষকে দেখতে পেয়ে পুলকিতা হলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি লাজনম্র বদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"জাম্ববান বললেন—তোমার ভাইয়ের হাত থেকে ঐ মণিটি নিয়ে এসে প্রভুকে দাও।

"জাম্ববতী মণিটি এনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সামনে রেখে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে হাত ধরে টেনে তুললেন। কৃষ্ণের করস্পর্শে কুমারী জাম্ববতীর দেহ ও মনে একটা অনাস্বাদিত আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠল।

"জাম্ববান বললেন—প্রভু, মণির সঙ্গে করুণা করে আমার এই কন্যাটিকেও গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ আবার জাম্ববতীর একখানি হাত হাতে তুলে নিলেন। জাম্ব-ভবনে মঙ্গল-শাঁখ বেজে উঠল।

"মণিভূষিত কণ্ঠে জাম্ববতীর হাত ধরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। দ্বারকাবাসীরা চোখের জল মুছে পরমানন্দে তাঁদের বরণ করলেন। দেবকী বসুদেব বলরাম ও রুক্মিণী ছুটে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববতী বাবা মা দাদু ও দাদাকে প্রণাম করলেন। জাম্ববতী রুক্মিণীকে প্রণাম করতেই রুক্মিণী তাঁকে পরমস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"পরদিন কৃষ্ণ মণি নিয়ে এলেন সত্রাজিতের কাছে। সত্রাজিৎকে স্যমন্তক ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে প্রসেনের পরিণতির কথা জানালেন।

"অনুতপ্ত সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে বললেন—হে ক্ষমাসুন্দর! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। একদিন তুমি আমার কাছে স্যমন্তক চেয়েছিলে। সেদিন তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ

বুঝতে পারছি, আমি এই অমূল্য মণির উপযুক্ত নই। সেদিন তোমাকে মণিটি দিয়ে দিলে আমি ভাইকে হারাতাম না। আর আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাইব না। দয়া করে মণিটি তুমি ফিরিয়ে নাও আর সেই সঙ্গে কৃপা করে আমার কন্যা সত্যভামাকে গ্রহণ কর।

"সত্রাজিতের নির্দেশে কৃষ্ণপ্রাণা রূপবতী সত্যভামা ধীরপদক্ষেপে মদনমোহনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ তাঁর পাণিপীড়ন করে প্রসন্নচিত্তে সত্রাজিৎকে বললেন—আমি আপনার কুমারীকন্যাকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু স্যমন্তক আপনার কাছেই থাক্। আপনি নির্ভয়ে থাকুন, এ মণি থেকে আপনার আর কোন অমঙ্গল হবে না। বরং আপনার কাছে থাকলেই আমাদের সকলের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে।

"আর সত্যভামা? যৌবনের স্বপ্ন সফল হবার সুখে তিনি তখন পুলকিতা। বলা বাহুল্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বারকার নরনারী তাঁর আনন্দের অংশীদার হলেন।"

সরকারদা শেষ করার পরেই সবিস্ময়ে দেখি, আমরা প্রায় এপারে এসে গিয়েছি। সামনে ওখার জেটি। সারেঙ লঞ্চের গতি কমিয়ে দিলেন। খালাসীরা দড়ি হাতে উঠে দাঁড়ালো। লঞ্চ তীরে ভেড়াবার আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে দেখতে পায় বিউটি। সে আমার পাশে এসে বলে, "মামু, দেখুন তো জেটির ওপরে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?"

আরে! তাই তো। অমিয়বাবুর মতই যে মনে হচ্ছে। অনেকেরই লক্ষ্য পড়েছে তাঁর দিকে। না, ভুল হয় নি আমাদের। অমিয়বাবুই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাত নাড়ছেন। সহাস্যে ওখার মাটিতে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ি।

সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই তাঁর ওপরে রীতিমত ক্ষুব্ধ। হবারই কথা। তাঁর জন্য আমরা আগের লঞ্চে আসতে পারি নি। ম্যানেজার এখনও হন্যে হয়ে বেট-দ্বারকার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তিনি কিনা কাউকে কিছু না বলে এখানে এসে আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য জেটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! বিচিত্র মানুষ বটে!

জনৈক সহযাত্রী জেটিতে উঠে সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। বললেন, "আপনি আমাদের ফেলে চলে এলেন যে বড় ?"

গম্ভীর স্বরে অমিয়বাবু উত্তর দিলেন, "আমি তো চলে আসি নি।"

"তাহলে আপনি এখানে এলেন কেমন করে ?" সহযাত্রীরা এবারে রেগে গিয়েছেন।

শান্তকণ্ঠে অমিয়বাবু উত্তর দিলেন, "আপনাদের দেরি দেখে আমি একটা লঞ্চে উঠে বসলাম। লঞ্চটা আমাকে নিয়ে চলে এলো এখানে।"

। চোদ্দ ।

রেল-স্টেশনে এসে বুঝতে পারি যাঁরা বেট-দ্বারকায় পুণ্যস্নান করেছেন, তাঁরা সত্যই পুণ্যবান। কারণ স্টেশনের কোন কলে জল পড়ছে না। এখানে কলের-জল নেই কিন্তু জলের-কল আছে। আছে কয়েকটি বাঁধানো জলাধার। তার চারদিকে কল লাগানো। কিন্তু এখন কল টিপলে জল পড়ছে না। অর্থাৎ জলাধার জলশূন্য।

কর্তৃপক্ষ জানালেন—কয়লার অভাবে গতকাল থেকে জলের গাড়ি অচল হয়ে আছে। মিঠাপুর থেকে জল আনানো যায় নি। অতএব আজ আর স্নান করা যাবে না।

ভারী মুশকিলে পড়া গেল। বালিময় সাগরতীরে রেল-স্টেশন। প্রখর রোদ উঠেছে। খুবই গরম লাগছে। ম্যানেজার থাকলে যা-হোক্ একটা উপায় বাতলে দিত। কিন্তু সেও অমিয়বাবুর অবিমৃশ্যকারিতার শিকার হয়েছে। আমরা অবশ্য লঞ্চের সারেঙকে বলে দিয়েছি, ওপারে গিয়ে খবরটা দিয়ে দিতে। কিন্তু ম্যানেজার জেটিতে না এলে কাকে খবর দেবে ? এখন সে কোথায় অমিয়বাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে জানে ?

তাহলেও সাহাবাবু ও সরকারদার সঙ্গে বালতি মগ ও গামছা নিয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। খানিকটা দূরে অনেকটা উঁচুতে একটা ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। রেল-লাইন ধরে সারি বেঁধে সেইদিকে এগিয়ে চলি। তুষারাবৃত হিমালয়ে জলের জন্য বহুবার হাহাকার করেছি। আর আজ অন্তহীন মহাসাগরের তীরেও জলের জন্য

ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

পদচারণা বিফল হল না। জলের দর্শন পেলাম। দূর থেকে যে ট্যাঙ্কটি দেখা যাচ্ছিল, সেটি সত্যি সত্যি জলের ট্যাঙ্ক—রেলগাড়ির জল। কয়েকজন লোক একটা দাঁড়িয়ে-থাকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ছাদে উঠে ট্যাঙ্কগুলোতে জল বোঝাই করছে। এই ট্রেনটির সঙ্গেই সম্ভবত আমাদের গাড়ি জুড়ে দেওয়া হবে।

রেলের পোশাক পরিহিত জনৈক সর্দার ছড়ি হাতে জল-ভরার তদারকি করছে। সরকারদা সবিনয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, "এর কোন একটা কামরায় উঠে আমরা একটু স্নান করে নেবো?"

"নহী সাব্!" সর্দার সঙ্গে সঙ্গে সরকারদার আবেদন না-মঞ্জুর করে দেয়। বলে, "ওপরওয়ালার কড়া হুকুম কেউ যেন গাড়ির জল নষ্ট না করতে পারে।"

"আজ্ঞে আমরা নষ্ট করব না, স্নান করব।"

"ঐ একই কথা।"

"না।" সাহাবাবু বলেন, "আমরাও ট্রেনের প্যাসেঞ্জার, বিকেলে ভেরাভল রওনা হচ্ছি। তাছাড়া…" একবার থামেন সাহাবাবু। পকেট থেকে একখানি দু-টাকার নোট বের করে লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে আবার বলেন, "আমাদের একটু স্নান করতে দিন, আমরা বেশি জল নষ্ট করব না।"

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মতই নেফা থেকে ওখা পর্যন্ত সর্বদা সর্বত্র ঘুষের সমান কদর। সুতরাং লোকটি সযত্নে নোটখানি পকেটে পুরে একটুকাল কি যেন চিন্তা করে। তারপরে বলে, "আপনারা ঐ ঘরটার ওপাশে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকুন। এখুনি আমাদের সুপারভাইজার আসবেন। তিনি চলে যাবার পরে, আমি আপনাদের ডাকব। তখন যত ইচ্ছে স্নান করে নেবেন।"

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে সর্দারের নির্দেশ পালন করি।

সর্দারের দয়ায় আশ মিটিয়ে স্নান করে অক্ষত দেহে গাড়িতে ফিরে আসি। আর এসে দেখি, ম্যানেজারও ফিরে এসেছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ম্যানেজার যে আমাদের গার্জেন। এবং

গার্জেনের মতই সে আমাদের নির্দেশ দেয়, "সবার খাওয়া হয়ে গেল প্রায়। যান যান, তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন।"

খাবার পরে যাঁদের দিবানিদ্রার অভ্যেস, তাঁরা যথারীতি শুয়ে পড়লেন। আর আমরা যথারীতি সরকারদার খোপে এসে ভিড় জমালাম। আগেই ঠিক হয়েছিল, আজ দুপুরে খাবার পরে আবার কৃষ্ণকথার আসর বসবে।

সরকারদা শুরু করেন, "গতকাল দুপুরে দ্বারকা রেল-স্টেশনে বসে আমি আপনাদের কাছে কৃষ্ণের কৌরবসভা ত্যাগের কথা বলেছি।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলতে থাকেন, "হস্তিনাপুর থেকে কৃষ্ণ ফিরে এলেন উপপ্লব্য নগরে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর নিষ্ফল দৌত্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বললেন—মহারাজ, আমি কৌরবসভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুযায়ী আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কিছু করার নেই। দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে আপনাদের পাঁচখানি গ্রামও দেবে না। যুদ্ধ অনিবার্য। কৌরবরা আত্মবিনাশে বদ্ধপরিকর।

"পাণ্ডবরা যুদ্ধসজ্জা শুরু করে দিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শ মতো যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে ও ঋষিগণের অনুগ্রহে উৎপন্ন, যিনি ধনু খড়্গ ও কবচ ধারণ করে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে এসেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব-সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। অর্জুন হলেন সেনাপতি-পতি আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন পার্থসারথি।

"দ্রৌপদী সপত্নী দাস-দাসী ও শিশু-সন্তানদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরে রইলেন। পাণ্ডববাহিনী কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। পবিত্র হিরণ্বতী নদীর তীরে পরিখা খনন করিয়ে কৃষ্ণ সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। শত শত শিল্পী এবং চিকিৎসক তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। প্রতি শিবিরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মধু ঘি ধুনা জল ঘাস তুষ ও অঙ্গার মজুত করা হল।"

"কৃষ্ণ চলে যাবার পরে কৌরবরাও যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেললেন। শুক্রাচার্য-তুল্য যুদ্ধনিপুণ ধার্মিক ভীষ্মদেবকে দুর্যোধন

সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। ভীষ্ম বললেন—আমার কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবরাও তেমনি। তাহলেও আমি তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করব। আমি পাণ্ডুপুত্রদের হত্যা করতে পারব না, বরং তাদের হাতেই মৃত্যুবরণ করব। তবে তার আগে প্রতিদিন পাণ্ডবদের দশ হাজার করে সৈন্য ধ্বংস করব।

"কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—ভীষ্মদেবকে সেনাপতি করে ভালই করেছো। কিন্তু তিনি জীবিত থাকতে আমি অস্ত্রধারণ করব না। তাঁর দেহরক্ষার পরে আমি তোমার হয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

"তারপরে ভীষ্মের সঙ্গে কৌরবরাও কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যুদ্ধের নিয়মবন্ধন স্থির হল। সাব্যস্ত হল— যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষে পুনরায় প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। রথীর সঙ্গে রথী, গজারোহীর সঙ্গে গজারোহী, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিক যুদ্ধ করবেন। স্তুতিপাঠক সূত ভারবাহক অস্ত্রবাহক ও ভেরীবাদক প্রভৃতিকে প্রহার করা হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কাউকে হত্যা করা চলবে না।

"উভয়পক্ষের ব্যূহরচনার পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—দুই সেনাদলের মাঝখানে রথ নিয়ে চলো, আমি একবার দেখব, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?

"পার্থসারথি পার্থের অনুরোধ রাখলেন। অর্জুন দেখলেন দু-পক্ষেই গুরুজন আত্মীয় এবং সুহৃদবর্গ রয়েছেন। অর্জুনের মুখ শুকিয়ে গেল, শরীর কাঁপতে থাকল। তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ল। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন—না, না! আমি যুদ্ধজয় চাই না। যাদের জন্য মানুষ রাজ্য চায় সুখ চায় শান্তি চায়, সেই স্বজনদের বধ করে রাজ্য পেয়ে কি লাভ হবে আমার? তার চেয়ে দুর্যোধনদের হাতে মারা যাওয়াও ভাল। তিনি ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে রথের ওপরে বসে পড়লেন।..."

"দাদা কি গীতার গপ্প কইতে আছেন?"

ছোট-ঠাকুরমার আকস্মিক প্রশ্নে থামতে হয় সরকারদাকে। ইতিমধ্যে কখন যেন তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে এসেছেন

এখানে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকথা শুনছিলেন।

সরকারদা বলেন, "হ্যাঁ ঠাকুরমা, আমি শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথাই বলছি এখন।" থামলেন সরকারদা। একবার সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনারা সবাই জানেন কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে অপারগ অর্জুনকে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করা এবং বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের মনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দান করেছিলেন, তাই আমাদের কাছে 'গীতা' নামে পরিচিত।

"গীতা জগতের যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসংসারে সবাই আমরা অর্জুনের মতো কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করতে পারছি না, প্রতিনিয়ত বিষাদগ্রস্ত হচ্ছি। গীতার উপদেশ আমাদেরও অর্জুনের মতই আনন্দময় করে তুলতে পারে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে সংসারীদের জন্যই তাঁর এ উপদেশ দান করেছেন।"

"এখানে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতটি সংক্ষেপে বলে নেবেন নাকি?" সরকারদা থামতেই আমি জিজ্ঞেস করি।

সরকারদা বলেন, "বেশ তো, আপনিই বলুন না সাহিত্যসম্রাট কি বলেছেন।"

আপত্তি না করে বলতে থাকি, "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রবন্ধে বলেছেন, 'দুর্যোধনাদি অন্যায়পূর্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্তব্য?...

'আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও আমরা পাণ্ডবদিকের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়াম দি সাইলেন্ট্ এবং ভারতবর্ষে প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধ-প্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম।...

'মহাভারতে দেখি যে, অর্জুন ইতিপূর্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের

মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

'মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্মের পথ কোন্‌টা, তাহা অর্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম. যুদ্ধ না করাই অধর্ম।

'বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ সময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপ-কথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সারমর্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।...

'কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন. তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্যে যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য।

'এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না।..."

"তাহলে গীতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কি?" মাঝখান থেকে অমিয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

"তিনি তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন।" আমি উত্তর দিই।

'বেশ, বলুন !" অমিয়বাবু অনুমতি দান করেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন", আমি বলতে থাকি, 'গীতায় ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

'যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।···

'যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না।···

'সংস্কৃত সকল গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব ?······

'এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না।"···

একবার থেমে সরকারদার দিকে তাকিয়ে বলি, "এবারে আপনি গীতার কথা বলুন।"

সবাই সরকারদার দিকে তাকাল। তিনি বলতে শুরু করেন, "আপনারা জানেন, ঋষি অরবিন্দ বলেছেন—'গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক।' পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান ভাষায় গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

"সম্রাট শাহজাহানের ছেলে দারা শিকো সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসী ভাষায় গীতার অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। গীতার সর্বোচ্চ

সত্যলাভের সুগম পথ প্রদর্শিত হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পরম-পুরুষ ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা। গীতা ইহলোক ও পরলোকের রহস্য উদঘাটন করেছে।'

"১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম ইংরেজীতে গীতার অনুবাদ মুদ্রিত হয়। কয়েক বছর পরেই রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মান মনীষী উইলিয়াম ভন্ হাম্‌বোল্‌ট বলেছেন—'গীতার মতো সুললিত সুসত্য দার্শনিক পদ্যগ্রন্থ হয়তো পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় নেই।' অ্যাল্‌ডাশ হাক্সলি বলেছেন—'ভাগবদ্‌গীতা ধর্মশাস্ত্র ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করেছে।' জে. ডাব্‌লু. হাওয়ার নামে জনৈক জার্মান ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতের মতে—'গীতা অক্ষয় মূল্যের ধর্মগ্রন্থ।' বালগঙ্গাধর তিলক লিখেছেন—'গীতার মতো অপূর্ব গ্রন্থ শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।' জনৈক ফরাসী ধর্মসাধক বারো বছর ধরে কেবল গীতাপাঠ করেছিলেন। তিনি বলতেন—'গীতাকে ধর্মজীবনের চিরসঙ্গী করলে, আর কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার দরকার হয় না।' বাংলার ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে লিখেছেন—'গীতাতত্ত্বই ভারতীয় ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিণতি ও সূক্ষ্ম নির্যাস।"

সরকারদা থামতেই উমাদি প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, কবে এই অমূল্য গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে?"

"এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ প্রথমতঃ, আমাদের পূর্বপুরুষরা ইতিহাসের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, সেকালের কবি বা শাস্ত্রকারগণ তাঁদের রচনায় নিজেদের নাম প্রকাশ করতেন না। কাজেই গীতাকারের নামও অজ্ঞাত এবং অনিশ্চিত। আমরা ভগবদ্‌গীতাকে মহাভারতের অংশরূপেই পেয়েছি। এবং জেনেছি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা। চতুর্বেদের বিভাগকর্তাও ব্যাসদেব। মহাভারতের অপর নাম ভারত-সংহিতা বা পঞ্চমবেদ।

"এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, 'ব্যাস' সেকালের একটি উপাধি, কোন বংশ নয়। কাজেই মহর্ষি পরাশরের পুত্র এবং শুকদেব গোস্বামীর পিতা ব্যাসদেব একাই যে বেদ বিভাগ করেছেন এবং

মহাভারত ও পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, সেকথা বলা যায় না। তাছাড়া একজন মানুষের পক্ষে এই সুবিশাল সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবও নয়। আমার ধারণা ব্যাস উপাধির অধিকারী বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন যুগে এই সব গ্রন্থ প্রণয়ন করে তাঁদের আদিগুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসের নামে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। সে যুগে তো বটেই, পরবর্তী যুগেও এমন ঘটনার নজির আছে। যেমন কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী'। কহ্লন রচনা শুরু করেছিলেন মাত্র, কিন্তু রাজতরঙ্গিনী শেষ করেছেন তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্য। অথচ কবি কহ্লনই রাজতরঙ্গিনীর রচয়িতা বলে পরিচিত।"

সরকারদা থামতেই উমাদি মনে করিয়ে দেন, "আমার কিন্তু প্রশ্ন ছিল, গীতা কবে রচিত হয়েছে?"

"আমি আগেই বলেছি, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। গীতাকে মহাভারতের অংশ বলে ধরে নিলে আমরা মহাভারতের রচনাকালকেই গীতার রচনাকাল বলে ধরে নিতে পারি। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রাটসাহেবের মতে মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে রচিত। ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব বলেছেন—মহাভারতের আদিম আকৃতি অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রন্থিত। বুহ্‌লার ও কিরষ্টে সাহেবও এই মত সমর্থন করেছেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহাভারত বর্তমান আকার পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল-মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে প্রণীত।

"ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন—গীতা বুদ্ধদেবের আগে রচিত। তিলক সেনার্ট রাধাকৃষ্ণন এবং বুহ্‌লার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ডাঃ দাশ-গুপ্তের এই মত সমর্থন করেছেন। বুহ্‌লার সাহেব বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভাগবত-ধর্মের উৎপত্তি। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর বলেছেন—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে গীতা রচিত হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত গার্বের মতে গীতা মূলতঃ একখানি সাংখ্য-যোগগ্রন্থ। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যখন কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন হন, তখুনি গীতার সৃষ্টি। কিন্তু তারপরে বৈদান্তিক পণ্ডিতরা গীতাকে বর্জন করেন।

"ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক হপ্‌কিন্স বলেছেন—গীতা সম্ভবত প্রথমে একখানা অসাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌ ছিল। পরে বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিণত হয়। অবশেষে সেটি কৃষ্ণভাবাত্মক হয়ে বর্তমান গীতায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফারকুহার বলেছেন—গীতা একটি প্রাচীন পদ্য উপনিষদ্‌ এবং শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের পরে প্রণীত। খ্রীষ্টীয় যুগে কোন কবি কৃষ্ণবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বর্তমান রূপ দান করেছেন।..."

"আরে! আপনারা মহাভারতের মইধ্যে ভূতের ক্যাচ্‌ক্যাচি লাগাইলেন ক্যান? কৃষ্ণকথা না কইয়া কি সব ছাই-ভস্ম কইতে আছেন!" ছোট-ঠাকুরমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্বভাবতই সরকারদা সবিনয়ে বললেন, "সত্যি ঠাকুরমা, আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আপনি বসুন, আমি গীতার কথা বলছি।"

"হ। কয়েন।" ঠাকুরমা উমাদির পাশে বসে পড়েন।

সরকারদা বলতে আরম্ভ করেন, "আমি আগেই বলেছি, শ্রীমদ্ভগবদগীতা শুধু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, আমাদের জীবনে আজও অপরিহার্য। বিশ্ব-সংসারে আমরা প্রায় সবাই অর্জুনের মতো। কর্তব্য স্থির করতে পারছি না, সর্বদা বিষাদগ্রস্ত হচ্ছি। গীতার বাণী আমাদেরও কর্তব্য-সচেতন ও আনন্দময় করে তুলতে পারে।"

একবার থামেন সরকারদা। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি বলেন, "কিন্তু আজকের এই আসরে আমার পক্ষে গীতার সমস্ত বাণী নিবেদন করা সম্ভব নয়। আমি শুধু সংক্ষেপে সারমর্ম আলোচনা করছি।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সরকারদা বলতে থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বললেন—এই সঙ্কটের সময় তুমি এমন মোহগ্রস্ত হলে কেন? আশ্চর্য! যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছো আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছো। পণ্ডিতরা কখনও মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না।

"—আমি তুমি ও এইসব রাজারা যেমন এর আগেও ছিলাম, তেমনি এখনও আছি, আবার এর পরেও থাকব। কাজেই মৃত্যুটা কিছুই নয়, কেবল রঙ্গালয়ের পট-পরিবর্তন মাত্র। দেহধারী আত্মার যেমন একই শরীর শৈশব যৌবন ও বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়, তেমনি আত্মার এক শরীর থেকে অপর শরীর গ্রহণও একটি রূপান্তর মাত্র। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা তাই দেহের প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই বিশ্ব-সংসার ব্যাপ্ত, তিনি অবিনাশী। কেউ সেই অব্যয়কে বিনাশ করতে পারে না। তিনি একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন, কখনও মারা যান না। তিনি পুনর্জন্মহীন, তিনি নিত্য অক্ষয় ও অনাদি। কাজেই শরীর হত হলেই, আত্মা হত হন না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি দেহী বা আত্মা পুরানো শরীর ছেড়ে অন্য নতুন শরীরে যান।"

থামতে হয় সরকারদাকে। সহসা সুর করে দাদা শুরু করেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃশাশ্বতোহয়ংপুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

দাদা থামলেন। সরকারদা আবার আরম্ভ করলেন, "তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে বলছেন—আত্মা অস্ত্রে ছিন্ন হন না। অগ্নিতে দগ্ধ, জলে সিক্ত কিংবা বায়ুতে শুষ্ক হন না। ইনি চোখের অগোচর, মনের অবিষয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। জন্ম হলে যেমন মৃত্যু, তেমনি মৃত্যুর পরেও জন্ম নিশ্চিত। জীবাত্মা সর্বদা সকলের শরীরে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন। অতএব কোনো প্রাণীর জন্য শোক করা ঠিক নয়।

"—তাছাড়া তুমি যদি ধর্মের কথা ভাবো, তাহলে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। কারণ এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধে যোগদানের চেয়ে বড় কর্তব্য আর কিছু নেই। তুমি যদি এই যুদ্ধ না কর, তাহলে ধর্ম ও কীর্তি ভ্রষ্ট হয়ে মহাপাপী হবে। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে তুমি

স্বর্গবাসী হবে। জয়লাভ করলে মর্ত্য লাভ করবে। কাজেই সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয়কে সমান ভেবে নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

"বিষাদনাশক সাংখ্যযোগের পরে পার্থসারথি পার্থের কাছে কর্মযোগের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—ধর্মের সামান্য কর্মও মানুষকে মহাভয় থেকে মুক্ত করে। তুমি তো জানো, বেদ ত্রিগুণাত্মক এবং পার্থিব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তুমি ত্রিগুণকে অতিক্রম কর। রাগ ও বিদ্বেষের অতীত, সঞ্চয় ও রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥'

"—কেবল কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও নয়। কর্মের ফল যেমন কামনা করবে না, তেমনি নিষ্কর্মাও হ'য়ো না। ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান ভেবে কাজ করে যাও। সমত্বকেই যোগ বলা হয়।

"—যিনি সব কামনা ত্যাগ করতে পারেন, যাঁর আত্মা আত্মাতেই তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি দুঃখে অক্ষুব্ধ, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং রাগ অনুরাগ ও ভয় মুক্ত। তিনি স্নেহশূন্য দ্বেষশূন্য, সর্ব ইন্দ্রিয় তাঁর বশীভূত। ফলে তিনি চিরসুখী। তাঁর কোন বিষয় চিন্তা নেই। কারণ বিষয় চিন্তা থেকে আসে আসক্তি, আসক্তি থেকে অভিলাষ, অভিলাষ থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা না করতে পারলে শান্তি আসে না। শান্তি না থাকলে কেউ সুখী হতে পারে না।

"—অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি আসক্তি ত্যাগ করে বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্মের অনুষ্ঠান কর। আসক্তি ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ হয়।

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥'

"—পার্থ, ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই, সুতরাং আমার কোন কর্তব্যও নেই। অথচ আমি কর্মে নিযুক্ত রয়েছি।

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥'

" —সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে দোষযুক্ত নিজধর্ম শ্রেষ্ঠতর। স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

"—তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় দমন কর, তারপরে কামকে বিনাশ কর। অবশেষে মনকে সংশয়রহিত-বুদ্ধি দিয়ে স্থির করে কাম-রূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।"

একবার থামলেন সরকারদা। বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। কিচেনে পেয়ালা-পিরিচের ঠুং-ঠাং শব্দ হচ্ছে। বৈকালী চায়ের সময় সমাগত। কিন্তু আজ আমরা চায়ের নেশায় আকুল হয়ে উঠি নি, বরং কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছি।

সরকারদা আবার বলতে থাকেন, "এবারে আমরা ভীষ্ম-পর্বের আঠাশ অধ্যায়, তার মানে গীতার চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করব। আপনারা জানেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলি মহাভারতে ভীষ্ম-পর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায়। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল যথাক্রমে—অর্জুন-বিষাদযোগ, বিষাদনাশক সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ, বিভূতি-যোগ, বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ, গুণত্রয়-বিভাগযোগ, পুরুষোত্তমযোগ, দেবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ ও মোক্ষযোগ।

"কাজেই বুঝতে পারছেন এই আসরে বিস্তৃতভাবে গীতার আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি খুবই সংক্ষেপে আপনাদের কাছে গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি। এবারে আমি আপনাদের কাছে জ্ঞানযোগের কথা বলছি। আগেই বলেছি এটি গীতার চতুর্থ অধ্যায়।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—আমি আদিত্যকে এই অব্যয়যোগের কথা বলেছিলাম। তারপরে আদিত্য মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। কালক্রমে মানুষ এই যোগ-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তাই আমি আজ তোমার কাছে আবার এই যোগরহস্য বর্ণনা করছি।

"বিস্মিত অর্জুন বললেন—কিন্তু আদিত্য যে তোমার অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছেন।

"কৃষ্ণ তখন সহাস্যে বললেন—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

"—আমি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছি, তুমিও অনেকবার জন্মেছো। কিন্তু তোমার কিছুই মনে নেই, আমার সবই মনে আছে। আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর। আমি সর্বভূতের ঈশ্বর। তবু অমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজের মায়াবলে জন্মগ্রহণ করি। হে ভারত! যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখুনি আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। আমি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

"কৃষ্ণ এর পরেও অর্জুনকে আরও বহু উপদেশ দান করলেন। অবশেষে অর্জুনের অনুরোধে তিনি তাঁকে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন।

"বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত অর্জুন করজোড়ে বললেন—হে দেব, আমি তোমার দেহে বিভিন্ন প্রাণীদের ঋষিদের ও দেবতাদের দেখতে পাচ্ছি! দেখছি তোমার অনন্তরূপ! কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য ও আদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও দুর্যোধনরা এবং আমাদের পক্ষের প্রধান যোদ্ধারাও তোমার ভয়ানক মুখবিবরে প্রবেশ করছে। জ্বলন্ত বদনে তুমি তাদের গ্রাস করছো! বল, তুমি কে? তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! তুমি প্রসন্ন

হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না। আমি তোমার আদিস্বরূপ জানতে চাই।

"ভগবান উত্তর দিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এই কুরুক্ষেত্রে যে যোদ্ধারা সমবেত হয়েছে, আমি তাদের মেরে রেখেছি। তুমি না মারলেও তারা মরবে। তাই তোমাকে বলছি, তুমি নিমিত্ত-মাত্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর। শত্রু বধ করে সমৃদ্ধ রাজ্যলাভ কর।

"অর্জুন বললেন—হে সর্ব, তোমাকে সহস্র প্রণাম! তোমার মহিমা না জেনে, তোমাকে এতকাল যাদব-কৃষ্ণ ও সখা বলে ভেবে এসেছি। তোমার সঙ্গে খেলা করেছি খেয়েছি ও শুয়েছি। তোমার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।* তুমি প্রসন্ন হও। পূর্বরূপ ধারণ কর।

"কৃষ্ণ তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করলেন। তার পরেও তিনি অর্জুনকে আরও বহু উপদেশ দান করেন। অবশেষে মোক্ষযোগ প্রসঙ্গে বললেন—

'সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥'

"—উত্তম-অধম যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক না কেন, পরা-ভক্তির সঙ্গে পরমভাবকে হৃদয়ে রেখে আমার আশ্রয়ে এলে, আমার কৃপায় অনাদি-পদ লাভ করবে।

"কৃষ্ণ বললেন—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

"—আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভক্ত এবং উপাসক হও। আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার পরম প্রিয়। তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই শরণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।

"অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমি ধর্মজ্ঞান লাভ করেছি। আমার সব সন্দেহের নিরসন হয়েছে। আমি তোমার আদেশ পালন করব।"

শেষ হল সরকারদার কৃষ্ণকথা, শেষ হল আমার দ্বারকা-দর্শন। ভক্তিহীন অবৈষ্ণব হয়েও আমি দর্শন করতে পেরেছি রণছোড়জীকে—বিশ্ব-ইতিহাসের মহত্তম মহামানবের মনোহর মূর্তিকে।

কৃষ্ণ করুণাময়। আমি তাঁর কাছে শ্রী পূর্ণিমা ও শঙ্করীর জন্য করুণা প্রার্থনা করেছি। বলেছি ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি শ্রীকে ভাল করে দাও। 'পুণ্যতীর্থ-প্রভাস' পরিক্রমার পরে আমেদাবাদে পৌঁছে আমি যেন হারিয়ে-যাওয়া শঙ্করী ও তার সঙ্গিনীদের খুঁজে পাই।

কৃষ্ণ মঙ্গলময়। আমি তাঁর কাছে আমার মানসীর মঙ্গল কামনা করেছি। বলেছি—ঠাকুর, তুমি তাকে শান্তি দাও। সে যেন তোমার মহাজীবনের মাঝে তার বঞ্চিত-জীবনের আশ্রয় খুঁজে পায়।

আর আমার জন্য? না, নিজের জন্য তোমার কাছে আমার তো কিছুই চাইবার নেই ঠাকুর! হে অন্তর্যামী, তুমি যে না চাইতেই আমাকে সব দিয়েছো। তাই তো সেদিন 'মধু-বৃন্দাবনে'-র মহাবনে মানসীর পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমি যে কামনা করেছিলাম, আজ তা পূর্ণ হল। আমি দ্বারকা দর্শন করতে পারলাম। আজ আমি তৃপ্ত, আমি ধন্য। আমার হৃদয় ও মন তোমার কৃপাধন্য। তীর্থের দেবতা কৃপা না করলে কি কেউ কখনও তীর্থ দর্শন করতে পারে?

জানি না জীবনে আর কোনদিন দ্বারকা আসতে পারব কিনা? না পারলেও ক্ষতি নেই। আমি যে সারাজীবন ধরে এই দ্বারকা-দর্শনের স্মৃতিচারণ করতে পারব। যখন যেখানেই থাকি, চোখ বুজলেই দেখতে পাব তোমাকে—আমার মনের মানুষ রণছোড়-জীকে।...দ্বারকা যে এখন আমার 'মন-দ্বারকায়' রূপান্তরিত।

॥ জয়তু দ্বারকাধীশ ॥

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রধান দর্শনীয় স্থান

দ্বারকা ঃ

গোমতী-সাগর সঙ্গম—এখানে স্নান ও তর্পণ সেরে মন্দির দর্শনে যেতে হয়।

দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর মন্দির—গোমতীর উত্তরতীরে ষাট স্তম্ভযুক্ত গ্র্যানিট ও বেলেপাথরের সুদৃশ্য মন্দির। প্রায় ২৪০০ বছর আগে তৈরি মন্দিরের স্থানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত বর্তমান মন্দির। ১৭০ ফুট উঁচু সাততলা মন্দির। মূল-মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৯০ ফুট ও প্রস্থে ২০ ফুট। এই মন্দিরকে জগৎ-মন্দিরও বলে।

সারদাপীঠ—দ্বারকাধীশ মন্দিরের পাশেই আদিগুরু শঙ্করাচার্য [ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দী) প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারধামের অন্যতম। প্রথম অধ্যক্ষ মদন মিশ্র। বর্তমান শঙ্করাচার্য ৭৭তম অধ্যক্ষ।

রুক্মিণীদেবীর মন্দির—সমুদ্রতীরে অবস্থিত সুদৃশ্য মন্দির। দ্বারকার দ্বিতীয় দর্শন। এটিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দির।

ভদ্রকালী-মায়ের মন্দির—রুক্মিণী-মন্দির থেকে মাইলখানেক দূরে পাথরের দেবীর ওপরে ত্রিনয়নী ভদ্রকালীর মুখমণ্ডল।

সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির—ভদ্রকালীর মন্দির থেকে মাইলখানেক

দূরে সুবিশাল বটের ছায়ায় সুন্দর মন্দির। গর্ভ-মন্দিরের মেঝেতে লুক্কায়িত শিবলিঙ্গ, পাশে পেতলের নাগরাজ।

গান্ধীঘাট—সিদ্ধেশ্বর মহাদেব মন্দিরের অনতিদূরে সাগরতীরে শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে নীল-মর্মরের গান্ধী-মূর্তি। পেছনেই বাঁধানো ঘাট, সেখানে গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

দ্বারকা বন্দর—জগৎ-মন্দির থেকে এক মাইল। শক্তিশালী বাতিঘরটি দেখবার মতো।

পঞ্চতীর্থ—গোমতীর অপর তীরে।

তোতাদ্রিমঠ—রেলস্টেশনের কাছে মন্দির ও ধর্মশালা।

গোবর্ধনজী, দামোদরজী, রণমুক্তেশ্বর মহাদেব, মহালক্ষ্মী, মীরাবাঈ এবং নরসিংহ মেহতার মন্দির।

বেট দ্বারকা :

দ্বারকাধীশ মন্দির—দেওয়াল-ঘেরা সুরক্ষিত মন্দির। গর্ভ-মন্দিরে কষ্টি-পাথরের দণ্ডায়মান রণছোড়জীর মূর্তি। নাট-মন্দিরে রাধারাণী রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী ও দেবকীর ছোট-ছোট মন্দির।

শঙ্খনারায়ণ মন্দির ও তালাও—দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে প্রায় মাইল-খানেক দূরে। শ্বেতপাথরের বেদীতে সুসজ্জিত কৃষ্ণমূর্তি। অনতিদূরে প্রাচীর পরিবেষ্টিত তালাও বা সরোবর।

ওয়াঘের জলদস্যুদের কামান—একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন।

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥'

এবারে শুরু হল ফেরার পালা।

না। ঘরছাড়া সহযাত্রীরা ঘরের পথে পা বাড়ান নি। আমারও বৃন্দাবনে মানসীর কাছে ফিরে যাবার সময় হয় নি সমাগত। বৃন্দাবন বহুদূর।

তাহলেও গুজরাত ভ্রমণে এসে উত্তর-পশ্চিমে এগোবার পালা হয়েছে শেষ। পশ্চিমভারতের উত্তরপ্রান্তিক-বন্দরে ওখা থেকে ট্রেন ছাড়ল এইমাত্র। 'মন-দ্বারকা' ও বেট-দ্বারকা দর্শনের পরে পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পথে যাত্রা হল শুরু। আমরা ফিরে চলেছি রাজকোট, পথে পড়বে দ্বারকা।

আবু-রোড থেকে দ্বারকা আসার সময়ে আমরা রাজকোট হয়েই এসেছি। এবারে সেই রাজকোট থেকেই ভেরাভলের ট্রেন ধরতে হবে। প্রভাস ও সোমনাথ বন্দরনগরী-ভেরাভলের উপকণ্ঠে অবস্থিত। তাই ভেরাভলগামী প্রধান ট্রেনটির নাম সোমনাথ-মেল।

হাওড়া থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বারোদিন আগে। 'কুণ্ডু স্পেশাল' এই রেল-ভ্রমণের আয়োজন করেছেন। আমরা প্রথমে দিল্লী গিয়েছি। সেখান থেকে মথুরা। সহযাত্রীরা কৃষ্ণলীলাস্থল ও পর্যটকতীর্থ-আগ্রা দর্শন করেছেন। আর আমি সেই দুটি দিন বাস করেছি বৃন্দাবনে—মানসীর বাসায়। তার পালিতা-কন্যা খুকুর বিয়ের পাকা কথাবার্তা বলেছি। মানসীর সঙ্গে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে গিয়েছি। পরদিন আমার আপত্তি উপেক্ষা করে খুকুকে নিয়ে মানসী এসেছে আগ্রাফোর্ট স্টেশনে, ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদন্ত করতে। সে ম্যানেজার ও সহযাত্রীদের আমার ক্ষীণস্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছে। তাঁরা মুচকি হেসেছেন কিন্তু মানসী তা দেখতে পায় নি। ভালোবাসার আবেগে সে তখন দৃষ্টিহীনা।

অবশেষে আগ্রাফোর্ট স্টেশনে আমার জীবন-নাট্যের সেই

অন্তিমদৃশ্যটি অভিনীত হয়েছে। খুকুর বিয়ের সময় বৃন্দাবন আসার প্রতিশ্রুতি পাবার পরে মানসী আঁচলে চোখ মুছছে। সে প্রণাম করেছে আমাকে। তারপরে খুকুর একখানি হাত ধরে ধীরপদক্ষেপে বেড়িয়ে গিয়েছে ষ্টেশন থেকে। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি তার অপসৃয়মানা অনিন্দ্য-সুন্দর দেহটির দিকে। একটু বাদেই অগণিত মানুষের মাঝে মানসী গিয়েছে হারিয়ে।

ফিরে এসেছি গাড়িতে। তখন আমাদেব গাড়ি বদল হয়েছে। কারণ আগ্রাফোর্ট থেকেই মিটারগেজ রেল। এখনও আমরা রয়েছি সেই ছোটগাড়িতে। হাওড়া থেকে যে ব্রডগেজ 'স্পেশাল ট্যুরিষ্ট কোচ'-য়ে যাত্রা করেছিলাম, সেটি আগ্রাফোর্ট থেকে খালি চলে গিয়েছে আমেদাবাদ। প্রভাস-পরিক্রমা পূর্ণ করে আমেদাবাদ যাবো। সেখানে এই ছোট গাড়ি ছেড়ে আবার আগের সেই বড় গাড়িতে সাওয়ার হব।

আমেদাবাদেই দেখা হবে ওদের সঙ্গে—শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর সঙ্গে। দেখা হবে কি? ওরা কি নির্দিষ্ট দিনটিতে পৌঁছতে পারবে সেখানে? ইতিমধ্যে কি শ্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে?

নিশ্চয়ই উঠবে। দ্বারকা ও বেট্ দ্বারকায় রণছোড়জীর কাছে কি বৃথাই বার বার তার রোগমুক্তি কামনা করলাম? না, না। তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।*

তাহলে শ্রী অমন অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন? কেন পূর্ণিমা ও শঙ্করী দ্বারকানাথকে দর্শন করতে পারল না? যেতে পারল না পুণ্যতীর্থ প্রভাসে? তারা তো কোন অন্যায় করে নি। বরং অসুস্থা মেয়েকে নিয়েই পূর্ণিমা গিয়েছিল সতীতীর্থ-সাবিত্রী পাহাড়ে।**

আজ সে-সব কথাই বার বার মনে পড়ছে আমার। সেদিন আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে মানসী চলে যাবার পরে ফিরে এসেছি গাড়িতে।

* লেখকের 'মন-দ্বারকা'য় দ্রষ্টব্য।

** লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

প্রথমেই এসেছি আমার সন্তপরিচিতা সাতবছরের সাথী শ্রীর কাছে। দু-দিন দেখি নি তাকে। তাই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আমার সেই ফুটফুটে নতুন ভাগনীটির একখানি হাত ধরতে গিয়েছি। সে ছিটকে সরে গিয়েছে দূরে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠেছে—তুমি ছোবে না আমাকে। আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

বুঝতে পেরেছি, দু-দিন মানসার বাসায় ছিলাম বলে মেয়ের অভিমান হয়েছে। অনেক কষ্টে সেদিন আমি ওর মানভঞ্জন করেছি। অবশেষে বলেছি—এ-যাত্রায় আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না মা ?

শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি আমি পালন করতে পারি নি। আর সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য আমিই দায়ী। আমারই জন্য পূর্ণিমা ও শঙ্করী আসতে পারল না দ্বারকায়, যেতে পারল না প্রভাসে।

আগ্রাফোর্ট থেকে আমরা এসেছি জয়পুর। সেখান থেকে আজমীর হয়ে পুষ্কর। আগের রাতেই শ্রীর একটু জ্বর হয়েছিল। পূর্ণিমা তাই মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইছিল না সাবিত্রী পাহাড়ে। পুষ্কর থেকে দূরত্ব প্রায় মাইল তিনেক। বালিময় ও চড়াই হাঁটাপথ। তার ওপরে প্রখর রোদ। তবু তাকে বললাম—তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। ওর গা-টা একটু গরম হয়েছে মাত্র। ছাতা মাথায় দিয়ে কুলির কাঁধে চড়ে শ্রী নির্বিঘ্নে ঘুরে আসবে সাবিত্রী পাহাড় থেকে।

পূর্ণিমা তবু প্রতিবাদ করেছে। বলেছে—আমার ভয় করছে ঘোষদা! মেয়ের কিছু হলে আমি বাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না। ওর বাবা, ঠাকুরমা ও কাকাদের অমতে আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

পূর্ণিমা কলকাতার এক বনেদী ব্যবসায়ী পরিবারের শিক্ষিতা ও সুশ্রী কুলবধূ। তার ব্যবসায়ী স্বামী আসতে পারেন নি। পূর্ণিমা তার দিদি জামাইবাবু মা ও বোনের সঙ্গে তীর্থদর্শনে এসেছে।

সেদিন আমি কিন্তু পূর্ণিমার প্রতিবাদ উপেক্ষা করেছি। বলেছি —তোমার মেয়ের কিছুই হবে না। সে দিব্যি ঘুরে আসবে।

তাছাড়া কুলির কোলে চড়ে ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে কীই-বা হতে পারে? পুষ্করে এসে সাবিত্রী পাহাড়ে যাবে না? শুনেছি, ভারী সুন্দর জায়গা। মেয়েদের যেতেই হয় সেই সতীতীর্থে।

আর আপত্তি করে নি পূর্ণিমা। আমি ওদের নিয়ে গিয়েছি সাবিত্রী-পাহাড়ে। বিকেলে ফিরে এসেছি আজমীর। রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন ছেড়েছে। শেষরাতে চিতোরগড় পৌঁছেছি।

সকালে দেখি শ্রীর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পর্যটকের যাত্রাপথ যে বড়ই নিষ্ঠুর। সেপথে কেউ কারও জন্য থেমে থাকতে পারে না। তাই শ্রী, পূর্ণিমা এবং তার মাকে গাড়িতে ফেলে রেখে নেহাৎ স্বার্থপরের মতো আমরা চিতোরদুর্গ দেখতে গিয়েছি।

সেদিন রাতে চিতোরগড় থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকালে মাওলী জংশনে নেমে পড়লাম সবাই। না, সবাই নয়। শ্রীর জ্বর না কমায় পূর্ণিমা যেতে পারল না আমাদের সঙ্গে। সে রুগ্না মেয়েকে নিয়ে গাড়িতেই রয়ে গেল। সোজা চলে গেল উদয়পুর। আর আমরা বাসে করে নাথদ্বার, হলদিঘাট ও একলিঙ্গজী দর্শন করে দুপুরের পরে উদয়পুর পৌঁছলাম।

উদয়পুর থেকে এলাম আবু-রোডে। শ্রীর অবস্থা তখনও অপরিবর্তিত। ফলে পূর্ণিমা ও তার ছোট বোন শঙ্করী আমাদের সঙ্গে যেতে পারল না মাউন্ট-আবু। দেখতে পারল না দিলওয়ারা মন্দির। অথচ শঙ্করীও পূর্ণিমার মতই বেড়াতে ভালবাসে। সবে সে কলেজের পাট সাঙ্গ করেছে। অবিবাহিতা এই সুশ্রী তরুণীটির দিলওয়ারা দর্শনের বড়ই সাধ ছিল।

রাত ন'টা নাগাদ সেদিন আমরা মাউন্ট-আবু-থেকে আবু-রোডে ফিরে এলাম। দুপুরবেলা গাড়িতে গরম লাগে বলে মাউন্ট-আবু রওনা হবার আগে আমরা ওদের ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে রেখে গিয়েছিলাম। তখুনি আলাপ হয়েছিল আবু-রোড স্টেশনের দুজন বাঙালী যুবক টিকেট-চেকার বিমল সরকার ও সরোজ সরকারের সঙ্গে। তাঁরা স্বেচ্ছায় শ্রীকে ডাক্তার দেখাবার ও তার রক্ত পরীক্ষা

করাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ওয়েটিং রুমে এসে দেখি শ্রী একইভাবে নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে। পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করলাম—ব্লাড রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু কি বললেন?

—বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তবে ওকে কয়েকদিন Complete bed-rest দিতে হবে। মানে ওকে নিয়ে এখন রেলে চড়া চলবে না।

—কিন্তু কাল সকালেই যে আমাদের গাড়ি ছাড়ছে এখান থেকে। আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছি।

পূর্ণিমা শান্তস্বরে জবাব দিয়েছে—আমি কাল আপনাদের সঙ্গে যাব না।

—যাবে না!

—না।

—কোথায় থাকবে?

—বিমলদা বলেছেন, কাল সকালে রিটায়ারিং রুমের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি বিমলবাবু ও সরোজবাবুর দিকে তাকিয়েছি। তাঁরা মাথা নেড়েছেন।

—কিন্তু তুই একটা অসুস্থা মেয়েকে নিয়ে এই অচেনা ও অজানা জায়গায় একা থাকবি কেমন করে? পূর্ণিমার জামাইবাবু গোরাচাঁদ সাহা প্রশ্ন করেছেন। গোরাচাঁদবাবু মধ্যবয়সী। ছোটখাটো শান্তশিষ্ট মানুষটি। কলকাতায় ভাল চাকরি করেন। ভদ্রলোক নিঃসন্তান। তাই ভাইঝি বিউটিকে মানুষ করছেন। কলেজ-ছাত্রী ষোড়শী বিউটিও সাহাবাবুর সঙ্গে এসেছে। সে মিসেস সাহা অর্থাৎ সেজদিকে 'মা' ডাকে কিন্তু সাহাবাবুকে বলে 'ছেলে'।

পূর্ণিমারাও সাহাবাবুর সঙ্গে এসেছে। সাহাবাবুর প্রশ্নের জবাব দিতে তার একটু দেরি হচ্ছে দেখেই বোধহয় শঙ্করী বলে ওঠে—আমিও ন'দির সঙ্গে এখানে থেকে যাব জামাইবাবু! আপনারা মাকে

নিয়ে যান।

বিস্মিত সাহাবাবু চট করে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু শঙ্করীর মা অর্থাৎ মাসিমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন—তার চেয়ে বরং তুই চলে যা ওদের সঙ্গে। আমি এখানে থাকছি।

—তা হয় না মা! কত আশা করে তুমি এ-যাত্রায় এসেছ। দ্বারকায় যাবে, রণছোড়জীকে দর্শন করবে। প্রভাসে তর্পণ সেরে, দর্শন করবে সোমনাথজীকে। তুমি জামাইবাবুদের সঙ্গে যাও, আমি ন'দির কাছে থাকছি। তুমি নিশ্চিন্তে তীর্থদর্শন কোরো মা! আমরা শ্রীকে সুস্থ করে তুলে ঠিক দিনটিতে আমেদাবাদে পৌঁছে যাব। একসঙ্গে ডাকোর গিয়ে রণছোড়জীর আদি-বিগ্রহ দর্শন করব।

শঙ্করী সবার ছোট। দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাগবাজারের বাড়িতে সেই এখন তার মায়ের অভিভাবিকা। সুতরাং মাসিমা আপত্তি করতে পারেন না।

কিন্তু আমি আপত্তি করি। বলি—মাসিমাকে নিয়ে তুমি গাড়িতে ফিরে যাও, আমি থাকব এখানে।

—তা হয় না ঘোষদা! ম্যানেজার পাঁচুবাবুর সঙ্গে প্রায় সবাই সমস্বরে বলে উঠেছে।

—কেন হবে না? আমি জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি—আমারই জন্য শ্রী আজ এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—এ আপনার ভুল ঘোষদা! শঙ্করী প্রতিবাদ করেছে। বলেছে—আপনিই তো বলেছেন, তীর্থের দেবতা না ডাক দিলে কেউ তীর্থে পৌঁছতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছি, তাই এবারে আমাদের দ্বারকা ও প্রভাস দর্শনের ছাড়পত্র মিলল না। অন্তর্যামী ও সর্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয় এবারে আমরা দ্বারকা ও প্রভাসে যাই। তবে তিনি নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে কৃপা করবেন। আমরা যেতে পারব দ্বারকা, দর্শন করতে পারব পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।

—পাপ-পুণ্যের কথা থাক্ শঙ্করী! তুমি তো জানো, আমি

শ্রীকে কথা দিয়েছি, এ-যাত্রায় আমি আর কখনো ওকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

কথাটা শেষ করেই আমি তাকিয়েছি শ্রীর দিকে। সে শুয়ে শুয়ে শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার ছোট্ট একখানি হাতের ইসারায় কাছে ডেকেছে আমাকে। তাড়াতাড়ি আমি তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডেকেছে—মামু!

—কি বলছ মা! আমি তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েছি।

সে বলেছে—মামু, তুমি দিদিমাকে নিয়ে দ্বারকা ও প্রভাসে যাও। দেখে এস রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। আমি তো তাঁদের কাছে যেতে পারছি না। তুমি না গেলে, কে ফিরে এসে আমাকে তাঁদের গল্প বলবে? আমেদাবাদে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

বিমলবাবু আশ্বাস দিয়েছেন—আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান দাদা! আমরা রয়েছি, ওনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, মেয়েকে সুস্থ করে তুলে তার মা ও মাসির সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ষোল তারিখে ঠিক আমাদাবাদে পাঠিয়ে দেব।

সে আশ্বাসে কেউ আশ্বস্ত হয়েছিল কিনা জানা নেই আমার, তবে আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি। পূর্ণিমা ও শঙ্করী দু'জনেই যুবতী। তার ওপরে ওদের সঙ্গে বেশ কিছু টাকা পয়সা থাকবে। দেখে ভাল লোক বলে মনে হলেও সদ্যপরিচিত বিমলবাবু ও সরোজবাবু সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না!

তাহলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই হেফাজতে ওদের রেখে পরদিন সকালে আমাদের আবু-রোড ছাড়তে হয়েছে। তখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কিন্তু শ্রীর ঘুম ভাঙে নি। পূর্ণিমা বসেছিল তার শিয়রে। তাই সে আমাদের ট্রেন ছাড়ার বাঁশি শুনেও বেরিয়ে আসতে পারে নি প্লাটফর্মে। শঙ্করী শুধু হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে আমাদের। আমরাও চলন্ত ট্রেনে বসে হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছি তার কাছ থেকে। তার সঙ্গে আমার ব্যবধান বেড়েছে।

ক্রমে ক্রমে সে অবস্থা হয়ে এসেছে। একটু বাদেই আবু-রোড গেছে মিলিয়ে, শঙ্করী গিয়েছে হারিয়ে।

আর শ্রী! সাতবছরের সেই সরল শিশুটি জানতেই পারে নি যে তার মামু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্বার্থপরের মতো পালিয়ে গেল রাজভূমি রাজস্থান থেকে।

তারপরে পাঁচটি দিন কেটে গিয়েছে। আমাদের দ্বারকা ও বেট-দ্বারকা দর্শন শেষ হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একবার ওদের খবর পেয়েছি। যেদিন ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল, সেদিন বিকেলেই মেহেসানা জংশন থেকে ফোনে খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিমলবাবু বলেছিলেন—শ্রী ভালর দিকে। চার পাঁচদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

আর কোন খবর পাই নি। গত তিনটি দিন দেব-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনায় আমরা ওদের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম। আজ সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত, উত্তেজনা প্রশমিত। আজ তাই ওখা থেকে গাড়ি ছাড়ার পরেই মনে পড়েছে ওদের কথা—শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর কথা।

"ঘোষদা!"

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি বাইরের দিক থেকে মুখ ঘোরাই। দেখি বৌদি দাঁড়িয়ে আছেন। বৌদি বলেন, "আপনার দাদা ডাকছেন আপনাকে।"

দাদা মানে আমার সহযাত্রী সরকারদা—মোহিতকুমার সরকার। ব্যবহারিক জীবনে একটি প্রেসের মালিক। কিন্তু সেটা শুধুই তাঁর ভরণ-পোষণের অবলম্বন মাত্র। তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন ভক্ত-বৈষ্ণব। কাঠিয়াবাবার শিষ্য। নিয়মিত তিলকসেবা করেন। বয়স চারের ঘরে। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। স্ত্রী শ্যামলী-বৌদিও স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী এবং ধর্মপরায়ণা।

মৃদু হেসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করি, "কেন? আবার কৃষ্ণকথার আসর বসছে নাকি?"

"হ্যাঁ। তাই তো আপনার ডাক পড়েছে।" তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। আবু রোড থেকে যাত্রা করার পর থেকেই সরকারদা আমাদের কাছে মহাভারতের কৃষ্ণকথা বলছেন।

পাশের খোপে এসে দেখি সবাই আমার জন্য বসে রয়েছেন। আমি আসতেই সরকারদা শুরু করলেন, "সহযাত্রীগণ, আজ দুপুরে ওখায় বসে আমি আপনাদের কাছে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তথা শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা সংক্ষেপে বলেছি। তারপরে মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় দিনে... .."

থামতে হল সরকারদাকে। ট্রেন থামল মিঠাপুরে। আর সেই সঙ্গে দ্বারকার পাণ্ডাজী উঠে এলেন গাড়িতে।

মিঠাপুর দ্বারকা এবং ওখার মধ্যবর্তী একটি বড় স্টেশন। দূরত্ব দ্বারকা থেকে উনিশ আর ওখা থেকে দশ কিলোমিটার। গতকালই পাণ্ডাজী বলেছিলেন—আজ তিনি এখানে দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে। দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। তাই পাণ্ডাজী ওখা যান নি। ওখা বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের করতলগত। তিনি সকালের ট্রেনে দ্বারকা থেকে এখানে এসে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

পাণ্ডাজীকে সানন্দ-স্বাগত জানাই। নির্বিঘ্নে আমাদের বেট-দ্বারকা দর্শন সুসম্পন্ন হয়েছে শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। বলেন, "দ্বারকাধীশ কৃপা করেছেন আপনাদের। নইলে বেটের পাণ্ডাগুলো হচ্ছে এক একটি কষাই।"

বিউটি কথাটা খেয়াল করে। বলে, "আপনি বেট বলছেন কেন? বেট-দ্বারকা বলুন।"

"না," পাণ্ডাজী প্রতিবাদ করেন, "ওটা বেট তার মানে দ্বীপ' দ্বারকা নয়। দ্বারকা তো দর্শন করেছো কাল। দ্বারকা একটাই।"

"কিন্তু ওঁরা যে বললেন, ওঁদের দ্বারকাই আসল দ্বারকা?"

"বলল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যেবাদী, চোর লম্পট। ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না।"

বিউটি মাথা নাড়ে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে, শত প্রতিবাদ করলেও পাণ্ডাজী তাঁর মত পালটাবেন না। নবদ্বীপ ও মায়াপুর, গোকুল ও গোকুল-মহাবনের মতই দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের এই বিরোধ মিটবে না কোনোকালে। পুরুষানুক্রমে এঁরা একে অপরের কুৎসা রটিয়ে যাবেন।

ট্রেন ছাড়ল মিঠাপুর থেকে। পাণ্ডাজী তাঁর থলি থেকে কার্ড বের করে আমাদের প্রত্যেককে একখানি করে দিলেন। বড় আকারের ভিজিটিং কার্ড। তাতে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় লেখা—'তীর্থভ্রমণ সফল করিতে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডা করুন। বাঙালীর একমাত্র পাণ্ডা, শ্রীমণিলাল জীবরাজ ভট্ট। নীলকণ্ঠ চক, দ্বারকা।'

কথায় কথায় পাণ্ডাজী বললেন, "আপনারা সকলেই পুণ্যাত্মা। সংসারে সামান্য সংখ্যক মানুষেরই দ্বারকা দর্শনের সৌভাগ্য হয়। আপনাদের মতো যে সব পুণ্যাত্মারা বাংলা থেকে দ্বারকায় আসেন, তাঁদের সেবা করাই আমার ধর্ম। বিনিময়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনারা ভালবেসে যা দান করেন, তা দিয়েই আমাকে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। আমার অন্য কোন আয় নেই। বাংলা ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের যজমান নেই। তাই আমি আজ আবার আপনাদের কাছে এসেছি। খুশি হয়ে আপনারা যে যা দেবেন, আমি তা-ই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।"

লোকটি সত্যই সেবাপরায়ণ। গতকাল দ্বারকায় সারাদিন ছায়ার মতো সঙ্গে রয়েছেন। সবার সব ফরমাশ হাসিমুখে পালন করেছেন। এঁকে সাহায্য করাই উচিত

কিন্তু কত দেব? মশলা ব্যবসায়ী প্রৌঢ় সামন্তবাবু যথারীতি

পঁচিশ টাকা দিয়েছেন। দুই ছেলে ও একজন কর্মচারীকে নিয়ে তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় এসেছেন।

আর বৃদ্ধ উকিলবাবু যথারীতি এক টাকা দিলেন। তিনি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থদর্শনে এসেছেন। কিন্তু কোন মন্দিরে ঢোকেন নি।

সে যা-ই হোক্। এখন আমরা মাঝের মানুষগুলো পাণ্ডাজীকে কত করে দিই?

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে কোন ফল হল না। সে বলল, "যা পাবেন, দিয়ে দিন।"

খুবই স্বাভাবিক। সে কোম্পানীর কর্মচারী। তার পরামর্শকে অনেকেই হয়তো নিরপেক্ষ বলে মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু আমরা যে খুশকিলে পড়ে গেলাম।

উমাদি মানে শ্রীমতী উমা মিত্র মুশকিল আসান করলেন। তিনি সভানেত্রীর মতো রুলিং দিলেন, "পাণ্ডাজী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং যাঁরা এক পরিবারে দু-জন কিংবা তার বেশী এসেছেন, তাঁরা অন্তত জনপ্রাত দু-টাকা করে দিন। আর যাঁরা একজন রয়েছেন, তাঁরা তিন টাকা থেকে পাঁচটাকা পর্যন্ত যে যা পারেন, তা-ই দিন।"

বিনা প্রতিবাদে রুলিং মেনে নিই। একখানি পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিই পাণ্ডাজীর হাতে।

দুই

সাতটা নাগাদ ট্রেন দ্বারকা পৌঁছল। এখনও সন্ধ্যে হতে কিছু দেরি রয়েছে। দ্বারকা শহর দেখা যাচ্ছে ছবির মতো। পাণ্ডাজীর সঙ্গে নেমে আসে প্লাটফর্মে। তাকিয়ে থাকি দ্বারকার দিকে।

স্টেশনটি শহরের শেষ প্রান্তে। গতকাল সকালে যখন এই প্লাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে থেমেছিল, তখন চারিদিক রণছোড়জীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

আর আজ? আমার সহযাত্রীরা সবাই শব্দহীন। আজ যে আর কারও দ্বারকা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই। তাই কেউ রণছোড়জীর জয়গান গাইছেন না। দ্বারকা আজ নেহাৎ পথের পাশে একটি অপ্রয়োজনীয় রেলস্টেশন। মিঠাপুর ও দ্বারকার মাঝে তফাৎ নেই কোন। তাহলে কি ভক্তিও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী?

কি জানি, আমি কেমন করে এ প্রশ্নের উত্তর দেব? আমি যে ভক্তিহীন-অবৈষ্ণব। আমি শুধু একবার মন দ্বারকার মাটিতে মাথা ঠেকাই, ঠিক গতকালের মতো। তারপরে তাকাই রণছোড়জী মন্দিরের দিকে।

জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ রণ ছেড়ে দিয়ে মথুরা থেকে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন বলে, দ্বারকায় তিনি রণছোড়জী রূপে বিরাজমান।

মন্দিরের চূড়াটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আমি আবার প্রণাম করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। রণছোড়জীর জয়গানে মন্দির মুখরিত হবে। সমবেত ভক্তবৃন্দের মন-প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের জীবন ধন্য হবে। মর্ত্যের মানুষ হয়েও তাঁরা সেই স্বর্গীয় পরিবেশে নরকের কথা বিস্মৃত হবেন।

ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও গতকাল এই সময়ে আমি ওখানে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ দ্বারকা এসেও যেতে পারছি না দ্বারকাধীশের মন্দিরে। জানি না আর কোনদিন যেতে পারব কি না?

না পারলেই বা ক্ষতি কি? আমি তো দর্শন করেছি তাঁকে। বিশ্ব-ইতিহাসের সেই মহত্তম মহামানবের মনোহর মূর্তিকে। আমি যে তাঁর কাছে শ্রী পূর্ণিমা ও শঙ্করীর জন্য মঙ্গলকামনা করেছি। মঙ্গল কামনা করেছি আমার মানসীর জন্য। তিনি নিশ্চয়ই আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

জীবনে যদি আর কোনদিন দ্বারকা না-ও আসা হয়, তাহলেও যে সারাজীবন ধরে আমি দ্বারকার স্মৃতিচারণ করতে সমর্থ হব। চোখ বুজলেই দেখতে পাব আমার মনের-মানুষ রণছোড়জীকে। আর দ্বারকাদর্শনের প্রয়োজন নেই। দ্বারকা আমার মন-দ্বারকায় পরিণত হয়েছে।

পাণ্ডাজী ও ম্যানেজার বোধকরি কোন কাজের কথা আলোচনা করছে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে আসি। নিজের জায়গায় এসে বসি।

কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি ছাড়ে। পাণ্ডাজী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানান। আমবা এগিয়ে চলি। আমি যে তীর্থযাত্রী। তীর্থের আকর্ষণে ঘব ছাড়লেও কোন তীর্থে চিবস্থায়ী হবাব অধিকার নেই আমার। পথের ধূলি অঙ্গে না মাখলে তীর্থযাত্রার ফল পাওয়া যায় না। আমি তাই একতীর্থ থেকে আরেক তীর্থের পথে এগিয়ে চলেছি। এ চলাব শেষ নেই।

কিন্তু নীববতাব শেষ আছে। গাড়ি দ্বারকা পৌঁছবার পর থেকে যে নীববতা সমস্ত গাড়িখানাকে গ্রাস করেছিল, সরকারদা তার অবসান ঘটালেন। সাহসা তিনি ঘোষণা করলেন, "চুপ-চাপ বসে না থেকে আসুন, আমরা কৃষ্ণকথা আলোচনা করি।"

সবাই সোচ্চাব স্ববে বলে উঠলেন, "সাধু প্রস্তাব।"

সবকারদা শুরু কবলেন, "সহযাত্রিগণ, আজ দুপুরে ওখায বসে আমি আপনাদেব কাছে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণেব উপদেশ তথা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা বলেছি। তারপরে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে আমবা উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাই যুদ্ধের তৃতীয় দিনে, কৃষ্ণ যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সুদর্শন চক্র হাতে ভীষ্মকে হত্যা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। একদিকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র তখন ভীষ্মের পরাক্রমের কাছে অবনত, অন্যদিকে অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের পলায়ন কৃষ্ণকে সেদিন ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই সাত্যকি যখন পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যদের ফিরিয়ে আনবার জন্য বৃথা চেষ্টা

করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—যারা চলে যেতে চাইছে, তাদের যেতে দাও। আজ আমিই ভীষ্ম ও দ্রোণসহ সমস্ত কৌরব পক্ষীয়দের বধ করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাব।

"তিনি সুদর্শন হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মত্তহস্তীর মতো ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন। কৌরবরা আর্তনাদ করে উঠলেন। ভীষ্ম কিন্তু আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করলেন না। তিনি হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—দেবেশ জগন্নিবাস চক্রপানি মাধব! এসো এসো, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য, লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে ফেলে দাও। তোমার হাতে মারা গেলে যে আমাব ইহকাল ও পরকাল ধন্য হবে।

"অর্জুন তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরলেন। সবিনয়ে বললেন—কেশব, তুমিই আমাদের গতি, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি শপথ করছি, প্রতিজ্ঞা পালন করব। তোমার নির্দেশ মতো কৌরবদের বধ করব।" থামলেন সরকারদা।

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন, তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ আর অস্ত্রধারণ করেন নি, কিন্তু ভীষ্মের পতন থেকে শুরু করে দুর্যোধনেব উরুভঙ্গ পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি পাণ্ডবদের পরামর্শ দিয়েছেন। পাণ্ডবরা শুধু তাঁর পরামর্শ মতো কাজ কবে গিয়েছেন। আর তারই ফলে বিজয়লক্ষ্মী কুরুক্ষেত্রে এসে পাণ্ডবদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন। অস্ত্রধারণ না করেও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সবশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তাঁর সাহায্য ছাড়া অর্জুন কিছুতেই ভগদত্ত, জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতিকে বধ করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ পাণ্ডবদের অশেষ উপকার সাধন করেছে।"

"যেমন?" সরকারদা থামতেই কল্পনাদি প্রশ্ন করেন। কল্পনাদি মানে শ্রীমতী কল্পনা রায়, মধ্যবয়সী ভক্তিমতী। দেখতে সুশ্রী, স্বভাবটি শান্ত। প্রতিদিন সকালে গীতাপাঠ না করে জলগ্রহণ করেন না।

তিনি একাই যাত্রায় এসেছেন, তবে আমার সহযাত্রিণী ঠাকুরমার তাঁর পরিচিতা।

সরকারদা কল্পনাদির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার আগেই ছোট-ঠাকুরমা বলে বসলেন, "আইজ্জ আপনার কি হইছে কয়েন তো দাদা?"

"কেন?" সরকারদা তাঁর অভিযোগের কারণ খুঁজে পান না।

"আইজ্জ আপনে ক্যাবলই সংক্ষেপ করতে আছেন।"

আমরা ঠাকুরমার কথা শুনে হেসে উঠি। পাশের খোপ থেকে দাদা হেঁকে উঠলেন, "কি হল? কৃষ্ণকথার মধ্যে এত হাসাহাসি কেন?"

দাদা মানে সত্তর বছরের প্রবীণযুবা শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত। বরিশালের মানুষ। এখন বাঘাযতীন কলোনীর বাসিন্দা। বছর দু'য়েক আগে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তারপরেই তীর্থদর্শনের নেশা পেয়ে বসেছে তাঁকে। হাওড়ায় গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই তিনি আমার দাদা হয়ে গিয়েছেন।

আমরা লজ্জা পেলাম।

লজ্জা পেলেন সরকারদাও। তিনি ঠাকুরমাকে বললেন, "সংক্ষেপ করছি কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা ভারতের আপামর মানুষের নখদর্পণে। আপনারা সবাই জানেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল আঠারো-দিন ধরে। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ দিনে অর্জুন যখন নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে হত্যা করেন। চতুর্দশ দিনে ভীম কৌরবদের একশ' ভাইয়ের আটানব্বই জনকে বধ করেন। পঞ্চদশ দিনে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে হত্যা করেন।' ঐ দিনই দ্রুপদরাজও নিহত হন। ষোড়শ দিনে ভীম দুঃশাসনের বুকের রক্তপান করেন। সপ্তদশ দিনে অর্জুন কর্ণকে বধ করেন। অষ্টাদশ দিনে শল্য নিহত হন এবং ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। সেদিন রাতেই অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলেকে হত্যা করেন। অর্জুন পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মাথার মণি ছিনিয়ে নেন। ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে উত্তরার গর্ভস্থ

সন্তানকে বধ করেন।

"এই সব কাহিনী এবং তাঁর প্রত্যেকটিতে কৃষ্ণের প্রভাবের কথা আপনাদের সবারই জানা রয়েছে। তা সত্বেও আপনারা যখন শুনতে চাইছেন, তখন সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা বলছি।"

"কয়েন," ঠাকুরমার কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ।

সয়কারদা শুরু করেন, "এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি বলব ভীষ্ম-পর্বের ১৮০ অধ্যায়ের কথা। এই অধ্যায়ে মহাভারতকার বলেছেন, যুদ্ধে ভীষ্মের পরাক্রম দেখে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন—ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত করছেন, অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নেই, আমার পক্ষে এখন বনবাসী হওয়াই ভাল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—অগ্নিসম ও ইন্দ্রসদৃশ ভাইরা থাকতে আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না। তাছাড়া আমিও তো রয়েছি। আপনার আদেশ পেলে আমি আজই ভীষ্মকে বধ করতে পারি। আপনাদের শত্রু আমার শত্রু, আপনাদের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। ধনঞ্জয় আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তার জন্য আমার শরীরের যে কোন জায়গা থেকে যেমন মাংস কেটে দিতে পারি, তেমনি সেও আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। পার্থ উপপ্লব্যনগরে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে গাঙ্গেয়কে বধ করবে। তাই আমি তাঁকে বধ করতে পারছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভীষ্ম ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই অর্জুন তাঁকে বধ করতে সমর্থ হবে। নিরুৎসাহ হবেন না। তার চেয়ে বরং চলুন, একবার কৌরব শিবির থেকে ঘুরে আসা যাক্।

—কৌরব শিবির! পঞ্চপাণ্ডব সবিস্ময়ে বলে উঠলেন।

"—হ্যাঁ। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উত্তর দিলেন—ইচ্ছামৃত্যু বরণ না করলে যে দেবব্রতের মৃত্যু হবে না। কাজেই চলুন, তাঁর কাছ থেকেই জেনে আসা যাক্, কিভাবে তাঁকে বধ করতে হবে। আপনি জিজ্ঞেস করলে, তিনি নিশ্চয়ই উপায়টি বলে দেবেন।

"আপনারা জানেন এই পরামর্শ মতো কাজ করেই অর্জুন

ভীষ্মদেবকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

আমরা ঘাড় নাড়ি। সবকারদা বলতে থাকেন, "তারপরে কুরুক্ষেত্রে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় দেখতে পাই দ্রোণপর্বের ২৯ অধ্যায়ে। যুদ্ধের দ্বাদশ দিবসে অর্জুন সুশর্মার ভাইদের নিহত করলেন। তখন প্রাগজ্যোতিষেশ্বর মহাবীর ভগদত্ত হাতির পিঠে চড়ে ছুটে এলেন অর্জুনের সামনে। তিনি তাঁকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। অর্জুনের শরাঘাতে ভগদত্তের হাতির বর্ম ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ক্রুদ্ধ ভগদত্ত তখন মন্ত্রপাঠের পরে অর্জুনের বুক লক্ষ্য করে বৈষ্ণব অঙ্কুশ-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গণলেন। তিনি জানতেন, ভগদত্তের সেই চরম আঘাত সহ্য করার সাধ্য নেই ধনঞ্জয়ের। তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে অর্জুনকে আড়াল করে দাঁড়ালেন, নিজের বুকে বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুর বুকে বেঁধে বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালায় রূপান্তরিত হল। পার্থসারথি পার্থের জীবনরক্ষা করলেন।"

সবকারদা থামতেই বিউটি বলে ওঠে, "তারপরে?"

"তারপরে চা।" ম্যানেজারের গলা শুনে বিস্মিত হই। তাকিয়ে দেখি চায়ের কেটলি হাতে স্বয়ং ম্যানেজার পাঁচুগোপাল দে। স্বাস্থ্যবান কর্মঠ ও বুদ্ধিমান যুবক।

কাপটা হাতে নিয়ে বলি, "এখন আবার চা?"

"হ্যাঁ। এ্যাডিশন্যাল টি, স্পেশালী মেড্।"

"ধন্যবাদ।"

চা পরিবেশনের পরে বিউটির দিকে তাকিয়ে সবকারদা আবার বলতে শুরু করেন, "তারপরে কৃষ্ণের কথা বলতে হলে উল্লেখ করতে হবে দ্রোণপর্বের ১৪২ অধ্যায়। যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের যে শুধু পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রতি নজর ছিল, তাই নয়। মিত্রপক্ষের সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ছিল তাঁর। ভূরিশ্রবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সাত্যকি সেদিন যখন প্রায় অস্ত্রশূন্য হয়ে পড়েছেন, ঠিক তখনিই শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বললেন —সাত্যকিকে সাহায্য কর। তিনি সাত্যকির দিকে রথ ছোটালেন।

তুই যদি কেশবকে ধনু দিয়ে নিজে সারথি হতি, তাহলে কেশব এতদিনে কর্ণকে বধ করত। তুই যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হতি কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতি, তাহলেই ভাল হত। তোর গাণ্ডীবকে ধিক, তোর বাণসমূহকে ধিক, তোর কপিধ্বজ রথকে ধিক। তুই যদি রাধেয়কে আক্রমণ করতে ভয় পাস, তাহলে আর কাউকে গাণ্ডীব দিয়ে দে না!

"যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি খড়্গ হাতে নিলেন। বললেন—আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে গাণ্ডীব দিয়ে দিতে বলবে, আমি তার শিরশ্ছেদ করব।"

"—ধিক, অর্জুন ধিক। কৃষ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন—তুমি ধর্মভীরু কিন্তু মূর্খ। যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠকে তুমি বধ করতে চাও! তুমি অবুঝ বালকের মতো প্রতিজ্ঞা করেছো আর এখন মূঢ়ের মতো তা পালন করতে চাইছো। সত্য বলাই ধর্মসঙ্গত, সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই। কিন্তু সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা, তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে মিথ্যা সত্যের মতো হিতকর, সেখানে মিথ্যা বলাই উচিত। তাছাড়া—

'বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥'

অর্থাৎ বিবাহকালে রতিসম্বন্ধে প্রাণসংশয়ে সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায় ও ব্রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে। এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।

"অনুতপ্ত অর্জুন বললেন—কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতা-পিতার মতো, তুমিই আমাদের পরম-গতি। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। কাজেই এমন বুদ্ধি দাও, যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় অথচ আমরা দুজনেই বেঁচে থাকতে পারি।

"কৃষ্ণ বললেন—কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুধিষ্ঠির ক্ষোভ এবং ক্রোধের বসে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। তিনি অবধ্য

অথচ তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। তিনি যাতে জীবিত থেকেও মৃত হতে পারেন, সেই উপায় অবলম্বন কর।

"অর্জুন বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কি উপায়ে।

"—যুধিষ্ঠির মাননীয়। মানীলোক যতকাল সম্মান পান, ততকালই জীবিত থাকেন। অপমানিত হলেই তাঁরা জীবন্মৃত হন। তুমিও যুধিষ্ঠিরকে একবার 'তুমি' বলে অপমান কর, তিনি জীবন্মৃত হোন। তারপরে তুমি তাঁর চরণবন্দনা কর। এইভাবে সত্যভঙ্গ ও ভ্রাতৃবধের পাপমুক্ত হয়ে তুমি হৃষ্টচিত্তে সূতপুত্রকে বধ কর।"

থামলেন সরকারদা। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, "তারপরে অর্জুন কি করে কর্ণকে বধ করলেন, তা আপনারা জানেন। এবং এও জানেন যে কৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হত না। আর কর্ণ বধই প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে।"

"কেন?" উমাদি বোধ হয় মন্তব্যটি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বললেন, "তাঁর পরেও তো শল্য ছিলেন। ছিলেন কর্ণের ছেলে চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেণ। ছিলেন অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও শকুনি। ছিলেন দুর্যোধন এবং তাঁর পুত্রগণ।"

"ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবরা একদিনেই তাঁদের প্রায় সবাইকে সাবাড় করেছিলেন। সূর্যপুত্র কর্ণের দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই কৌরব-পক্ষের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এবং তা সম্ভব হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্যই। কিন্তু তারপরেও কৃষ্ণের কাজ শেষ হয় নি। তাঁর নির্দেশে ভীম যুধিষ্ঠিরের ঊরুভঙ্গ করার পরেই নিরপেক্ষ বলরাম ছুটে এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রে। বার বার ভীমকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন—ধর্মযুদ্ধে নাভির নিচে গদাঘাত করা শাস্ত্রসঙ্গত নয়। তিনি লাঙ্গল উঁচু করে ভীমকে আক্রমণ করতে গেলেন।

"কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি দু'হাতে দাদাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি ও অবনতির কথা আছে। মিত্রদের, বন্ধুদের ও নিজের উন্নতি এবং শত্রু, তার মিত্র ও বন্ধুদের অবনতি। পাণ্ডবরা আপনার পিসতুতো ভাই। তারা আপনার মিত্র। তাদের অবনতি

আপনার কামা হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে প্রতিজ্ঞাপালন প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। আপনি তো জানেন, শকুনির কপট-দ্যূতক্রীড়ার পরে প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে চেয়েছিল, দুর্যোধন কাপড় তুলে দ্রৌপদীকে নিজের বাম উরু দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সতীসাধ্বী দ্রৌপদীকে তাঁর অনাবৃত কোলে এসে বসতে বলেছিলেন। মহাবীর বৃকোদর তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনের বুকের রক্তপান করবেন এবং গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ করবেন। ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বাধ্য হয়ে এই অশাস্ত্রীয় কাজ করেছেন।

"ধর্মপরায়ণ হলধর বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। ভীম বলরামের ক্রোধানল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। তারপরেও কৃষ্ণ আরেকবার ভীমকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।"

"কখন?" সবকারদা থামতেই বিউটি প্রশ্ন করে।

সবকারদা তাঁর ষোড়শী-শ্রোতার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "যুদ্ধজয়ের পরে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ যখন ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করতে এসেছিলেন।"

"কি হয়েছিল তখন?"

"যুধিষ্ঠির প্রণাম করার পরে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তারপরেই তিনি ভীমকে খুঁজতে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্ধরাজার দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। তিনি ভীমকে সরিয়ে দিয়ে দুর্যোধনের তৈরি করে রাখা ভীমের লৌহমূর্তিটি ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এগিয়ে দিলেন। অযুত হাতির মতো বলবান ধৃতরাষ্ট্র বুকে চেপে সেই লৌহমূর্তি চূর্ণ করে ফেললেন। কিন্তু তারপরেই পুত্রশোকাতুর পিতার জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি 'হা ভীম, হা ভীম' বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

"কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—মহারাজ, আপনি ভীমকে বধ করেন নি। তার লৌহমূর্তি চূর্ণ করেছেন। আপনি শান্ত হোন; ধর্মপথে চলুন। ভীমসেনকে মেরে ফেললেও আপনার পুত্ররা বেঁচে উঠবে না।

থামলেন সরকারদা। সঙ্গে সঙ্গে উমাদি কাশীদাসী মহাভারত থেকে আবৃত্তি আরম্ভ করে দিলেন—

'শুন কৃষ্ণ আজ শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবু নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ॥
মম বধূগণ যথা করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক, তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হৈল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার॥'

তিন

বাথরুম থেকে ফিরে এসে অবাক হই। বাণেশ্বর বেড-টি নিয়ে এসেছে। সবে সওয়া পাঁচটা। ছ'টার আগে তো বেড-টি আসে না।

বাণেশ্বর বলে, "ভোর সাড়ে চারটায় ওখা প্যাসেঞ্জার রাজকোট পৌঁছেছে। একটু বাদেই কীর্তি এক্সপ্রেস এখানে আসবে। তাই ম্যানেজারবাবু গাড়ি জুড়বার ব্যবস্থা করতে স্টেশন-মাস্টারের অফিসে চলে গিয়েছেন। যাবার সময় আমাদের ডেকে দিয়ে গেছেন।"

"তোমরা বুঝি ঘুম ভাঙতেই চায়ের জল চাপিয়ে দিলে?"

বাণেশ্বর মৃদু হাসে। আমি তার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করি, "কীর্তি এক্সপ্রেস তো পোরবন্দর যায়?"

"হ্যাঁ।"

"সে তাহলে আমাদের কতদূর নিয়ে যাবে?"

"শীতলসর জংশন পর্যন্ত। সেখান থেকে সোমনাথ মেল

আমাদের গাড়ি ভেরাভল নিয়ে যাবে।"

বাণেশ্বর পাশের খোপে চা দিতে চলে যায়। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমাদের গাড়ির কথা ভাবতে থাকি। আমাদের বর্তমান গাড়িটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 'টু-টায়ার কোচ্', দুটি 'লোয়ার' ও দুটি 'আপার বার্থ' নিয়ে এক একটি খোপ। লোয়ার বার্থ দুটির মাঝে একখানি 'স্টীল বেঞ্চ' বিছিয়ে কুণ্ডু কোম্পানী প্রতি খোপে পাঁচখানি করে বার্থের ব্যবস্থা করেছেন। এই রকম আটটি খোপ ও তিনটি বাথরুম নিয়ে আমাদের গাড়ি। সাতটি খোপে যাত্রীরা রয়েছেন আর একটি খোপকে রন্ধনশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

'সই, কি আর বলসি মোরে।
কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব
মরম কহিয়ে তোরে॥......'

দাদা বোধ হয় বেড-টি শেষ করেই চণ্ডীদাসের কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। আমি মন দিয়ে শুনি। দাদা আপন মনে গেয়ে চলেছেন—

'গুরু পরিজন করাইয়া গুণ
সে সব সহিতে পারি।
বন্ধুর বিচ্ছেদে জীবন না রহে
বুক বিদরিয়া মরি॥
শুনহ সজনি দিবস রজনি
তাকিয়ে সঘন সারা।
হিয়া চমকিত শরে জরজর
অনিবারে বহে ধারা॥
কুলবতী হঞা কুলের গরিমা
সকল হইল চুর।
নন্দের নন্দন করি নিরূপণ
সে করে এতেক দূর॥......' *

দাদা গান থামাতেই পাশের খোপ থেকে বিউটি বলে ওঠে, "ও

* চণ্ডীদাসের পদাবলী—বিমানবিহারী মজুমদার।

দাদু। কাল রাতে দেখি কত করে বললাম একটা গান গাইতে। তখন বললেন, গান জানি না। আর আজ গান গাইলেন যে বড়।"

দাদা মুখ টিপে হাসছেন। কথা বলছেন না। কীই বা বলবেন? কাল রাতে খাবার পরে গানের আসর বসেছিল। বিউটি ছিল প্রধান গায়িকা। সে বেশ ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আরও অনেকে গান গেয়েছে গতকাল। কিন্তু দাদা রাজী হন নি। আর আজ নিজের থেকেই গান গেয়ে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি রীতিমত বিপদে পড়েছেন।

দাদু নাতনীর কথা থাক্, নিজের কথা ভাবা যাক্। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে এখনও। এই অবসরে মানসীকে চিঠিখানা লিখে ফেললে হত। আবু রোড ছাড়ার পরে আর তাকে চিঠি লেখা হয় নি। সে খুবই চিন্তার মধ্যে আছে। সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে বারবার আমাকে বলেছে—প্রত্যেক জায়গা থেকে একখানি করে চিঠি দিও। চিঠি লেখার সময় না হলে, শুধু আমার নাম ঠিকানা লিখে একখানি করে পোস্টকার্ড ডাকে দিয়ে দিও, সেই সাদা পোস্টকার্ড পেয়েই বুঝব, তুমি ভাল আছো।

আচ্ছা, আমিও তো তার কোন চিঠি পেলাম না। সেদিন বৃন্দাবনে খুকুর বিয়ের ঠিক হয়ে যাবার পরে পাত্রের বাবা বলে গিয়েছিলেন, পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে তারিখটা তিনি জানিয়ে দেবেন মানসীকে। আর মানসী সেটা মাউন্ট আবু কিংবা দ্বারকার ঠিকানায় জানিয়ে দেবে আমাকে

খুকু মানসীর পালিতা কন্যা হলেও নিজের মেয়ের মতোই সে তার বিয়ে দিচ্ছে। বিয়েতে মানসীর দাদা-বৌদি আসবেন বৃন্দাবনে। আমাকেও নাকি উপস্থিত হতে হবে

তাহলে কি কোন কারণে খুকুর বিয়েটা ভেঙে গেল! খুকুকে সে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়েছে। তার বয়স অল্প। দেখতে-শুনতে মেয়েটা ভালই। দেনা-পাওনা নিয়েও কোন গোলমাল নেই। কেবল মানসী স্বামী পরিত্যক্তা এমন একটা সংবাদ পাত্রপক্ষের কানে যাওয়াতেই যা একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমার

পুরুষকেই দেখি নি। দেখি নি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও দেশবন্ধুকে। দেখি নি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ ও সর্দার প্যাটেল এবং আরও অনেককে। কিন্তু দেখেছি গান্ধীজী, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্রকে দেখেছি খুব ছোটবেলায় আমার জন্মভূমি বরিশালে। তখন আমি মাত্র চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তাহলেও তাঁকে বেশ মনে আছে আমার।

মনে আছে গান্ধীজীকেও। তাঁকে আমি প্রথম দেখেছি নোয়াখালিতে। সেই কুখ্যাত হিন্দু নিধনের পরে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলাম সেখানে। আমি তখন কলেজে পড়ি। কাজেই তাঁর কথা খুবই স্পষ্ট করে মনে পড়ছে আমার। মনে পড়ছে সোদপুরের তাঁর সেই দিনগুলোর কথা। কলকাতা থেকে কয়েকদিন তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছি সেখানে।

আর মনে পড়ছে সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা—উনিশ শ' আটচল্লিশের ত্রিশে জানুয়ারী। খবরটা সন্ধ্যের কিছু আগে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার পথে পথে। দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সারা দেশে একটা গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছিল। আর তখুনি রেডিও থেকে ভেসে এসেছিল জওহরলালের ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বর—'The light has gone out of the world. একশ' পাঁচ বছর আগে পোরবন্দরের বুকে জাতির যে দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল, ছাব্বিশ বছর আগে দিল্লীর বিড়লা ভবনে তাকে নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

না, নেবেনি। সে আলো নিভে যাবার নয়। কৃষ্ণ আর যীশুখৃষ্টের মতো, লেনিন আর আব্রাহাম লিঙ্কনের মতই মহাত্মা গান্ধীও বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর গুরুগৃহ রাজকোট। তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

"ও মামু। কি ভাবছেন বসে বসে?" বিউটির প্রশ্নে আমার চিন্তা থেমে যায়। বাস্তবে ফিরে আসি। আমি তার দিকে তাকাই।

বিউটি আবার বলে, "কাকু মহাভারতের গল্প বলছেন। তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে।"

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই। সরকারদার খোপে এসে বসি। সরকারদা বলতে শুরু করেন।

"গতকাল আমি আপনাদের স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত মহাভারতের কৃষ্ণকথা বলেছি। তারপরে মহাভারতে আরও সাতটি-পর্ব আছে—শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব। মৌষলপর্বে মহাভারতকার, কৃষ্ণ-বলরামের দেহত্যাগের কথা বলেছেন। অর্থাৎ শান্তিপর্ব থেকে মৌষলপর্বের সময়সীমা ছত্রিশ বছর।"

"তখন কৃষ্ণের বয়স কত ছিল?" সরকারদা থামতেই উমাদি প্রশ্ন করেন।

"আমি তো একদিন বলেছি যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল ১২৫ বছর।"

"সেটা তো শ্রীমদ্ভাগবদের মত"

"হ্যাঁ।" সরকারদা স্বীকার করেন।

উমাদি বলেন, "কিন্তু শম্ভু মহারাজের 'মধু বৃন্দাবনে' বইতে পড়েছি—শ্রীকৃষ্ণ তিরানব্বই বছর বয়সে মর্তলীলা সাঙ্গ করেছেন।"

ম্যানেজার আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। একমাত্র সে-ই আমার প্রকৃত পরিচয় টের পেয়েছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলি, "ওটা শম্ভু মহারাজের নিজস্ব মত নয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন মাত্র।" *

"আমরা কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনি কৃষ্ণকথা বলুন।" সত্যেনদা স্মরণ করিয়ে দেন।

সরকারদা শুরু করেন, "মৌষলপর্ব যদুবংশ ধ্বংসের উপাখ্যান। তার আগের চারটি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের কর্মলীলা খুব বেশি নয়। কারণ সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশসাধন এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিজয়ে তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। তাহলেও শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক ও আশ্রমবাসিকপর্বে যে কৃষ্ণকথা রয়েছে, আমি সংক্ষেপে তা আপনাদের বলছি। মৌষলপর্বের কথা পরে বলব।"

"বেশ, বলুন।"

---

* 'Krisna in History & Legend'.

মহাদেব আমাকে বরদান করলেন, তুমি যশস্বী পরমবলবান যোগসিদ্ধ লোকপ্রিয় বলশালী ও যুদ্ধজয়ী হবে। তুমি সর্বদা আমার আপনজন থাকবে। তুমি শত শত পুত্র লাভ করবে।

"—মহাদেবী উমা আমাকে আটটি বর দিলেন, দ্বিজগণের প্রতি অক্রোধ, পিতার সন্তুষ্টি, মাতার প্রসাদ, শতপুত্র লাভ, পরমভোগ, কুলে প্রীতি, শান্তিলাভ ও দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি সত্য প্রতিপালিত হবে, কখনও মিথ্যা বলবে না। তুমি এক হাজার আটজন সতী-সাধ্বী-স্ত্রী লাভ করবে। তোমার শরীর সর্বাঙ্গ সুন্দর ও কমনীয় হবে। তুমি বন্ধুপ্রিয় হবে। তোমার বাড়িতে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি আহার করবে।"

"—তারপর আমি মহাত্মা উপমন্যুর কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখন খুশি হয়ে আমার কাছে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির স্থাণু প্রভু প্রবর বরদ বর ও সর্বাত্মা প্রভৃতি মহাদেবের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তন করলেন। উমাপতির আরাধনা করেই আমি জাম্ববতীর গর্ভে শাম্বকে লাভ করেছি।"

মধুসূদনদা কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "তারপরে মহাভারতে আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাই আশ্বমেধিক পর্বে। ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের পরে যুধিষ্ঠির বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে বললেন—মহারাজ, বৃথা শোক করবেন না। পরলোকগত আত্মীয়রা সন্তুষ্ট হন যদি আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে যাগ-যজ্ঞ ও দান ধ্যান করুন। দরিদ্রদের তুষ্ট করুন তাহলেই আপনার আত্মীয়দের আত্মা তুষ্ট হবেন।

"তারপরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রচুর দান করার পরামর্শ দিলেন। আর কৃষ্ণ তাঁর কাছে কামগীতা বর্ণনা করলেন। বললেন—মহারাজ, আপনার কাজ যেমন শেষ হয় নি, তেমনি আপনি সব শত্রুকেও জয় করেন নি। অহংবুদ্ধি রূপ শত্রু এখনও আপনার মনকে অধিকার করে রয়েছে। আপনি নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। তাকে পরাজিত করুন। শোক ত্যাগ করে

রাজ্যশাসন করুন। কামনা ত্যাগ করে দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে আপনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন।"

"আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ কখন কার কাছে অনুগীতা বর্ণনা করেছেন?" সরকারদা থামতেই কল্পনাদি প্রশ্ন করলেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "আশ্বমেধিকপর্বে অর্জুনের কাছে।"

"একটু বলুন না।" কল্পনাদি অনুরোধ করেন।

সরকারদা বলতে শুরু করেন, "এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ সেদিন সেই কথাই শুনিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি তখন যোগযুক্ত ছিলেন না। সেদিন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গতি পায়। দেহধারী জীব দুর্বুদ্ধির বশে অতিভোজন ও সুরাপান করে, দিনে ঘুমায় ও রাতে অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ করে। ফলে সে বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে এবং রোগে আক্রান্ত হয়।

"—দেহত্যাগের সময় শরীরের উষ্মা বায়ু প্রকোপিত হয়ে তার মর্মস্থল ভেদ করে। তখন তার জীবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। সব জীবই বার বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। তারা জন্ম ও মৃত্যু দু-সময়েই কষ্ট পায়। মৃত্যুর পরেও কৃতকর্ম মানুষকে ত্যাগ করে না। তাই তার আবার জন্ম হয়।

"—শুক্র ও শোণিত মিলিত হয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে জীবের কর্ম অনুসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য। তিনি সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, শাশ্বত ব্রহ্ম ও সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ। জীবাত্মা দেহকে সচেতন ও চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে তোলে।

"—যতদিন মোক্ষজ্ঞান না হয়, ততদিন জীবকে জন্মজন্মান্তর ভোগ করতে হয়। জীব যখন বুঝতে পারে সুখদুঃখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল এবং সব সুখই দুঃখ, তখন সে এই ঘোর সংসারসাগর অতিক্রম করতে পারে। মরণশীল প্রাণীর দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দর্শন করেন, কেবল তিনিই পরমপদ

প্রাপ্ত হন।

"—যিনি সবার মিত্র সর্ব সহিষ্ণু শান্ত পবিত্রস্বভাব জিতেন্দ্রিয়, যাঁর ক্রোধ ভয় ও অভিমান নেই, যিনি সর্বভূতের আত্মীয়, যাঁর কাছে জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সবই সমান এবং যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ধার্মিক-অধার্মিক কিছুই নয় ও ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, তিনিই আত্মাকে উপলব্ধি করে মুক্তিলাভ করেন। যিনি সবসংস্কারমুক্ত এবং কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দিয়ে মনকে ইন্দ্রিয়মুক্ত করে একান্তমনে যোগরত হলে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়।" থামলেন সরকারদা।

"কেবল কৃষ্ণের উপদেশ কথাই বলছেন কাকু! কৃষ্ণের কাহিনী বলুন না।" বিউটির কথা শুনে বুঝতে পারছি, তত্ত্বকথা তার ভাল লাগছে না। ভাল হয়তো অনেকেরই লাগে নি। তবে সেকথা বলল কেবল বিউটি।

মৃদু হেসে সরকারদা বলেন, "কি করব মা! তাঁর মহাজীবনটাই যে একটা উপদেশ। যাই হোক, সংক্ষেপে পরের কাহিনী বলছি শোন। তারপরে কৃষ্ণ একদিন পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকা রওনা হলেন। বিদায় বেলায় যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন—পুণ্ডরীকাক্ষ, যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

"শুভদ্রাকে সঙ্গে করে কৃষ্ণ দ্বারকায় এলেন। কৃষ্ণ পিতা বসুদেবকে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের বিবরণ দিলেন। দৌহিত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব প্রথমে অত্যন্ত কাতর হলেন। কিন্তু পরে অভিমন্যুর বীরত্বের কথা শুনে তিনি শোক সংবরণ করলেন।

"হস্তিনাপুরে তখন বিরাটকন্যা উত্তরা পতিশোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। একদিন ব্যাসদেব সেখানে গিয়ে উত্তরাকে বললেন—অনাহারের ফলে তোমার গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হচ্ছে। যশস্বিনী, শোক ত্যাগ কর। তোমার মহাতেজা পুত্র হবে। বাসুদেবের প্রভাবে ও আমার আশীর্বাদে সে পাণ্ডবদের পরে ভারত শাসন করবে।

"পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমাগত হল। ভগ্নী সুভদ্রা, ভ্রাতা গদ, পুত্র প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব এবং সাত্যকি, কৃতবর্মা ও বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন। গিয়েই শুনলেন উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করেছেন। কৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। বুঝতে পারলেন, পিতৃশোকে উন্মাদ হয়ে অশ্বত্থামা সেদিন কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের ওপরে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তারই ফলে তাঁদের এই শেষ বংশধরটিও মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পুরনারীরা পুরাণপুরুষকে ঘিরে ধরলেন। কাঁদতে কাঁদতে কুন্তী বললেন—বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি। এই বালক আমার শ্বশুরকুলের পিণ্ডদাতা। তুমি বলেছিলে একে পুনর্জীবিত করবে। এখন সেই প্রতিশ্রুতি পালন কর।

"দ্রৌপদী কৃষ্ণকে নিয়ে সূতিকাগৃহে এলেন। উত্তরা করুণস্বরে বললেন—পুণ্ডরীকাক্ষ! দেখুন, আমি পুত্রহীনা হয়েছি। আমিও এখন অভিমন্যুর মতোই নিহত। আমার আশা ছিল পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব। আপনি দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলুন।

"এতক্ষণ পরে কৃষ্ণ প্রথম কথা বললেন। তিনি শান্তস্বরে উত্তরাকে বললেন—আমার কথা মিথ্যে হবার নয়। সবার সামনেই আমি তোমার ছেলেকে পুনর্জীবিত করছি। যদি আমি কখনও মিথ্যে না বলে থাকি, যদি ধর্ম আমার সহায় ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হয়ে থাকেন, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবনলাভ করুক। যদি অর্জুনের সঙ্গে কখনও আমার মনোমালিন্য না হয়ে থাকে, যদি আমি কেশীদৈত্য ও কংসকে ধর্ম অনুসারে বধ করে থাকি, তাহলে এখুনি তোমার এই ছেলে বেঁচে উঠবে।

"অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদনের বাক্য মিথ্যে হবার নয়। ধীরে ধীরে সেই মৃতশিশু চেতনা লাভ করল। সে নড়ে উঠল। নবজাতকের কান্নায় পাণ্ডবপুরী হেসে উঠল।

"উত্তরা ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ

শিশুকে রত্ন উপহার দিলেন। বললেন—ভরতবংশ পরিক্ষীণ হবার পরে অভিমন্যুর এই পুত্র জন্মেছে বলে আমি এর নাম রাখলাম 'পরীক্ষিৎ'।"

"কৃষ্ণ মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে তুললেন!" সরকারদা থামতেই বিউটি বলে উঠল।

সরকারদা মাথা নেড়ে উত্তর দেন, "হ্যাঁ।"

বিউটি মন্তব্য করে, "একেবারে গাঁজা।"

"না"। আমি বলি। বিউটি সহ সবাই সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকায়। আমি বিউটিকে বলতে থাকি, "তুমি কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র বইখানি এনে একবার পড়ে দেখো। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তোমার অনেক সন্দেহের অবসান হবে।"

"তা বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কি বলেছেন?"

"বলেছেন—'অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, যাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল'।"

চার

সকাল সওয়া ন'টায় জীতলসর জংশনে পৌঁছলাম। এখানে কীর্তি একসপ্রেসকে দু-টুকরো করা হবে। এক টুকরো এখান থেকে আরও কয়েকখানি গাড়ি নিয়ে পোরবন্দর চলে যাবে। তারই নাম হবে কীর্তি একসপ্রেস। পোরবন্দর শুধু মহাত্মাজীর জন্মভূমি নয়, পোরবন্দর সেকালের সুদামাপুরী। তাহলেও এ যাত্রায় পোরবন্দর দর্শন করা হল না আমার।

কীর্তি একস্প্রেসের পরিত্যক্ত অংশকে জুড়ে দেওয়া হবে সোমনাথ মেলের সঙ্গে। আমাদের গাড়ি সেই অংশের অংশীভূত। সুতরাং আমরা পড়ে রইলাম জীতলসর জংশনে।

ঠাকুরমারা যথারীতি বাসি কাপড়ের বালতি নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। ম্যানেজার বলেছে এখানে নাকি জল আছে। ঠাকুরমারা তিনজনেই পূর্ববঙ্গের মানুষ। কাজেই জলটা তাঁদের একটু বেশি লাগে। দৈনিক স্নান করতেই হয়, অন্তত দু'বার জামা-কাপড় ছাড়তে হয়। গাড়িতে জলাভাব বলে তাঁরা ছাড়া জামা-কাপড় বালতিতে ভুগিয়ে রাখেন। কোন স্টেশনে জল পেলেই বেয়ারাকে বকশিষ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম দখল করে নেন। সেই চেষ্টাতেই এখন গেলেন বোধ হয়।

ঠাকুরমাদের তিনজনেরই বয়স সাতের ঘরে। তাঁরা কেউ কারও আত্মীয়া নন। এমনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েই তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেই থেকে তাঁরা একত্রে তীর্থদর্শন করে চলেছেন। বয়সের ভারে তাঁরা মোটেই কাহিল হয়ে পড়েন নি, সম্পূর্ণ সচল রয়েছেন। তিনজনেই ভ্রমণপটু। তাঁরা সবার আগে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং সবার আগে দর্শন সেরে গাড়িতে ফিরে আসেন। তাদের নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণযোগ্য।

উকিলবাবু গাড়ি থেকে নামছেন। একটু অবাক হই। তিনি সাধারণতঃ তাঁর স্ত্রীর পায়ের কাছে কাঠের জলচৌকিখানির ওপরেই বসে থাকেন। সেখানি তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী অতিশয়া স্থূলাঙ্গী। তাই উঁচু সিঁড়ি ভাঙ্গতে হলেই ওখানির সাহায্য লাগে। উকিলবাবু আপার বার্থ পেয়েছেন। সব সময় সেখানে বসে থাকা সম্ভব নয়। অথচ মিসেস উকিল সাধারণতঃ শুয়েই থাকেন এবং তিনি শোবার পরে তাঁর বার্থে আর কারও বসার জায়গা থাকে না। কাজেই উকিলবাবুকে মিসেসের পায়ের কাছে জলচৌকিতে আশ্রয় নিতে হয়।

উকিলবাবুর বয়স সাতের কোঠায়। তাহলেও তিনি সম্পূর্ণ সচল। কিন্তু তিনি কখনও কোন মন্দিরে প্রবেশ করেন না। আর মিসেস তাঁর বিশাল বপু নিয়ে প্রতিটি মন্দির দর্শন করেন। কারণ জিজ্ঞেস

করায় উকিলবাবু সহাস্যে বলেছেন, "সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, নহিলে ঝামেলা বাড়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাবু বলেছেন, "স্বামী পুণ্য করলে স্ত্রী অর্ধেক ভাগ পান কিন্তু স্ত্রী পুণ্য করলে স্বামী তার এক কণাও লাভ করেন না।"

উকিলবাবু কোন মন্তব্য করেন নি, কিন্তু তার পরেও তিনি কোন মন্দিরে যান নি। সহযাত্রীরা অনেকে তাই আড়ালে উকিলবাবুকে বলেন —'Wife's attendent'.

ম্যানেজার ছুটে আসে। বলে, "গাড়িতে উঠুন। শান্টিং হবে। জল পাওয়া গিয়েছে।"

খুবই সুসংবাদ। গতকাল বিকেল থেকেই গাড়ির ট্যাঙ্ক জলশূন্য। তাড়াতাড়ি উঠে আসি গাড়িতে।

একটু বাদেই একটা শান্টিং ইঞ্জিন এসে আমাদের গাড়িকে জলের পাইপের কাছে নিয়ে আসে। আর তারপরেই রেল কর্মীদের প্রতীক্ষা না করে স্বয়ং ম্যানেজার সদলবলে গাড়ির ছাদে ওঠে। কর্মীরা আসার আগেই গাড়ির ট্যাঙ্ক জল বোঝাই হয়ে যায়।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন অমিয়বাবু। গাড়িতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ভদ্রলোক এখনও হাঁপাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করি, "এমন হাঁপাচ্ছেন কেন?"

"হাঁপাবো না। আপনারা যে আমাকে এখানে ফেলে পালাবার তালে ছিলেন।"

বুঝতে পারি ব্যাপারটা। উনি যখন গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন, তখন গাড়িটা ছিল পাশের প্লাটফর্মে। তারপরে জল ভরবার জন্য গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ফিরে এসে গাড়ি খুঁজে পেতে ভদ্রলোকের একটু বেগ পেতে হয়েছে আর কি।

জিজ্ঞেস করি, "তা শেষ পর্যন্ত গাড়ি খুঁজে পেলেন কেমন করে?"

ওপরদিক দেখিয়ে অমিয়বাবু বলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? হঠাৎ দেখতে পেলাম ম্যানেজার একটা গাড়ির ছাদে উঠে জল ভরছেন। বুঝলাম এটাই আমাদের গাড়ি। ভাগ্যিস ম্যানেজার গাড়ির ছাদে উঠেছিলেন।"

সহযাত্রীরা হেসে ওঠেন। অমিয়বাবু এমনিতেই মজার মানুষ। একমাত্র অসুবিধে তাঁর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। কারণ তিনি কানে বেশ একটু খাটো। ভদ্রলোকের বয়স পাঁচের ঘরে। রোগা ও কালো চেহারা। অকৃতদার। কাজকর্মও করেন না কিছু। বাবা একখানি বাড়ি রেখে গিয়েছেন। তারই ভাড়া থেকে বেশ চলে যায়।

হাসি থামার পরে আমার দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে অমিয়বাবু বলেন, "দাদা, একটু প্রসাদ দিন।"

পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে তাঁর হাতে দিই।

সেজদি মানে মিসেস সাহা বলেন, "তাহলে তো ঠাকুরমাদেরও গাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। ম্যানেজারবাবুও ছাদ থেকে নেমে পড়েছেন।"

অমিয়বাবু প্রতিবাদ করেন, "ওঁদের কি আমার মতো বোকা ভেবেছেন। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল।"

আবার হাসি। আর সে হাসি থামবার আগে বালতি বোঝাই ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে ঠাকুরমারা একে একে গাড়িতে উঠে এলেন।

সকাল দশটায় ট্রেন ছাড়ল। রাজকোট থেকে ভেরাভল ১৮৬ ও জীতলসর থেকে ১০৮ কিলোমিটার। এই পথটুকু যেতে আমাদের সোয়া তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। কারণ নামে মেল হলেও প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামবে। পথে পড়বে জুনাগড়।

কিন্তু থাক্‌, জুনাগড়ের কথা এখন নয়। তার চেয়ে সরকারদার খোপে যাওয়া যাক্‌। সেখানে কৃষ্ণকথার আসর বসেছে। প্রভাস পৌঁছবার আগে মৌষলপর্বের কাহিনীটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক্‌।

তাড়াতাড়ি এসে সত্যেনদার পাশে বসি। সত্যেনদার পুরো নাম সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বয়সে প্রৌঢ়। সহজ সরল সাদাসিধে স্নেহপরায়ণ মানুষ। তাঁর মমতাময়ী মাকে নিয়ে তীর্থে এসেছেন। আমিও তাঁর মাকে মা বলেই ডাকছি।

সরকারদা শুরু করেন, "সহযাত্রিগণ, এখন আমি আপনাদের কাছে মহাভারতের মৌষলপর্বের কাহিনী বলছি। এটি আমার কৃষ্ণকথার শেষ বিষয়। গত কয়েকদিন ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যা বলেছি,

তা সেই মহাজীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র। তা হলেও আশাকরি সেই পুরাণপুরুষের কিছু কথা আপনারা জানতে পেরেছেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "আমি আপনাদের যে কৃষ্ণকথা বললাম, তা মহাভারতের। আপনারা জানেন পাণ্ডবদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নেই! যাই হোক্ আমি এখন মহাভারতের মৌষলপর্বের কথা বলছি।

"যুদ্ধজয়ের পরে ছত্রিশ বছর পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেছিলেন। রাম-কৃষ্ণ সহ যাদববাও এই ছত্রিশ বছরই বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা হবার কোন কথা মহাভারতে নেই।"

"ব্যাপারটা, একটু বিস্ময়কর।" উমাদি মন্তব্য করেন।

সরকারদা কিছু বলতে পারার আগেই আমি বলি, "আর তাই মৌষলপর্বটি মূল-মহাভারতের অংশ কিনা সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।"

"তিনি কি বলেছেন মামু?" বিউটি জিজ্ঞেস করে।

আমি উত্তর দিই, "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বলেছেন—'মৌষলপর্বটি মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই।...এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত।... আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের'।"

আমি শেষ করার পরেও সরকারদা চুপ করে রয়েছেন। তিনি বোধ হয় একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "একি! চুপ করে রয়েছেন কেন? মৌষলপর্বের কথা বলুন।"

"বলব। কিন্তু তার আগে শ্রীমদ্ভাগবদের কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।"

"বেশ তো বলুন।"

সরকারদা শুরু করেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেছেন, কিন্তু তিনি মথুরার সিংহাসনে বসেন নি। তিনি মাতামহ

উগ্রসেন তার মানে কংসের পিতাকেই মথুরার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। অথচ তিনি রাজা না হয়েও নিরলস ভাবে রাজকর্ম করে গিয়েছেন। তাঁর আশা ছিল মথুরাকে তিনি এক কল্যাণরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবেন।

"পারেন নি। জরাসন্ধের জন্য শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে সেখানে তিনি তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পেরেছিলেন। দ্বারকা কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখানেও তিনি রাজা হন নি।

"উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি তাঁর সেবক রূপে কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। যদুবংশের আটটি শাখা থেকে দশজন জ্ঞানী গুণী ও অভিজ্ঞকে নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন। নিজের শিক্ষাগুরু অবন্তীপুরের অধ্যাপক সন্দীপনি মুনিকে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদের সবপ্রকার সুখ-সুবিধার দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। তিনি এখানে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হরিবংশে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাতে সঞ্চয়ী যক্ষদের বাড়িতে ডেকে এনে তাঁদের গুপ্তধন দরিদ্রদের মধ্যে সমান ভাবে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য সে নির্দেশ পালিত হয়েছিল।

"প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল চুরি করেছে জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যান। দেব-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি নরকাসুরকে বধ করেন। তারপরে দেখতে পান, নরকাসুর বিভিন্ন দেশের রাজবধূ ও রাজকন্যাদের ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীদের উদ্ধার করলেন। নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে তিনি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দান করেছিলেন।

"অশেষ গুণশালী হয়েও শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোন উচ্চপদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনিই ছিলেন দ্বারকার প্রকৃত শাসক। তাঁর সুশাসনে দ্বারকায় কোন ভিক্ষুক কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ ছিল না। আর তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই বোধ হয় দ্বারকার মানুষ শিক্ষিত ও নির্লোভ হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধ ও সৎচরিত্র।

"অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছরের মধ্যে সেই দ্বারকার যাদবগণ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠলেন। একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ দ্বারকায় এলেন। সুভদ্রার ভাই সারণ ও তাঁর কয়েক বন্ধুর মাথায় এক কুবুদ্ধি এল। তাঁরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে মুনিদের সামনে নিয়ে গেলেন। বললেন—ইনি যাদববীর বভ্রুর পত্নী, সন্তানসম্ভবা ও পুত্রাভিলাষী। বলুন তো ইনি কি প্রসব করবেন?

"বলা বাহুল্য মুনিরা তাঁদেব প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা অভিশাপ দিলেন—এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব করবে। সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ছাড়া যদুবংশের সকলেই নিহত হবে। বলরাম সমুদ্রে দেহরক্ষা করবেন আর জরা নামে এক ব্যাধ কৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করবে।

"যথাসময়ে কথাটা কৃষ্ণের কানে এলো। কিন্তু তিনি কোন প্রতিকার করলেন না। পরদিনই শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন মুষলটি চূর্ণ করিয়ে সাগরে ফেলে দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন—দ্বারকায় কেউ সুরা তৈরি করতে পারবে না। যে এই আদেশ লঙ্ঘন করবে, তাকে সপরিবারে শূলে চড়ানো হবে।

"তা সত্ত্বেও যাদবগণের নির্লজ্জ পাপাচার প্রশমিত হল না। তারপরেই দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা যেতে থাকল। অবশেষে এক ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবদের বললেন—আমাদের বিনাশ আসন্ন। তোমরা তাড়াতাড়ি প্রভাসতীর্থে চলে যাও।"

"আমরা এখন সেই প্রভাসে চলেছি কাকু?" মাঝখান থেকে বিউটি বলে উঠল।

"হ্যাঁ, মা!" সরকারদা সহাস্যে উত্তর দেন। তিনি বলতে থাকেন, "বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ প্রচুর মদ ও মাংস সহ তাঁদের পরিবারবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও বারবধূদের নিয়ে প্রভাসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিরন্তর নারীসঙ্গ ও মদ্যপান করতে থাকলেন। একদিন সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সামনেই সুরাপান শুরু করে দিলেন।

"তারপরেই মাতাল সাত্যকি কৃতবর্মার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধালেন। বললেন—তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে একজন নিদ্রামগ্ন ক্ষত্রিয়কে বধ করেছো।

যাদবরা কোনদিন তোমাকে ক্ষমা করবে না। প্রদ্যুম্ন তাঁকে সমর্থন করলেন।

"কৃতবর্মাও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি বললেন—তুমিও তো হাতকাটা ভূরিশ্রবাকে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছো।

"সাত্যকি তখন সত্যভামার সামনেই বলে ফেললেন—আর তুমি যে অক্রূরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শতধন্বাকে দিয়ে সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে বধ করিয়েছো।

"বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই সত্যভামা ছুটে গেলেন কৃষ্ণের কাছে। তিনি তাঁর কোলে বসে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। কৃষ্ণ কিছুই বললেন না। কি বলবেন? তিনি অন্তর্যামী। এই আত্মকলহের পরিণতি তাঁর অজানা ছিল না।

"সাত্যকি তখন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সত্যভামাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এই পাপাত্মা কৃতবর্মার সাহায্যে অশ্বত্থামা চোরের মতো নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পুত্রদের হত্যা করেছিল। তাঁরা যেখানে গিয়েছে, আজ একেও আমি সেখানে পাঠাচ্ছি। বলেই তিনি খড়্গ দিয়ে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করলেন। তারপরে তিনি কৃতবর্মার সমর্থকদেরও মারতে থাকলেন।

"অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি ও কুকুর প্রভৃতি যদুবংশের বিভিন্ন শাখার বীরগণ তখন পৃথক পৃথক দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে দিলেন। সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন নিহত হলেন।

সত্যভামাকে কোল থেকে নামিয়ে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একমুঠো এরকা বা গোগলা হাতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বজ্রতুল্য লৌহ-মুষলে পরিণত হল। সেই মুষলের সাহায্যে তিনি সামনে যাঁকে পেলেন, তাঁকেই হত্যা করতে থাকলেন।

"প্রভাসের সমস্ত এরকাই মুষলে পরিণত হল। যাদবরা মুষল দিয়ে একে অপরকে হত্যা করতে থাকলেন। তাঁরা জ্ঞাতি হত্যায় মেতে উঠলেন। বাবা ছেলেকে মারলেন, ভাগনে মামাকে, ভাই ভাইকে। কৃষ্ণের সামনেই গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণ ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নিহত হলেন।

"বভ্রু ও দারুক তখন কৃষ্ণকে বললেন—ভগবান, আপনি বহু

লোককে বিনষ্ট করেছেন। চলুন, এখন আমরা সাগরতীরে যাই'। সেখানে বলরাম বসে আছেন।

"সাগরতীরে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম একা গাছের ছায়ায় বসে অনন্ত সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, তিনি সাগরে দেহরক্ষা করার কথা ভাবছেন। কৃষ্ণ তখন দারুককে বললেন —তুমি হস্তিনাপুরে চলে যাও! অর্জুনকে গিয়ে বলো যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। তাকে নিয়ে এসো এখানে।

"তারপরে কৃষ্ণ বভ্রুকে বললেন—তুমি গিয়ে যাদব-নারীদের রক্ষা করো। দেখো, দস্যুরা তাঁদের যেন অপহরণ না করে।

"বভ্রু মেয়েদের কাছে পৌঁছবার আগেই একজন ব্যাধ তাঁকে হত্যা করল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামকে বললেন—আমি মেয়েদের রক্ষা করতে যাচ্ছি। আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

"কৃষ্ণ এলেন পিতা বসুদেবের কাছে। তাঁকে বললেন—আপনি মেয়েদের নিযে দ্বারকায় চলে যান। দাদা সাগরতীরে তপস্যায় বসেছেন, আমি তাঁর কাছে চলে যাচ্ছি। তিনি পিতাকে প্রণাম করলেন —শেষ প্রণাম। যে পিতাকে কংসের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্র একদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন, যে পিতা ও পিতৃকুলের নিরাপত্তার প্রয়োজনে একদিন মথুরানাথকে মথুরা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, সেই পিতা বসুদেবকে শেষ প্রণাম করলেন পুত্র বাসুদেব।

"নারী ও শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন, ঠিক যেমন করে একদিন ব্রজগোপীরা গোপীনাথের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন।

"সেদিন ব্রজনারীরা যা পারেন নি, আজ যদুনারীরাও তা পারলেন না। নিষ্ঠুর রাসবিহারী সেদিন বলেছিলেন—'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—স্থূলভাবে আমি চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আমি বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যেতে পারি না। আমি বৃন্দাবনেই চির-বিরাজমান। আজ যদুনাথ বললেন—সব্যসাচী এখানে আসছে, সে তোমাদের দুঃখ মোচন করবে।

"সাগরতীরে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম দেহত্যাগ করেছেন।

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ সেই বনে পায়চারি করলেন। তারপরে তিনি ইন্দ্রিয় দমন করে তপস্যায় রত হলেন।

"আর ঠিক তখুনি জরা নামে জনৈক ব্যাধ দূর থেকে কৃষ্ণের চরণ দুখানি দেখতে পেলেন। তিনি হরিণ ভেবে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বাণ নিক্ষেপ করলেন।

"কাছে এসে জরা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি মধুসূদনের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

"কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন—ভবিতব্যকে খণ্ডন করবার ক্ষমতা কারও নেই।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ আবৃত করে বৈকুণ্ঠ-লোকে মহাপ্রয়াণ করলেন। স্বর্গে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এমন শুভদিন স্বর্গে আর কখনও আসে নি।"

"মর্ত্যেরও এমন দুর্দিন আর কখনও হয় নি। কারণ সেদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে কলিযুগ—ঘোরকলি।" সরকারদা থামতেই দাদা মন্তব্য করেন।

উমাদি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের দেহ কি সেখানেই পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ। মহাভারতের মতে অর্জুন প্রভাসে এসে কৃষ্ণ-বলরামের দেহ খুঁজে বের করে সংকার করেছিলেন। তারপরে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী সহ দ্বারকার সমস্ত নারী বৃদ্ধ ও বালকদের নিয়ে দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরের পথে রওনা হয়েছিলেন। কৃষ্ণের প্রপৌত্র এবং একমাত্র বংশধর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। অর্জুন চলে যাবার পরেই সমুদ্র এগিয়ে এসে দ্বারকাকে গ্রাস করল। দ্বারকানাথের দ্বারকাও হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।"

"কিন্তু আমরা যে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই স্বর্গারোহণ করে-ছিলেন! এবং তাঁর এই অন্তর্ধান-লীলা দেবতারা পর্যন্ত দেখতে পান নি, কেবল তাঁর পার্ষদরা দেখেছিলেন!"

"ঠিকই শুনেছেন।" সরকারদা উমাদিকে বলেন, "ওটা শ্রীমদ্ভাগ-বতের মত। তবে ভাগবতেও বলা হয়েছে এই লীলাস্থল প্রভাস—'যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী', যেখানে সরস্বতী পশ্চিম-প্রবাহিনী। মহাভারতেও

বলা হয়েছে সরস্বতী সঙ্গমে। আমরা এখন সেখানেই চলেছি।"

"আরেকটা কথা।" উমাদি সরকারদার দিকে তাকান।

"বেশ বলুন।"

উমাদি বলেন, "দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ' বইতে পড়েছি, বলভদ্র দেহরক্ষার পরে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আদেশ দিলেন—অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্রনাভকে মথুরায় রেখে এসো। বজ্র কাছে আসার পরে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—তুমি মেয়েদের মথুরা নিয়ে যাও। তাদের সেখানে রেখে হস্তিনায় গিয়ে অর্জুনকে খবর দাও। আজ থেকে সাতদিন পরে কার্তিকী পূর্ণিমায় দ্বারকা সমুদ্রে বিলীন হবে।"

"হ্যাঁ," সরকারদা বলেন, "ওটাও পুরাণের মত। মহাভারতে বলা হয়েছে—অর্জুন দ্বারকার নারীদের সঙ্গে বজ্রনাভকেও সঙ্গে নিয়ে যান। পথে পাঞ্জাবে কোন জায়গায় আভীর দস্যুরা রূপসী ও যুবতীদের হরণ করে নিয়ে যায়।

"সব্যসাচী তাঁদের রক্ষা করতে পারেন না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত অস্ত্রের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে পৌঁছন। কৃতবর্মার পুত্র ও ভোজ নারীদের মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর তীরে রেখে অন্যান্য নারী শিশু ও বজ্রনাভকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। তিনি বজ্রনাভকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব দান করলেন।

"কৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণী, জাম্ববতী, গান্ধারী, শৈব্যা ও হৈমবতী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। সত্যভামা এবং অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীরা হিমালয় পেরিয়ে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।"

পাঁচ

বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রেন জুনাগড় পৌঁছল। জুনাগড়ের জনপ্রিয় নাম সোরাঠ—সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশ। আমরা রাজকোট থেকে ১০৩ কিঃ মিঃ আর জেতলসর থেকে ২৫ কিলোমিটার এসেছি। এখান থেকে ভেরাভল ৮৩ কিলোমিটার। জুনাগড় শহরের আয়তন ৩৭৭০

একর। জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, ভৌগোলিক অবস্থান ৭০°১৩´ পূর্ব-দ্রাঘিমা ও ২১°১´ উত্তর অক্ষরেখা।

ট্রেন মাত্র কয়েক মিনিট দাঁড়াবে এখানে। তাই তাড়াতাড়ি নেমে আসি গাড়ি থেকে। এই জনপদটিকে ঘিরে যে আমার অনেক স্মৃতি আছে জড়িয়ে। ভারত স্বাধীন হবার ঠিক পরেই জুনাগড় বেশ কয়েকদিন ধরে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছিল। জুনাগড়ের নবাব রাজ্যের জনসাধারণ ও অবস্থানের কথা বিস্মৃত হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অমুসলমানদের নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর সেই খোয়াবকে হাসিল করতে দেন নি। জুনাগড়ের শাহান্‌শাহ্‌ শেষপর্যন্ত পাকিস্তানে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছেন।

জুনাগড় ভারতের প্রাচীনতম জনপদগুলির অন্যতম। প্রাচীনত্বের গৌরবে গুজরাতে প্রভাসের পরেই জুনাগড়। আর সৌন্দর্যের বিচারে জুনাগড়ের স্থান সবার ওপরে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মেজর ওয়াটসন বলেছেন—'Junagar is one of the most picturesque towns of india and in antiquity and historical interest it yeilds to none.'

সেই সৌন্দর্যের আকর গির্ণার পাহাড়টিকেই দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। মাত্র মাইল দু'য়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। মহাকবি মাঘের মতে গির্ণার প্রতি পলে রূপ পালটায়।

শুধু মহারাজা কিংবা সুলতানরা নয়, যোগী ও ঋষিরাও যুগে যুগে গির্ণারকে তাদের তপোভূমিরূপে নির্বাচিত করেছেন। তাই গির্ণারের বুকে গড়ে উঠেছে মন্দির ও মঠ। সুন্দরী গির্ণার পরিণত হয়েছে পবিত্রতীর্থে।

সুদূর অতীত থেকেই গির্ণার হিন্দু ও জৈনদের কাছে তীর্থরূপে পরিচিত। গির্ণারই কৃষ্ণ ও বলরামের রৈবতক। প্রাচীন পুঁথিতে গির্ণারকে উজ্জয়ন্ত, উর্জয়ন্ত এবং গিরিনারায়ণ বলা হয়েছে। বর্তমান গির্ণার নামটি নিঃসন্দেহে গিরিনারায়ণ নামের অপভ্রংশ।

গির্ণারের পাঁচটি প্রধান শৃঙ্গের নাম অম্বাজী, গোরখনাথ, গুরু দত্তাত্রেয়, ওঘাধ এবং কালকা। গোরখনাথ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, উচ্চতা ৩৬৬৬ ফুট।

সত্তর বর্গমাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গির্ণার। প্রায় পঁয়ষট্টিটি বিভিন্ন ধরণের গাছপালা রয়েছে এই বনময় পাহাড়ে। আগে এ পাহাড়ে প্রায়ই সিংহ দেখা যেত। এখনও গিরের জঙ্গল থেকে যে পথ ভুলে যে দু-একটি সিংহ এদিকে এসে না পড়ে, তা নয়। তবে তেমন ঘটনা আজকাল খুবই কম ঘটে।

শুনেছি গির্ণারের ওপর থেকে চারিপাশের বনভূমি ও আরব সাগরের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার জুনাগড়ে এসেও এবারে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনের অবকাশ হল না আমার।

আমি জুনাগড়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে যাচ্ছি ভেরাভল, কিন্তু আমি যেতে পারব না গিরজঙ্গলে। দেখতে পারব না এশিয়ার একমাত্র সিংহনিবাসে এশিয়ার সিংহদের সেই ১৭৭টি বংশধরকে। অথচ কাজটা মোটেই কঠিন নয়। জুনাগড়ের 'কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট'কে বললে তিনি সেই পশুরাজদের সঙ্গে দেখা করাব সব ব্যবস্থা করে দেন। জীপ, বাইনোকুলার এবং পথপ্রদর্শক সবই পাওয়া যায়।

রেলপথেও গিরজঙ্গলে যাওয়া যায়। দূরত্ব এখান থেকে ১২৭ কিঃমিঃ ও ভেরাভল থেকে মাত্র ৪৩ কিলোমিটার। স্টেশনের নাম সাসানগির—ছোট শহর। উচ্চতা ১৫৭.৪১ মিটার (৫১৬ ফুট)। শহরের উপকণ্ঠে ১৫১৫ বর্গ কিলোমিটার (৫৮৫ বর্গমাইল) বনভূমি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পশুরাজদের সেই সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সিংহ দর্শনের সবচেয়ে ভাল সময় এখন—এই মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। কারণ এখন তারা নিয়মিত জলের কাছে আসে

শুধু সিংহ নয়, গিরজঙ্গলে গেলে দেখা হত গুজরাতের আদি-অধিবাসীদের সঙ্গে। সাসানগির থেকে বনের পথে শেষ গ্রাম শ্রীবন। সেখানে সেই কালো আদিবাসীদের কয়েকঘর অর্ধসভ্য মানুষ, পশু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনমতে আজও টিকে রয়েছে।

কিন্তু গির ফরেস্ট তো বহুদূর, তার চেয়ে যতক্ষণ পারি গির্ণারকে দেখে নিই। ভক্তরা নিয়মিত এই পবিত্র পাহাড় পরিক্রমা করেন। রাসপূর্ণিমায় বেশ বড় মেলা বসে গির্ণারে। জৈনদের কাছে পরেশনাথের পরেই গির্ণারের স্থান। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক দ্বাবিংশ

জৈন তীর্থঙ্কর নেমীনাথের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই পাহাড়টিকে উৎসর্গ করেছেন। পাহাড়ের ওপরে জৈনমন্দিরটিকেও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

পদযাত্রীরা সাধারণতঃ ভোরে যাত্রা করেন। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জৈনমন্দিরে পৌঁছতে হাজার চারেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়। পথে পড়ে সীতাবন, ভরতবন, হনুমানধারা, গোমুখীকুণ্ড, কালীমন্দির ও গোরক্ষনাথের মন্দির প্রভৃতি। আর স্টেশন থেকে পাহাড়ে যাবার পথে নাকি সম্রাট অশোকের কিছু কীর্তি আজও দর্শন করা যায়। অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মিলনভূমি এই জুনাগড়।

বাঁশির শব্দে চমকে উঠি। কৃষ্ণের নয়, গার্ডের বাঁশি। গার্ডসাহেব বাঁশি বাজিয়ে সবুজ নিশান ওড়াচ্ছেন। ট্রেন ছাড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে আসি গাড়িতে।

এসে দেখি সহযাত্রীরা সরকারদাকে ঘেরাও করেছেন। তাদের দাবী অর্জুনের সুভদ্রা-হরণের কাহিনী বলতে হবে। কারণ সেই 'ইলোপ্'-য়ের অকুস্থল রৈবতক। তার মানে সদ্য দেখা গির্ণার।

সরকারদা বলছেন, "কিন্তু সে কাহিনী তো সেদিন বললাম আপনাদের, আবু-রোড থেকে দ্বারকা যাবার পথে।"

"ভুলে গিয়েছি।" দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন।

সত্যেনদা দাবী করেন, "আরেকবার বলুন।"

আপত্তি করে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরেই বোধহয় মৃদু হেসে সরকারদা শুরু করেন, "সেদিন আমি আপনাদের বলেছি, দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পরে পঞ্চ-পাণ্ডবদের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল যে তাঁদের একজন যখন দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন, তখন আর কেউ সে ঘরে যেতে পারবেন না। যিনি এই চুক্তি লঙ্ঘন করবেন, তিনি বারো বছরের জন্য বনবাসী হবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুধিষ্ঠির একদিন যখন আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাস করছিলেন, তখন একজন ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে এসে বললেন—একটা চোর আমার গোধন চুরি করে পালাচ্ছে। এখুনি তাকে না রুখলে, সে পালিয়ে যাবে।

"বাধ্য হয়ে অর্জুনকে অস্ত্রের জন্য আয়ুধাগারে প্রবেশ করতে হল।

কিছুক্ষণ বাদেই গোধন উদ্ধার করে অর্জুন ফিরে এলেন প্রাসাদে। কুন্তীদেবী দ্রৌপদী ও ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বারো বছরের জন্য বনবাসী হলেন তিনি।

"এর বনবাসের সময় অর্জুন প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করেন। তখুনি তিনি নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুর রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছেন। তিনি তিন বছর মণিপুরে বাস করেন এবং তখুনি তাঁর বীরপুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। মণিপুর থেকে বিভিন্ন তীর্থদর্শনের পরে অর্জুন প্রভাসে পৌঁছলেন।

"খবর পেয়ে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ ছুটে এলেন প্রভাসতীর্থে। কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে এলেন এখানে—এই রৈবতক পর্বতে। কারণ রৈবতক ছিল কৃষ্ণ বলরামের প্রিয়তম বিহারভূমি। স্ত্রী রেবতীর নাম থেকেই নাকি বলরাম এই পাহাড়ের নাম রেখেছিলেন রৈবতকগিরি।

"কৃষ্ণ রৈবতক থেকে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন। দ্বারকা-বাসীরা বিপুল সংবর্ধনা জানালেন অর্জুনকে। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে অর্জুন আবার এলেন বৈবতকে। তখন এখানে যাদবদের এক মহোৎসব হচ্ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যখন সেই মহামেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি সখীদের সঙ্গে সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচীর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

"আন্তর্যামী কৃষ্ণ অর্জুনের মনোস্কামনা বুঝতে পেরে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—সখা! বনবাসী হয়েও মদনবাণে চঞ্চল হলে? অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, মেয়েটি আমার পিতার পালিতা কন্যা, নাম সুভদ্রা। নিতান্তই যদি ওর প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকো, তাহলে বল। বাবাকে বলি কথাটা।

"—কিন্তু তিনি কি মত দেবেন? অর্জুন প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে। —শুনেছি দাউজী (বলরাম) তোমার এই বোনটিকে তাঁর প্রিয়শিষ্য দুর্যোধনের হাতে সম্প্রদান করতে চান।

"কথাটা কৃষ্ণের অজানা ছিল না। এবং প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দসই নয় বলেই তিনি অর্জুনকে বললেন—সে-সব ভাবনা আমার, তোমার কি ইচ্ছে তাই বল।

"—অনিচ্ছা হবে কেন বল? একে তোমার বোন, তার ওপরে এমন স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। যদি তোমার অনিচ্ছা না থাকে, তাহলে বল, কিভাবে আমি সুভদ্রাকে পেতে পারি?

"বাসুদেব বললেন—স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয়, কিন্তু মেয়েদের মনকে বিশ্বেস নেই। শাস্ত্রকারগণ বলেন, বিয়ের জন্য নারীহরণ বীর ক্ষত্রিয়দের প্রশংসনীয় কাজ। অতএব তুমি আমার বোনকে হরণ কর।

"অর্জুন তখন দূত মারফৎ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সুভদ্রা-হরণের অনুমোদন নিয়ে এলেন। তারপবে শ্রীকৃষ্ণের শুভেচ্ছা নিয়ে সশস্ত্র অর্জুন রৈবতকের দেবালয়ে উপস্থিত হলেন। সুভদ্রা তখন দেবার্চনা শেষ করে দ্বারকা ফিরে যাবার জন্য রথে উঠেছেন। মদনবাণে আহত সব্যসাচী সহসা এগিয়ে এসে সুন্দরী সুভদ্রার পাণিপীড়ন করলেন। সুভদ্রার দেহরক্ষীরা অস্ত্র বের করার আগেই অর্জুন তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। ত্বরিত পদক্ষেপে ফিরে এলেন নিজের রথে। সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে রথ চলল ইন্দ্রপ্রস্থের পথে।

"সুভদ্রার দেহরক্ষীরা অর্জুনকে আক্রমণ করতে সাহসী হলেন না। তাঁরা দ্বারকায় এসে অর্জুনের সুভদ্রা-হরণের সংবাদ দিলেন। ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক অর্থাৎ সমস্ত যাদবরাই অকৃতজ্ঞ অর্জুনের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। সবচেয়ে রেগে গেলেন বলরাম। তিনি ছুটে এলেন কৃষ্ণের কাছে। বললেন—তোর সাকরেদ অর্জুনের কীর্তি শুনেছিস। ছি, ছি! তোর অনুরোধে আমরা যাকে আতিথ্য দান করেছি, সেই কুলপাংশুল এই কাজ করল! সে যে থালায় খেয়েছে, সেই থালা ছিঁদে করেছে।

"কিছুই যেন জানেন না এমনি ভাব মুখে ফুটিয়ে কৃষ্ণ পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কেন। কি করেছে অর্জুন?

"—কি না করেছে সে? সে সমস্ত যদুবংশকে দুঃসহ অপমান করেছে। আমাদের প্রাণাধিক সুভদ্রাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

"—তাই বল। কৃষ্ণ যেন এতক্ষণে বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তিনি কৃত্রিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে গিয়ে অর্জুন তো যদুবংশকে অপমান করে নি।

"—করে নি?

"—না। সে আমাদের বংশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

"—কিভাবে ?

"—প্রথমতঃ সে আমাদের অর্থলোভী মনে করে সুভদ্রার জন্য কনেপণ দেবার প্রস্তাব করে নি। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করার হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তৃতীয়তঃ বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে অক্ষত্রিয়েব মতো কাজ কবে নি।

"—তা সে আমাদের বংশের সম্মান বৃদ্ধি করল কেমন করে ?

"—কুল-শীল বিদ্যা-বুদ্ধি ও বীরত্বে ধনঞ্জয় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র। সে সুভদ্রাকে গ্রহণ করায় যদুবংশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে বৈকি! কাবণ এতে সুভদ্রা যশস্বিনী হবে। তার পুত্র-প্রপৌত্র যে ভবিষ্যৎ ভারতের রাজসিংহাসন পাবে।

"বলরাম আর কোন প্রশ্ন করতে পারেন না। তিনি চুপ করে থাকেন। তাঁকে নীরব দেখে কৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠেন —তাছাড়া কুন্তীভোজের দৌহিত্র মহাবীর অর্জুনকে তোমরা কিই-বা করতে পারো ? মহাদেব ছাড়া আর কে তাকে পরাজিত করতে পারে ? কাজেই তার সঙ্গে আত্মনাশী সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে, প্রফুল্ল মনে এখন তাকে আমাদের অভিনন্দন কবা উচিত।

"বলাবাহুল্য বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণ পার্থসারথির পরামর্শ মেনে নিলেন। তাঁরা সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে সসম্মানে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। মহাসমারোহে তাঁদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল।"

সরকারদা চুপ করেন। আর ঠিক তখুনি কানে আসে, "হেয়াতে আপনাগো কি ? আমাগো জল ছাড়া চলে না। আমরা আপনাগো মতন এ্যাক ঘডি জলে ছয়খান কাপড় ধুইতে পারি না।"

পাঁচু আমার দিকে তাকায়। বলি, "মনে হচ্ছে, ছোটঠাকুরমা চীৎকার করছেন।"

পাঁচু মাথা নাড়ে। বলে, "চলুন তো, দেখে আসি একবার।"

তংড়াতাড়ি ঠাকুরমাদের খোপে আসি। দেখি অমিয়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক ভয়ে প্রায় কম্পমান।

আমাদের, বিশেষ করে ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে ছোটঠাকুরমার

জোর যেন বেড়ে গেল। গলার স্বর আরও চড়িয়ে তিনি পাঁচুকে প্রশ্ন করলেন, "আপনেই কয়েন ম্যানেজারবাবু! আমরা কি আপনার গাড়ির জল নষ্ট করি?"

"না, না। আপনারা তো স্টেশনের জল দিয়েই স্নান ও কাচার কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।"

"তাইলে। উনি আমাগো কাপড কাচা লইয়া খোঁডা দ্যান ক্যান?" বড়ঠাকুরমা অমিয়বাবুকে দেখিয়ে দিলেন।

অমিয়বাবু কি বলেছেন না জেনেই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "না, না এ অমিয়বাবুব অন্যায়, খুবই অন্যায়। না মশাই, কাপড কাচা নিয়ে ঠাকুরমাদেব খোঁটা দেওয়া উচিত হয় নি আপনার। এবারে চলুন, জায়গায় গিয়ে বসবেন।" অমিয়বাবুকে কোন জবাব দেবাব সুযোগ না দিয়েই তাঁকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলি নিজের জায়গায়।

বেচাবী অমিয়বাবু কেবলি বলতে থাকেন, "ঘোষদা! সত্যি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ওঁদের খোঁটা দিই নি। শুধু বলেছি— আপনাদের মতো কাচাকাচি করতে পারলে, আমাকেও এমন ময়লা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেডাতে হত না।"

"কিন্তু একথাটা কি এতই মূল্যবান যে না বললে চলত না।"

"না, মানে···"

"মানে আর কখনও এ ধরনের কথা বলবেন না ওঁদের।"

অমিয়বাবু মাথা নাড়েন। পাঁচুবাবুও সহাস্য মুখে ফিরে আসে একটু বাদে। অনুমান করতে পারছি। সে তার বৃদ্ধা যাত্রীদের শান্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

জায়গায় এসে দেখি বিউটি বসে আছে। সে তার দাদু অর্থাৎ আমার দাদার সঙ্গে গল্প করছে। সহযাত্রীরা অনেকেই বলেন কর্তা-গিন্নী যেমন মিল তেমনি অমিল।

আমি আসতেই বিউটি কিন্তু দাদুর সঙ্গে কথা বন্ধ করে আমাকে বলে বসল, "মামু! আমরা প্রভাস ও সোমনাথে যাচ্ছি কিন্তু সেখানকার কথা যে কিছুই জানি না।"

"কেন সরকারদার কাছে তো আজ শুনলে, সুভদ্রা-হরণ ও মৌষল-

পর্বের কথা। তাছাড়া সেদিন তিনি বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রভাস দর্শনের কথাও বলেছেন।"

"আচ্ছা সেই ঘটনাটি যেন কি?" দাদা মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসলেন।

"আমিও ভুলে গিয়েছি ভাই, বল না একবার।" সত্যেনদা যোগ করে।

হেসে বলি, "তোমরা ভুলে গিয়েছ আর আমার মনে আছে এ ধারণার কারণ?"

"নিশ্চয়ই কিছু আছে।" সত্যেনদা উত্তর দেয়। বলে, "যাক্ গে, এবার সংক্ষেপে পাণ্ডবদের প্রভাস দর্শনের কাহিনীটা বলে ফেল তো ভাই!"

সুতরাং শুরু করতে হয় আমাকে, "পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য অর্জুন তপস্যা করতে চলে গেলেন। তাঁর ভাইরা খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁরা কাম্যবন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন ঠিক করলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি তীর্থপর্যটনের সুফল সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করলেন। বহুশত তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন—নিয়ম মেনে তীর্থ দর্শন করলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়েও বেশি পুণ্যার্জন করা যায়। স্থানীয় ঋষিরা অপেক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আসছেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেড়িয়ে পড়।

"নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে লোমশ মুনির সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বের হলেন। তারা নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও পুরী হয়ে গঙ্গাসাগরে গেলেন। তারপরে কলিঙ্গ ও দ্রাবিড়দেশ দর্শন করে অগস্ত্য ও সুর্পারক প্রভৃতি তীর্থ দেখে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন।

"তাঁদের প্রভাসে আসার খবর পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে সেখানে ছুটে এলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের শীর্ণদেহ ও জীর্ণ পোষাক দেখে যাদবরা খুবই কষ্ট পেলেন।

"বলরাম বললেন—ধর্মাচরণ করলেই মঙ্গল হয় আর অধর্ম করলেই

অমঙ্গল হয়, কথাটা সত্য নয়। নইলে যেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এত কষ্ট পাচ্ছেন, সেখানে অধার্মিক দুর্যোধন রাজত্ব করছে! এ দেখে যদি কেউ ধর্মের চেয়ে অধর্মকে ভাল বলে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। আশ্চর্য! পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও ধৃতরাষ্ট্র কি সুখ পাচ্ছেন জানি না। তবে তাদের ধিক্! আব পাণ্ডবদের এই কষ্ট এবং দুর্যোধনের সুখ দেখে মা বসুন্ধরা যে কেন বিদীর্ণ হচ্ছেন না, তাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

"সাত্যকি ছিলেন যেমন বীর, তেমনি রাগী। বলরাম থামতেই তিনি বলে উঠলেন—বিলাপ করে লাভ নেই কিছু। যুধিষ্ঠির অনুমোদন না করলেও আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। এসো, আজই যুদ্ধযাত্রা করা যাক্। আমরা দুর্যোধনকে হত্যা করে রাজ্য উদ্ধার করব। যুধিষ্ঠির যদি একান্তই প্রতিজ্ঞা পালন করতে চান, করুন। আপাতত অভিমন্যু রাজ্য শাসন করুক। বনবাসের মেয়াদ শেষ হলে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসবেন।

"কৃষ্ণ কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি বললেন —যুধিষ্ঠিরকে আমি যতটা জানি, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, অন্যের বিজিত রাজ্য তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। তাছাড়া তাঁর ভাইরা, এমনকি দ্রৌপদীও স্বধর্ম ত্যাগ করবে বলে আমার মনে হয় না।

"এবারে কথা কললেন যুধিষ্ঠির। বললেন—একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে জানে। রাজ্যের চেয়েও আমার কাছে সত্য বড়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রয়োজন হলে কৃষ্ণই আপনাদের যুদ্ধ করতে বলবে। তখন আপনারা দুর্যোধনকে পরাজিত করে আমাকে সিংহাসন দিতে চান, দেবেন। আমি সানন্দচিত্তে সে সিংহাসন গ্রহণ করব।

"অবশেষে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্যান্য যাদবরা দ্বারকায় ফিরে চললেন। আর পাণ্ডবরা প্রভাস থেকে রওনা হলেন বৈদূর্য পর্বতের দিকে।"

বিউটি এতক্ষণ চুপ করে শুনেছে। এবারে কথা বলে, "এতো আপনি সবই সেকালের কথা বললেন মামু! আমি একালের কথা শুনতে চাইছি।"

আমি কোন উত্তর দিতে পারার আগেই ম্যানেজার সুপারিশ করে, "প্রস্তাবটা মন্দ নয় ঘোষদা! ভেরাভল পৌঁছতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাকী। এর মধ্যে আপনি প্রভাস ও সোমনাথের একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে পারবেন।"

আমি ম্যানেজারের দিকে তাকাই। সে মৃদু হেসে আবার বলে, "বিউটি ঠিক মানুষটিকেই ধরেছে। আপনি অনায়াসে তাঁর কৌতূহল মেটাতে পারেন।"

শঙ্কিত হয়ে উঠি। ম্যানেজার আমার প্রকৃত পরিচয় জানে। সে যেমন কাজের মানুষ, তেমনি চালাক চতুর। আমার ডায়েরী লেখা, ছবি তোলা এবং সর্বোপরি আমার কাছে শঙ্কু মহারাজের বই দেখে, সে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিল। তাই সুযোগ পেয়ে পরশুদিন দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে কথাটা স্বীকার করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে। অবশ্য সে-ও প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার প্রকৃত পরিচয় সহযাত্রীদের কাছে প্রকাশ করবে না।

তাহলেও আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করি, "প্রভাস ভারতের প্রাচীনতম নগরীগুলির অন্যতম। সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত এই জনপদ এখন গুজরাতের জুনাগড় জেলার অন্তর্গত। ২০°১৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭০°২৪´ পূর্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই বন্দর-নগরীর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং স্বাস্থ্যকর। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বর্তমান প্রভাস তথা পাটন শহরের আয়তন ৩১'৮৬ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৬,৭৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮,১৯৭ আর পুরুষ ৮,৫৫২ জন। তাঁরা ২,৮০১ টি বাড়িতে ২,৮৪১ টি পরিবারে বিভক্ত।"

"আচ্ছা মামু! এই ট্রেন তো আমাদের ভেরাভল নিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রভাস কতদূর?"

"আট কিলোমিটারের মতো।"

"স্টেশন থেকে আমাদের বোধহয় টাঙ্গা করতে হবে?"

"হ্যাঁ।" ম্যানেজার মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "তুমি যখন ভেরাভলের কথা তুললে, তখন ভেরাভল

থেকেই বলতে শুরু করছি।"

"হ্যাঁ। তাই ভাল।" বিউটি বেণী দুলিয়ে মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি, "ভেরাভলের কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই দ্বারকা প্রভাস কিংবা সোমনাথের মতো। কিছুকাল আগেও সে ছিল একটি অনুন্নত গ্রাম। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা এবং অবস্থানের জন্য ভেরাভল আজ পশ্চিম ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর।

"মাছ রপ্তানীর জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। উপকূলবাহী জাহাজ তৈরির একটি কারখানা সহ সেখানে এখন বহু কল-কারখানা আছে। পর্যটকদের জন্য ভেরাভলে রয়েছে রাজেন্দ্রভবন গেষ্ট হাউস এবং নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভেরাভল শহরের জনসংখ্যা ৫৮,৭৭১ জন। তাদের মধ্যে নর ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০,২০৬ এবং ২৮,৫৬৫ জন। তারা ৯,৮২৪ টি পরিবারে ৯,৪৬৬ টি বাড়িতে বাস করছেন।

"ভেরাভলের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রভাস পেছিয়ে পড়েছে। অথচ কিছুকাল আগেও প্রভাসই ছিল স্থানীয় তালুকের সদর। এখন ভেরাভল শুধু প্রভাসের স্থান নেয় নি, সেই সঙ্গে সেখানে গঠিত হয়েছে পৌরসভা। আর প্রভাস প্রায় একটি গ্রামে পরিণত।"

"গ্রাম!" বিউটি যেন চমকে ওঠে।

"হ্যাঁ, মা! কৃষ্ণ-বলরামের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পুণ্যতীর্থ-প্রভাস এখন প্রায় একটি গ্রাম। সেকালে প্রভাস ছিল সুবিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে, আর একালে তার আয়তন মাত্র ৫৮·২ বর্গ কিলোমিটার, তাও জনবিরল।"

"শুনেছি সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীর একটি ভগ্ন দুর্গ আছে?" দাদা প্রশ্ন করেন এবারে।

ম্যানেজার জবাব দেয়, "হ্যাঁ। সেই দুর্গপ্রাকার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই এখন কেবল প্রভাস নামে পরিচিত।"

"আচ্ছা মামু! প্রভাসের এই পতনের কারণ কি?"

"নিঃসন্দেহে মুসলমান আক্রমণ। তুমি জানো যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান আমীর মাহ্‌মুদের সেই সোমনাথ আক্রমণ থেকে

আরম্ভ করে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের আক্রমণ পর্যন্ত প্রভাস প্রায় প্রত্যেক যুগে ধর্মান্ধতার শিকার হয়েছে।"

"কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই তো এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলে প্রভাস আজও এমন অনুন্নত কেন?"

"ব্রিটিশরা প্রভাসের চেয়ে ভেরাভলের দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন, কারণ ব্যবসায়ীর বিচারে ভেরাভলের অবস্থান তাঁদের কাছে সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে প্রভাসের উল্লেখ থাকলেও বলা হয়েছে—'a gloomy place, a city of graves and ruins.'"

"তাই বলুন।" বিউটি আবার সবেগে মাথা নাড়ে। এবারে বেণীর সঙ্গে তার কানের ঝুমকো দুটিও দুলে ওঠে। আমার মনে পড়ে শ্রীর কথা। তারও কানে অমনি দুটি দুল আছে। মাথা নাড়লে সে-দুটিও দুলে ওঠে।

বিউটি আমাকে মামু ডাকছে। এই ডাকটি শ্রীর। কলকাতা থেকে দিল্লী আসার পথে প্রথম পরিচয়ের পরে সে ই প্রথম আমাকে মামু বলে ডাক দিয়েছিল।

জানি না সে এখন কোথায়, কিভাবে আছে? কেমন আছে? তাকে আবু-রোডে ফেলে রেখে আমি স্বার্থপরের মতো তীর্থ দর্শন করে চলেছি।

আমার নীরবতা বোধহয় সহ্য হয় না বিউটির। সে বলে ওঠে, "ওকি! চুপ করে আছেন কেন? বলুন না প্রভাসের কথা।"

বাধ্য হয়ে আবার শুরু করতে হয়, "পুরাকালে প্রভাসের নাম ছিল নাগরাপুর। নাগরাদিত্য-সূর্যমন্দির কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই জনপদ। আজও সে মন্দির রয়েছে আর সেখানেই খনন করে প্রাক-বৈদিকযুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

"অনার্য আমল থেকেই প্রভাস একটি প্রখ্যাত বন্দর—ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। তখন প্রভাস-বন্দর থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও অন্যান্য আরব দেশের

বিভিন্ন বন্দরে নিয়মিত জাহাজ যাতায়াত করত।

"প্রাক-আর্যযুগে প্রভাসের নাম ছিল 'মিন্নুর'। দ্রাবিড় ভাষায় এই শব্দটির অর্থ অত্যুজ্জ্বল। পরবর্তীকালে আর্যরা বোধকরি নূতন নাম রাখার সময়ে এই নামটিকে মনে করে থাকবেন। কারণ সংস্কৃত 'প্রভাস' শব্দের অর্থও অত্যুজ্জ্বল।

"এই নামকরণের একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও রয়েছে। প্রভাস সমুদ্রসৈকতের এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যেটি সূর্যকিরণে ও চন্দ্রালোকে চারিপাশের সমস্ত জায়গা থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

"সূর্যবংশীয় আর্যরাই প্রথম প্রভাসে আসেন। তাঁরা সম্ভবতঃ প্রভাস-সৈকতে অবতরণ করেন। স্থানীয় অনার্যদের ওপরে তাঁরা সহজেই নিজেদের অধিকার কায়েম করলেন। তাঁরা প্রভাসেব নাম রাখলেন—ভাস্করতীর্থ বা অর্কতীর্থ।

"সূর্যবংশীযদের পরে চন্দ্রবংশীয় আর্যরা প্রভাসে এলেন। তাঁরা এই রমণীয় স্থানের নাম রাখলেন সোমতীর্থ। নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সূর্যবংশীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। সংঘর্ষ চলল বেশ কিছুকাল ধরে কিন্তু জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হল না। ফলে সন্ধি হল। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে থাকল। তাঁরা মিলিত হলেন। সেই মিলনের প্রতীক স্বরূপ তাঁরা এই মনোরম নিকেতনের নতুন নাম রাখলেন প্রভাস—পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।

"মহাভারত রচিত হবার অনেক আগেই প্রভাস পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। বৈদিকযুগে সর্বজ্ঞ ঋষিরা প্রভাসে এসে যাগ-যজ্ঞ করতেন এবং শিষ্যদের বেদশিক্ষা দিতেন। তাঁদের যজ্ঞের হোমাগ্নিশিখায় প্রভাসের আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হত। সরস্বতী হিরণ্য ও কপিলা প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর পুণ্যপ্রবাহে প্রভাস প্রতিনিয়ত বিধৌত হত। প্রভাস তখন সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। সর্বদা ফুল-ফল দুধ ও মধুতে মনোহর। তাই পাণ্ডবরা তীর্থদর্শনে বেরিয়ে প্রভাসে এসেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসকেই তাঁর প্রয়াণতীর্থ রূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

"স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, এখানে অবগাহন ও সোমনাথের তপস্যা করে চন্দ্র তাঁর হারানো দীপ্তি ফিরে পেয়েছিলেন বলে এই পুণ্যতীর্থের

নাম হয়েছে প্রভাস।..."

"গল্পটা একটু বলুন না ঘোষদা।" কল্পনাদি বাধা দিলেন আমাকে।

বলি, "চন্দ্র ও রোহিণীর কাহিনী পরে হবে। এখন যেকথা বলছিলাম, তাই শুনুন।"

মনে মনে হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হলেন কল্পনাদি, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন না। তিনি চুপ করে থাকেন।

আমি আবার শুরু করি, "স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে বলা হয়েছে, প্রভাস নামে পরিচিত হবার আগে এই পুণ্যতীর্থ বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন বিভিন্ন নামে অবহিত হয়েছে যেমন—প্রমোদ, নন্দন, শিব, উগ্র, ভদ্রীক, বৈশ্বরূপ, মোক্ষমার্গ ও সুদর্শন প্রভৃতি। স্কন্দপুরাণে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে পরবর্তীকালে প্রভাসের নাম হবে উৎপলাবর্ত। বলা বাহুল্য সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি। আর স্কন্দপুরাণ ছাড়া অন্য কোথাও এসব নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতে অবশ্য ভাস্বরতীর্থ, অর্কতীর্থ, সোমতীর্থ, হিরণ্যসার ও আনর্তসার নাম কয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও প্রাচীন জৈনগ্রন্থে প্রভাসকে বলা হয়েছে চন্দ্র-প্রভাস। এছাড়া প্রভাসে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপিতেও বিভিন্ন নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। যেমন—১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে লেখা আছে সোমপুর, ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে হরনগর ও শিবনগর। ১২৬৪, ১২৭২ ও ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে যথাক্রমে ভিলভিলপুর পাট্টন, সুরপাট্টন ও সোমনাথপুর। আর স্থানীয়দের কাছে প্রভাসের প্রাচীন জনপ্রিয় নাম হল—সোরাঠী সোমনাথ পাট্টন, ভেরাভল পাট্টন, প্রাচী পাট্টন ও প্রাচীন পাট্টন।"

"এযে শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রভাসেরও অষ্টোত্তর শতনাম হয়ে গেল রে ভাই।" আমি থামতেই সত্যেনদা সহাস্যে মন্তব্য করেন।

"তা বলতে পারো। তবে এখনও সব নাম বলা হয় নি আমার।"

"থাক্ ভাই তোমার আর নামের দরকার নেই ভাই। যা বলেছো, তাতেই আমাদের দিব্যি চলে যাবে। এবারে প্রভাসের অন্য কথা বলো।" এবার দাদা মুখ খোলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী সহযাত্রীদের

হাসির উদ্রেক করে।

আমি আবার শুরু করি, "মহাভারতে বনপর্বের ৮১ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের কাছে প্রভাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন —প্রভাস সর্বোত্তম তীর্থ। সেখানে দেবতাদের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান হুতাশন সর্বদা সন্নিহিত আছেন। প্রভাসে স্নান করলে মানুষ অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রির ফললাভ করে, সরস্বতী-সাগরসঙ্গম দর্শন করলে সহস্র গোদানের ফলভাগী হয়।' সে অগ্নির মতো দীপ্তিশালী হয়ে স্বর্গলোকে গমন করতে পারে। প্রভাসে স্নান তর্পণ ও তিনরাত বাস করলে মানুষ চন্দ্রের মতো প্রভাবশালী হয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।

"শুধু মহাভারত কিংবা স্কন্দপুরাণ নয়, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও জ্ঞান-সংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণেও প্রভাসের পুণ্যকীর্তন করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ পরিশিষ্টে সোমনাথ ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। জ্ঞানসংহিতায় বলা হয়েছে, শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে দক্ষের অভিশাপ ও চন্দ্রের শাপমুক্তির কাহিনী রয়েছে।"

"এ কাহিনী তো মহাভারতেও আছে?" দাদা প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। মহাভারতে' শল্যপর্বের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ভগবান তারাপতি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার পরে প্রভাসে স্নান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন, তাই প্রভাস বলরামের বড়ই প্রিয় ছিল।"

"আচ্ছা, স্কন্দপুরাণ ছাড়া অন্য কোন্ কোন্ পুরাণে প্রভাসের উল্লেখ আছে?"

"শুধু উল্লেখ নয়, বামনপুরাণ পদ্মপুরাণ কূর্মপুরাণ গরুড়পুরাণ ভবিষ্যপুরাণ মৎস্যপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রভাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হয়েছে। তবে এই সব পুরাণে প্রভাসের বিবরণ স্কন্দপুরাণের মতো বিশদ নয়। আপনারা জানেন যে প্রভাসের ওপরে স্কন্দপুরাণের একটি পৃথক খণ্ড রয়েছে।..."

"হ্যাঁ, প্রভাসখণ্ড।" দাদা বলে ওঠেন।

"এই প্রভাসখণ্ডটি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে

বিরচিত। পুরাণে আমরা তৎকালীন প্রভাসের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে সেখানকার গাছপালা ও প্রাণীদের বর্ণনা পর্যন্ত পাই। সুপণ্ডিত পুরাণকার এক গ্রন্থে প্রভাসের সীমা নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন—তখনকার প্রভাসেব উত্তরে ভদ্রানদী, পুবে তুলসীশ্যাম, দক্ষিণে সাগব ও পশ্চিমে মাধবপুর অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ প্রভাসখণ্ডে দ্বাবকা এবং গির্ণারকেও প্রভাসক্ষেত্রেব অন্তর্গত বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে সোমনাথে আদিজ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাব কাহিনীব বর্ণনাও আছে। অর্থাৎ প্রভসখণ্ড রচিত হবাব আগেই এখানে আয ও অনার্যদের মধ্যে একটা সান্ধ হয়ে গিযেছিল। আযরা তখন অনায-ঈশ্বব শিবকে দেবতা বলে মেনে নিযেছেন।"

"কিন্তু স্কন্দপুবাণ সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে বচিত একথা বলছ কেন?" সত্যেনদা প্রশ্ন কবেন।

"বলছি কাবণ যদিও মহাবাজ স্কন্দগুপ্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্কন্দপুবাণ সম্পূর্ণ কবাব আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিকদের ধারণা প্রভাসখণ্ডটি শেষ কবতে দু-তিন শ' বছর লেগেছিল।"

"তাহলে আমবা প্রভাসখণ্ডে প্রভাসেব যে বর্ণনা পাই সেটি পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীব?"

"তা বলতে পাবেন।"

"বেশ। কি বলছিলে বল এবাবে।" সত্যেনদা আমাকে বলে।

হেসে জিজ্ঞেস কবি, "আব কি বলব? সবই তো বলেছি। এবারে তৈরি হয়ে নাও। ভেবাভল এসে গেল।"

ঘড়িব দিকে নজর দিয়ে ম্যানেজার জানায়, "না। এখনও আধ-ঘণ্টা লাগবে।"

বিউটি কথা বলে এতক্ষণে, "কিন্তু মামু! আপনি তো চন্দ্রেব গল্পটা বললেন না?"

"নাও। ঠেলা সামলাও এখন। বুঝলে ভাই, আমার গিন্নীকে ঠকানো [illegible]তে সহজ নয়!" দাদা হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন।

"দাদু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" বিউটি গম্ভীর স্বরে দাদাকে সাবধান করে।

"কেন ?" দাদা হাসছেন।

"আপনি ভারী অসভ্য হয়েছেন।"

এবারে দাদার সঙ্গে আমরাও হেসে উঠি। বিউটি উঠে দাঁড়ায়।

তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলি, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন ? দাদা তো ঠাট্টা করেছেন। বেশ বোসো, আমি তারাপতি চন্দ্রের কাহিনী বলছি।"

বিউটি শান্ত হয়। আমি বলতে শুরু করি, "পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর সাতাশটি মেয়েকেই তারাপতি চন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে রোহিণী ছিলেন সবচেয়ে স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। ফলে চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অন্যান্য দক্ষতনয়াদের অবজ্ঞা করে কেবল রোহিণীর সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ করতে থাকলেন, একা তাঁকে নিয়েই মেতে রইলেন।

"চন্দ্রের অন্যান্য স্ত্রীরা ছুটে গেলেন দক্ষের কাছে। তাঁরা স্বামীর বিরুদ্ধে পিতার কাছে নালিশ করলেন।

"দক্ষ মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রের কাছে এলেন। তিনি জামাইকে সাবধান করলেন—তুমি প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান ভালোবাসো। নইলে তোমার ঘোর অধর্ম হবে।

"চন্দ্র তখনকার মতো রাজী হলেন। সন্তুষ্ট দক্ষ বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু চন্দ্র তখনও রোহিণীর মোহে অন্ধ। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না।

"মেয়েরা আবার গেলেন বাবার কাছে। দক্ষ আবার তাঁদের নিয়ে চন্দ্রের কাছে এলেন। তাঁকে বললেন—তুমি কিন্তু অন্যায় করছ। তুমি যদি তোমার প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান ভাবে ভালো না বাসো, তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। তুমি জানো যে আমার অভিশাপ মিথ্যে হবার নয়।

"চন্দ্র নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। শ্বশুরকে বললেন—আর এমনটি হবে না। এখন থেকে আমি সব স্ত্রীকে সমান ভালবাসব।

"কিন্তু চন্দ্রের তখনও রোহিণীর নেশা কাটে নি। তিনি এবারেও অন্যান্য স্ত্রীদের অবজ্ঞা করলেন।

"মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন বাবার কাছে। তাঁকে বললেন—চন্দ্র আমাদের ঘরে নিতে নারাজ। আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য করে সে রোহিণীকে নিয়েই মেতে রয়েছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

"ক্রুদ্ধ দক্ষ তখন যক্ষ্মার সৃষ্টি করলেন। তাঁর আদেশে যক্ষ্মা গিয়ে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। চন্দ্রকিরণ স্তিমিত থেকে স্তিমিততর হতে থাকল।

"রোগমুক্তির জন্য চন্দ্র নানা যাগ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কোন ফল হল না। তাঁর কিরণ স্তিমিত হয়ে গেল। নিস্তেজ চন্দ্র মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকলেন।

"দেবতারা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। তিনি তাঁদের কাছে নিজের পাপের কথা কবুল করলেন। বললেন, প্রজাপতি দক্ষের দেওয়া অভিশাপের কথা।

"দেবতারা দক্ষের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন—চন্দ্র স্তিমিত হয়ে পড়ায় জগতের যাবতীয় ঔষধি লতা, ফুল-ফল ও বীজ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ক্ষয়রোগ বিশ্বসংসারকে ক্ষয় করে ফেলছে। আপনি তাঁকে শাপমুক্ত করুন।

"দক্ষ বললেন—আমার অভিশাপ মিথ্যে হবার নয়। তবে সে যদি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হয়, তাহলে আংশিক রোগ-মুক্ত হতে পারে।

"—কি করতে হবে তাঁকে। দেবতারা জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রজাপতি দক্ষ তখন দেবতাদের নির্দেশ দিলেন—তোমরা চন্দ্রকে গিয়ে বল, সে প্রথমে ভাস্করতীর্থে গিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গের আরাধনা করে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিজের কামান্ধতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তারপরে সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে স্নান করে তার প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান প্রীতি প্রদর্শন করুক।

"—তাহলেই কি তিনি সম্পূর্ণ ক্ষয়মুক্ত হবেন? দেবতারা প্রজাপতি দক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন।

"তিনি উত্তর দিলেন—না। চন্দ্র আর কখনো সম্পূর্ণ ক্ষয়মুক্ত হবে না। তবে আমার পরামর্শ মতো কাজ করলে চন্দ্রের পনেরো দিন করে

ক্ষয় এবং পনেরো দিন করে শ্রীবৃদ্ধি লাভ ঘটবে। আর তার ফলে পৃথিবীতে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের সৃষ্টি হবে।

"দেবতাদের পরামর্শে চন্দ্র তখন রোহিণীকে সঙ্গে করে সারস্বত-তীর্থে এলেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি সোমনাথের করুণা প্রার্থনা করলেন। তারপরে চন্দ্র ও রোহিণী সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন।

"চন্দ্রের অন্যান্য স্ত্রীরাও তখন পিতার পরামর্শে সেখানে এসেছিলেন। স্নান শেষে তীরে উঠে চন্দ্র তাঁদের সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন, রোহিণী তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ক্ষয়মুক্তি আরম্ভ হল। অমাবস্যার অন্ধকার দূর হয়ে পৃথিবী আবার চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সেদিন থেকেই সারস্বততীর্থের নাম হল প্রভাস—পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।"

॥ ছয় ॥

সহযাত্রীরা স্নান ও তর্পণের জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়েই বসেছিলেন। এবারে ভেরাভল আসতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। এত তাড়াহুড়া করার কোন দরকার ছিল না। সোমনাথ মেল তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। গাড়ি ছেড়ে দেবার কোন ভয় নেই।

তাহলেও আমার সহযাত্রীরা তাড়াহুড়া করছেন। কারণ একে তাঁরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের দ্বারদেশে উপস্থিত, তার ওপরে ট্রেন প্রায় ঘণ্টাখানেক 'লেট'। ভক্তের মন তাই দেবদর্শনের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেও তাঁদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। 'একটু দাঁড়ান' বলে ম্যানেজার সেই যে গিয়ে স্টেশন-মাস্টারের ঘরে ঢুকেছে আর বেরুবার নামটি করছে না। সে নিশ্চয়ই অকারণে বসে নেই। সেখানে তার যে এখন অনেক কাজ—গাড়ি কাটানো ও পরিষ্কার করানো, আলো ও পাখা সারানো, ট্যাঙ্কে জল ভরানো এবং প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা।

সহযাত্রীরা সবাই এ-সব কথা জানেন। তবু তাঁরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন। কি করবেন, পুণ্যার্থী মন কি পুণ্যতীর্থের দ্বারে পৌঁছে প্রতীক্ষা সইতে পারে?

তবে মজার ব্যাপার। সবচেয়ে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন উকিলবাবু, যিনি কখনও দেব-দর্শন করেন না। তিনি মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন, ভেতরে প্রবেশ করেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

অথচ তিনিই কর্কশ কণ্ঠে আমাকে বলে উঠলেন, "যান তো মশাই! ভেতরে গিয়ে একবার ম্যানেজারকে মনে করিয়ে দিন, আমরা এখানে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছি।"

অমিয়বাবু কানে কম শুনলেও উকিলবাবুর বক্তব্য তার কর্ণগোচর হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "ম্যানেজারবাবু কি রেলবাবুদের আড্ডায় বসে গেলেন?"

কি উত্তর দেব? স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতরে বসে ম্যানেজার কি করছে, দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে বিস্মিত হচ্ছি উকিলবাবু ও অমিয়বাবুদের কথা ভেবে। এতদিন ধরে পাঁচুবাবুকে দেখেও তাঁরা তাকে চিনতে পারলেন না। সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে। অযথা আড্ডা দেবার মানুষ পাঁচুগোপাল দে নয়।

তাহলেও বলার কিছু নেই। পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হলে এ-সব কথা শুনতেই হয়। সুতরাং চুপ করে থাকি।

এবারে দিদি কথা বলেন। দিদি মানে শ্রীমতী সুরমা কুণ্ডু। না, কুণ্ডু স্পেশালের মালিকদের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তা আছে বলে জানা নেই আমার। স্নেহশীলা ও ধর্মপরায়ণা এই ভদ্রমহিলাকে আমি প্রথম থেকেই দিদি বলে ডাকছি। তিনি বালবিধবা এবং নিঃসন্তান। ভাইদের সংসারে আছেন। কিশোর ভাইপো সৌম্যকান্তি তাঁর বর্তমান জীবনের প্রধান অবলম্বন। তীর্থদর্শন ছাড়া তিনি তাকে ফেলে কোথাও বের হন না। তীর্থ করতে এসেও ভাইপোকে ভুলতে পারছেন না। তাই প্রতি তীর্থে তার জন্য কিছু কেনা-কাটা করতেই হয় তাঁকে।

সেই কথাই দিদি বলেন আমাকে, "ম্যানেজারবাবুর খুব দেরি হলে, চল আমরা একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়ি। আমার যে আবার একবার বাজারে যেতে হবে।"

হেসে বলি, "দিদি! এখানকার বাজার-মন্দির সবই যে আমার অজানা। ম্যানেজার সঙ্গে না থাকলে তো আপনি কেনা-কাটা করতে পারবেন না।"

"তাহলে একবার ভেতরে গিয়ে দেখো না, ম্যানেজারবাবুর এত দেরি হচ্ছে কেন?"

না, আর তা দেখবার দরকার হয় না। ম্যানেজার বেরিয়ে আসে বাইরে। জিজ্ঞেস করে, "আপনারা সবাই 'রেডী'?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সরকারদা উত্তর দেন, "এবারে আপনি 'গো' বললেই ছুট দিতে পারি।"

ম্যানেজার মৃদু হাসে। সে মতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেয়। ঠাকুর ও অন্যান্য তিনজন কর্মচারীর সঙ্গে মতি গাড়িতে থাকবে। বাজার ও রান্নার ব্যবস্থা করবে।

মতি গাড়িতে ফিরে যায়। ম্যানেজার বাণেশ্বরকে বলে, "টাঙ্গা-ওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"আজ্ঞে।"

"সব দেখিয়ে দেবে, কত করে চাইছে?"

"আঠারো টাকা, তার মানে জনপ্রতি তিন টাকা।"

"ঠিক আছে। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যা।"

"ক'খানা টাঙ্গা নেব বাবু?"

একটু ভেবে নিয়ে ম্যানেজার উত্তর দেয়, "ছ'খানা।"

মতি মাথা নেড়ে এগিয়ে যায়, আমরা তাকে অনুসরণ করি।

শঙ্করীদের আবু রোডে ফেলে আসার পর থেকে আমরা একত্রিশ-জন যাত্রী রয়েছি গাড়িতে। ম্যানেজার ও বাণেশ্বরকে নিয়ে এখন তেত্রিশজন প্রভাসে চলেছি। কিন্তু ম্যানেজার ছ'টা টাঙ্গা নিয়েছে। একটি টাঙ্গায় ছ'জন যেতে পারে। অর্থাৎ ছত্রিশজনের জায়গায় আমরা তেত্রিশজন যাবো। তিনজনের বাড়তি জায়গাটুকু ম্যানেজার

নিশ্চয়ই মিসেস উকিলের জন্য বরাদ্দ করেছে। ঠিকই করেছে, কারণ তিনি তার বিপুলা বপু নিয়ে যে টাঙ্গায় সামিল হবেন, সেটিতে বড়-জোর আর জনদুয়েক যাত্রা বইতে পারবে ঘোড়াটি। বলা বহুল্য সেই দু'জনের একজন উকিলবাবু এবং অপরজন স্বয়ং ম্যানেজার।

পৌনে দুটো নাগাদ টাঙ্গার শোভাযাত্রা শুরু হল। আমরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পথে রওনা হলাম। ভেরাভল থেকে প্রভাস পাঁচ মাইল। এখন ভেরাভল ও প্রভাস পৃথক শহর। সেকালে ভেরাভল পর্যন্ত প্রভাসের সীমা বিস্তৃত ছিল। একালে কাথিওয়াড় উপদ্বীপে দক্ষিণ-উপকূলের প্রায় পুরো পশ্চিমাংশই হল ভেরাভল। কেবল তার পূব প্রান্তটি প্রভাস ও সোমনাথ নামে পরিচিত।

শহরের পথ ধরে দক্ষিণ-পূবে এগিয়ে চলেছে টাঙ্গা। প্রথমেই পথের ডানদিকে কেল্লা পেরিয়ে এলাম। তারপরেই শুরু হল বন্দর এলাকা।

পর পর দুটি রেল-লাইন পেরিয়ে এলাম। পথের পাশে প্রচুর নারকেল গাছ। এ অঞ্চলটা দ্বারকা কিংবা ওখার মতো রুক্ষ এবং বালিময় নয়। ভেরাভল আসার পথেই লাইনের দু'পাশে ক্ষেত-খামার ও সারি সারি কলাগাছ দেখেছি।

'ভেরাভল টেক্সটাইল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিলস' ছাড়িয়ে এলাম। তারপরেই বাঁদিকে সাসানগিরের মোটরপথ চলে গেল। মনটা আবার ভারী হয়ে ওঠে। সাসানগির এখান থেকে মাত্র ২৭ মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করছে। তবু এ-যাত্রায় আমার গির জঙ্গলে যাওয়া হল না, দেখা হল না ভারতের পশু-রাজপরিবারকে।

একটা বিশ্রী গন্ধে বিচলিত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি নস্যি নিই। কিন্তু নস্যির সাধ্য কি আমার নাসিকাদ্বয়কে এই উৎকট উগ্রগন্ধের কবল থেকে রক্ষা করে।

ম্যানেজার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "ঘোষদা, বলুন তো কিসের গন্ধ ?"

"মনে হচ্ছে শুঁটকী মাছের !"

"ঠিকই ধরেছেন ! ভেরাভল যে মাছ রপ্তানীর একটি বড় বন্দর।"

শুনেছি রান্না করার পরে শুঁটকী মাছ খুব ইউপাদেয়। কিন্তু সুযোগ পেয়েও আমি তা আস্বাদন করতে পারি নি। কারণ এই গন্ধটির কথা মনে পড়লেই আমার রসনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কিন্তু না। পুণ্যতীর্থের দ্বারে পৌঁছে আর যাই হোক্, শুঁটকী মাছের ভাবনায় সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। তার চেয়ে প্রভাসের কথাই ভাবা যাক্—পুরাণ নয়, ইতিহাসের প্রভাস।

যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পরে প্রভাসের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। তার অনেক পরে খ্রীষ্টপূব চতুর্থ শতকে প্রভাস মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ‍ক্ত হয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬—৩০২) মন্ত্রী মহাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার (চাণক্য) পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভবতঃ প্রভাসে জ্যোতির্লিঙ্গ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই প্রথম বড় মন্দির নির্মাণ করে চন্দ্রনাথের প্রতিশব্দ রূপে লিঙ্গমূর্তির নাম রাখেন সোমনাথ।

তবে চাণক্যের আগেও এখানে অনেক মন্দির ছিল। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৯ অব্দে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চাণক্য প্রভাসের বিষ্ণু, শিব, ভৈরব, বরুণ, মহাদেবী, গণেশ ও যম প্রভৃতির মন্দির সংস্কার করেন। অনেকের মতে প্রভাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জনপদ। তাঁরা বলেন, ২৬০০ বছর আগে সোমরাজা সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকেই সোমযজ্ঞ আরম্ভ হয়।

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই দূরদর্শী চাণক্য সেদিন বিষ্ণুতীর্থকে শৈবতীর্থের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে লিঙ্গপূজাকে কেন্দ্র করে আর্য ও অনার্যদের মাঝে মিলন ঘটবে। ফলে অনার্যদের মাঝে, বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণের প্রাবল্য হ্রাস পাবে। তিনি জানতেন শৈবধর্মের সারল্য যেমন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবে, তেমনি সোমনাথকে করে তুলবে জনপ্রিয়।

দূরদর্শী চাণক্যের সেই পরিকল্পনা বিফল হয় নি। সোমনাথকে কেন্দ্র করে বিস্মৃতপ্রায় প্রভাসের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদল সোমনাথে আসতে শুরু করেন।

প্রভাস আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আর তখন থেকে সোমনাথ ও প্রভাসের একই ইতিহাস। সে ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি বিষাদের। কিন্তু ইতিহাস ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং আনন্দ ও বেদনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে প্রভাসের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রভাস শক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১২৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শক সম্রাট নাহপানকে (Nahpan) পরাজিত করে এ-অঞ্চল অধিকার করেন। নাহপান বৈদিকধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু একটি তারিখশূন্য শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তার জামাই উষবদত্ত তীর্থদর্শনে প্রভাস এসেছিলেন। এটি এখন পর্যন্ত প্রভাসে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি।

শক ও কুশান সাম্রাজ্যের পতনের পরে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্তবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। গুপ্তরাজারা সৌরাষ্ট্র অধিকার করে জীর্ণাদূর্গ বা জুনাগড়ে তাঁদের আঞ্চলিক রাজধানী স্থাপন করেন।

গুপ্তযুগ (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক) ভারতের স্বর্ণযুগ। গুপ্তরাজাদের আমলে প্রভাসেরও প্রভূত উন্নতি হয়। পণ্ডিতরা মনে করেন—গুপ্তযুগেই এখানে দৈত্যসূদন-মহাবিষ্ণু, চক্রধর-বিষ্ণু ও আদিনারায়ণ হরির মন্দির নির্মিত হয়। শুধু তাই নয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আদেশে স্কন্দপুরাণের সঙ্কলন শুরু হয়। আর তারই ফলে আমরা পেয়েছি প্রভাসখণ্ড।

৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের পরলোক গমনের পরে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে গুপ্তরাজাদের স্থানীয় প্রতিনিধি সেনাপতি ভট্টার্ক সৌরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বল্লভীপুরকে রাজধানী করে সৌরাষ্ট্র শাসন করতে থাকলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশই বিখ্যাত বল্লভী রাজবংশ। এই রাজবংশ ৭১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে সৌরাষ্ট্র শাসন করেছে। বল্লভীরা সূর্যসাধক ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে প্রভাসে ষোলটি সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল।

৭১১ থেকে ৭২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিন্ধুর আরব সেনাপতি জুনাইদ বল্লভীপুর আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে বল্লভীরাজ সপ্তম শিলাদিত্য শহীদ হন এবং বল্লভীপুর ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে বলেন, প্রভাস সে ধ্বংসলীলার কবলে পড়ে নি। আবার অনেকের মতে কাঠের তৈরি সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি তখনই ধ্বংস হয়ে যায়। বল্লভী রাজত্বকালে চাওড়া বংশীয় সামন্তরা রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রভাস শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন যেমন ধার্মিক, তেমনি সত্যাশ্রয়ী। এই বংশের জনৈক সামন্তের নাম ছিল যোগরাজ। তাঁর শাসনকালে একজন বণিক যখন প্রভাস বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করেছিলেন, তখন যোগরাজের দুর্বিনীত পুত্র সেই বণিকের একহাজার ঘোড়া ও দেড়শ' হাতি লুঠ করে। সত্যাশ্রয়ী যোগরাজ লজ্জায় ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করেন।

বল্লভীপুর ধ্বংস হয়ে যাবার পরে চাওড়া সামন্তরাই প্রভাসের প্রকৃত শাসক হলেন। তাঁরা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রভাস শাসন করেছেন। আর এই সময় চতুর্থ মন্দির তৈরি হয় এবং শুরু হয় সোমনাথের সুবর্ণযুগ। তখুনি প্রভাস-যাত্রা সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজা-মহারাজারা এই পুণ্যতীর্থে আসতে থাকেন। তাঁরা সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা দিয়ে সোমনাথের মন্দিরকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এবং পুণ্যার্থীদের এই প্রবাহ বন্ধ হয় না।

৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজরাজ নাগভট্ট প্রভাসে আসেন। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চেদীরাজ লক্ষ্মণ এবং সিলহার-রাজ অনন্তদেও সোমনাথ দর্শনে আসেন। এঁরা প্রত্যেকে সোমনাথের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন।

চন্দ্রচূড় নামে জনৈক যাদব নরপতি বানথালি রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রপৌত্র গ্রহ রিপু প্রভাসে আধিপত্য স্থাপন করেন। অহিলপুরের রাজা মূলরাজকে তিনি প্রভাস দর্শনের অনুমতি দেন না। মূলরাজ ছিলেন সোমনাথের উপাসক। তিনি রিপুর এই অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করলেন না। সোমনাথ দর্শনের মানসে তিনি সসৈন্যে প্রভাসের পথে বেরিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত ৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক

প্রবলযুদ্ধে রিপুকে পরাজিত করে প্রভাসে প্রবেশ করেন। রিপুর চেয়ে তাঁর সৈন্যবল অনেক কম ছিল। কেবল সোমনাথের কৃপাতেই তিনি নাকি সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

তারপরেই সেই অভিশপ্ত ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ। শুধু সোমনাথ নয়, কেবল সেকালের নয়, হাজার বছর পরেও সেটি আজ সারা ভারতের অভিশাপ হয়ে রয়েছে।

দশম শতাব্দীর শুরু থেকেই সোমনাথের ঐশ্বর্যের কথা দেশ ও বিদেশে রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ প্রভাস তখন শুধু পুণ্যতীর্থ ছিল না, ছিল পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। গজনীর ধনলোভী ও নিষ্ঠুর সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথের ঐশ্বর্যের কথা শুনে প্রলুব্ধ হলেন। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর এক সুবিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি গজনী থেকে সোমনাথের পথে যাত্রা করলেন। ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, চুয়ান্ন হাজার পদাতিক, বিশ হাজার উট এবং কয়েক হাজার পরিচারক নিয়ে তিনি তাঁর সেনাদল গঠন করেছিলেন। বলা বাহুল্য উটগুলো আনা হয়েছিল লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করবার জন্য।

তাঁর এই অভিযান সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত—
'In 1025, Mahmud of Ghazni (971-1030 A. D.) embarked upon his most famous Indian exploit,··· ·to Somnath on the Kathiwar peninsula to sack the city of temple there.' (Encylopædia Britannica—Vol. 14)

পথের সমস্ত মন্দির ও মঠ ধ্বংস করে মাহ্‌মুদ ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী প্রভাসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। তখনও প্রভাসদুর্গ তৈরি হয় নি। তাহলেও প্রভাসের মানুষ সেদিন সেই পরধর্মদ্বেষী ধনলোভী সুলতানকে সহজে পথ দেয় নি। তাঁরা জীবনপণ করে সর্বশক্তি দিয়ে মাহ্‌মুদকে বাধা দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশ হাজার নওজোয়ান শহীদ হলেন। কিন্তু যা সম্ভব নয়, তা সম্ভব হল না। প্রভাসের মুক্তিকামী মানুষ হাজার হাজার হানাদারকে হত্যা করলেন। তবু প্রভাস পরপদানত হল।

তিনদিন যুদ্ধের পরে শহীদদের শবদেহ মাড়িয়ে সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কারও মতে সেটি সোমনাথের তৃতীয় মন্দির, আবার কেউ বা বলেন, চতুর্থ। যাই হোক, মাহ্‌মুদ সে-মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।

তারপরে শুরু হল লুণ্ঠন, নারীনিগ্রহ, ধর্ষণ ও হত্যা। প্রভাস নিয়ে যুদ্ধ এর আগেও বহুবার হয়েছে। কিন্তু বিজয়ীদের এমন পৈশাচিক আচরণ প্রভাস তার আগে কখনও দেখে নি।

আঠারো দিন ধরে চলল এই পাশবিকতা। কোন মন্দির ও গৃহ অলুণ্ঠিত রইল না, কোন যুবতী নারীত্ব রক্ষা করতে পারল না। কোন বিগ্রহ অক্ষত থাকল না, কোন দেবালয় অবিকৃত রইল না। সুলতানের আদেশে সৈন্যরা সোমনাথ ও অন্যান্য মন্দিরের দেওয়াল ও মেঝে খুঁড়ে-খুঁড়ে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা লুঠ করল। এমনকি মন্দিরের দরজাটি পর্যন্ত খুলে ফেলল তারা। মাহ্‌মুদ সেই কারুকার্য-খচিত কাঠের দরজাটি নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। পরবর্তীকালে সেটি তাঁর সমাধিক্ষেত্রের শোভাবর্ধন করছিল। কিন্তু ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা কাবুল জয় করে বিজয়ের স্মারক স্বরূপ সেই দরজাটি ভারতে নিয়ে আসেন। এটি এখন আগ্রাদুর্গের সংগ্রহশালায় রয়েছে।

মাহ্‌মুদ ঐশ্বর্যশালী সোমনাথকে শ্মশানে পরিণত করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে বোধকরি এর আগে আর কখনও কেউ ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবতার ওপরে এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানে নি। আঠারো দিন পরে মানব ইতিহাসের সেই কলঙ্কিত নায়ক সুলতান মাহ্‌মুদ দেশের পথে রওনা হলেন, তখন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি।

কিন্তু তাতেও তাঁর লোভ মেটে নি। হত্যালীলার পরে প্রভাসে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কয়েক হাজার স্বাস্থ্যবান যুবক ও সুন্দরী যুবতীকে শেকলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয় করা।

যাঁরা সেদিন সোমনাথে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আমাদের নমস্য। তাঁরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে মহীয়ান করে তুলেছেন। কিন্তু সেই হতভাগ্য যুবক-যুবতীরা ?

অক্টোপাশের দল তিল তিল করে যাঁদের জীবনীশক্তিকে শুষে নিয়েছে? যাঁরা বছরের পর বছর মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে জীবন যাপন করেছেন কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। কাঁদতেও পারেন নি, হয়তো বা তাঁদের চোখের জলও গিয়েছিল শুকিয়ে। তাঁরাও আমার নমস্য। হাজার বছর পরে সোমনাথের সেই জীবন্ত-শহীদদের উদ্দেশ্যেও আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

"ঘোষদা! এই হচ্ছে ভালকাতীর্থ।"

ম্যানেজারের ডাকে আমার ভাবনা থামে। আমি ইতিহাসের প্রভাস থেকে ফিরে আসি বর্তমানের প্রভাসে।

টাঙ্গা চলেছে প্রভাসের পথ দিয়ে। যে-পথ দিয়ে একদিন কৃষ্ণ, বলরাম ও পাণ্ডবরা পথ চলেছেন, যে-পথ একদিন সুলতান মাহ্‌মুদের নৃশংসতার সামিল হয়েছে, সেই পথ—পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পুণ্যপথ, শহীদতীর্থ সোমনাথের মুক্তিপথ।

পথের পাশে সুন্দর একটি নবনির্মিত মন্দিরের দিকে ম্যানেজার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আমি দেখি আর ভাবি—পারে নি। ওরা পারে নি। সুলতান মাহ্‌মুদ, আলাউদ্‌দিন আর আওরঙ্গজেবের দল প্রভাসকে ধ্বংস করতে পারে নি। প্রভাস আছে, চিরকাল থাকবে। সত্য ও সুন্দরের মৃত্যু নেই।

"ভাল্‌কাতীর্থ কি মামা?" বিউটি প্রশ্ন করে।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মর্তলীলা সাঙ্গ করেছেন।"

"কিন্তু টাঙ্গা থামছে না কেন?" বিউটি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

"টাঙ্গা থামবে না এখানে।" ম্যানেজার বলে।

"বারে! আমরা ভাল্‌কাতীর্থ দেখব না!"

"দেখ্‌ব।"

"তাহলে?"

"এখন আমরা সোজা ত্রিবেণীতে যাবো। সেখানে স্নান ও তর্পণ শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রভাস ও সোমনাথ দর্শন করব। ফেরার পথে এখানে নামব।"

বিউটি শান্ত হয়। টাঙ্গার শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। ভাল্‌কা-তীর্থ ভেরাভল ও প্রভাসের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তার মানে আমরা অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

আমাদের টাঙ্গা রয়েছে প্রথমে আর উকিলবাবুর টাঙ্গা আসছে শেষে। ম্যানেজার সবার দিকে দৃষ্টি রাখছে।

শুঁটকীর গন্ধ এখনও রয়েছে তবে পথের প্রকৃতি পালটেছে। বাড়ি ঘর ও কল-কারখানা কমেছে, বেড়েছে সারি সারি ঝাউ গাছ। চড়া রোদ উঠেছে কিন্তু বেশ বাতাস বইছে। তাই গরম লাগছে না। শুধু সেই বাতাসে ভর করে শুঁটকীর গন্ধ নাকে আসছে, এই যা।

ডানদিকে একটা খাঁড়ি। অনেক লোকজন সেখানে। সমুদ্র-গামী নৌকো সারানো হচ্ছে।

বাঁদিকে আরেকটা মন্দির। টাঙ্গাওয়ালা জানায়, "কৃষ্ণভগবানকা মন্দির।"

নির্ভুল উত্তর। আমিও বলতে পারতাম। বৃন্দাবন আর দ্বারকার মতো প্রভাসও কৃষ্ণময়। এখানকার যেকোন মন্দির দেখিয়েই বলা যেতে পারে—কৃষ্ণমন্দির।

ডানদিকে একটা দরগা। টাঙ্গাওয়ালা জানায়, "হাজী মংরুলিশাহের দরগা। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে দেহরক্ষা করেন। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত এই দরগা দর্শনে আসেন।"

দরগা ছাড়িয়ে টাঙ্গা এগিয়ে চলে। প্রভাস শুধু হিন্দু ও জৈন-তীর্থ নয়। মুসলমানদেরও বহু দর্শনীয় আছে এখানে। আছে আরও দুটি দরগা এবং পাঁচটি মসজিদ আগে সেগুলি অবশ্য সবই হিন্দু মন্দির ছিল। সোমনাথের মন্দিরও একসময়ে কিছুদিনের জন্য মসজিদে পরিণত হয়েছিল।

লোকালয় শেষ হয়ে গেল, শুরু হল ক্ষেত। মাঝে মাঝে বাবলা বন। নারকেল গাছ তো রয়েছেই। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। বেশ ভালো লাগছে।

উমাদি নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, "আচ্ছা ঘোষদা, স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস খণ্ডে নাকি দধীচির কাহিনী রয়েছে?"

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই

"কিন্তু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৃত্রসংহার কাব্যে' তো বলেছেন, দধীচি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করেছিলেন।"

"তাহলেও প্রভাসখণ্ডে দধীচির কাহিনী রয়েছে।"

"কাহিনীটা কি?" বিউটি গল্পের গন্ধ পেয়েছে।

হেসে বলি, "বলতে হবে, তাই তো।"

বিউটি মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি, "দধীচি একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যঞ্চ্ এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি নামে খ্যাত। যাস্ক রচিত নিরুক্তের মতে তিনি অথর্বার পুত্র, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে শুক্রাচার্যের পুত্র আবার অন্যান্য পুরাণে তিনি অথর্বের ঔরসে কর্দমকন্যা শান্তির পুত্র।

"কথিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সাবধান করেছিলেন—যদি তুমি কাউকে এই বিদ্যা দান কর, তাহলে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

"স্বর্গের বৈদ্য দুই অশ্বিনীকুমার খবর পেয়ে ছুটে এলেন দধীচির কাছে। তাঁরা তাঁকে ইন্দ্রবিদ্যা দান করতে অনুরোধ করলেন। দধীচি তখন ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞার কথা বললেন তাদের। তারা তৎক্ষণাৎ দধীচির মাথাটি কেটে রেখে......"

"মাথা কেটে ফেললেন।" বিউটি সবিস্ময়ে বলে ওঠে। "তাহলে তো দধীচি মরে গেলেন?"

"না। অশ্বিনীকুমাররা যে মস্ত বড় 'সার্জন্' ছিলেন। তারা দধীচির ঘাড়ে একটা ঘোড়ার মাথা বসিয়ে দিলেন। আর সেই ঘোড়ার মুখ থেকেই প্রবর্গ্যবিদ্যা বা ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক সাম যজুঃ এবং মধুবিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

'যথাসময়ে ইন্দ্রের কানে কথাটা গেল। তিনি দধীচির সেই ঘোড়ার মাথাটি কেটে ফেললেন। অশ্বিনীকুমাররা তাড়াতাড়ি তখন দধীচির ঘাড়ে মহর্ষির নিজের মাথাটি লাগিয়ে দিলেন। দধীচি যেমন ছিলেন, তেমনি হলেন।

"তারপরেই দধীচি এলেন সরস্বতী-সাগর সঙ্গমে। শুরু করলেন

কঠোর তপস্যা। দেবলোকে ইন্দ্রের আসন টলে উঠল। তিনি অলম্বুষা নামে জনৈকা অপ্সরাকে পাঠিয়ে দিলেন প্রভাসে। রূপসী অলম্বুষা সম্পূর্ণ নিরাবরণা হয়ে দধীচির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি নাচ-গান করে দধীচির তপোভঙ্গ করতে সমর্থ হলেন। তাঁর অপরূপা দেহের দিকে তাকাতেই দধীচিব রেতস্খলিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী সেই বীর্যধারণ করে পুত্রবতী হলেন। দধীচির পুত্র সারস্বতের জন্ম হল।

"দধীচি তখন হিমালয়ে চলে গেলেন। বদ্রীনাথে বসে তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

"কিছুকাল পবে বৃত্রাসুরেব অত্যাচারে দেবতারা অস্থির হয়ে উঠলেন। ইন্দ্র জানতে পারলেন, দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র না হলে বৃত্রাসুরেব বিনাশ হবে না।

"বাধ্য হয়ে দেবরাজ গেলেন দধীচিব কাছে। তিনি তাঁর অস্থি ভিক্ষা করলেন। মহান ঋষি দেববাজের অপবাধ ক্ষমা করলেন। তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ কবলেন। দেবলোকের মঙ্গলেব জন্য মহর্ষি দধীচি সানন্দে দেহত্যাগ করলেন।

"দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত হল বজ্র। সেই বজ্রেব আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করলেন।"

আমি থামতেই উমাদি 'বৃত্রসংহার কাব্য' থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন।

> "মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
> তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
> সমূল অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
> বনলতা তরুকুল শোকে অবনত।
> দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
> নাসিকা নিঃশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
> বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
> নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
> মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
> পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি

পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।"

॥ সাত ॥

উমাদির কথাই ভাবছিলাম টাঙ্গায় বসে বসে। উমাদির পুরো নাম উমা মিত্র। বেশ ছিমছাম স্মার্ট চেহারা। বয়স চার-এর ঘরে। লেখাপড়া জানেন। বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। বিয়ে করেন নি। সংসারে তেমন আপন বলতে কেউ নেই বলেই বোধহয় সবাই তাঁর আপনজন।

উমাদির জীবনে প্রধান অবলম্বন গোপাল—গোকুলের যশোদা দুলাল। একটি নয়, দুটি গোপাল। একটি ছোট ও একটি মাঝারি মূর্তি। দুটিই পেতলের। দু'জনেই হামাগুড়ি দিচ্ছে।

তাদের সব আছে—জামা-কাপড়, থালা-বাসন, বিছানাপত্র। উমাদি সারাদিন মাতৃস্নেহে সেবা করেন তাঁদের—ঘুম ভাঙানো, মুখ ধোয়ানো, খাবার খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। উমাদির অনেক কাজ, তবু তিনি সময় করে সবার খোঁজ খবর করেন। কারও কোন প্রয়োজন জানতে পারলেই হয়, তিনি যেমন করেই পারেন, তা করে ছাড়বেন। এমন পরোপকারী মহিলা খুব কমই দেখেছি।

"এই রাস্তাটা সোমনাথের মন্দিরে গিয়েছে।" ম্যানেজারের কথায় উমাদির কথা হারিয়ে যায়।

"আমরা এখন ত্রিবেণীতে চলেছি, তাই না ?" উমাদি প্রশ্ন করেন।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, প্রভাসে এসে প্রথম সেখানে স্নান ও তর্পণ সেরে নিতে হয়, তারপরে অন্য দর্শন।"

টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। পথের দু-পাশেই গাছ-পালা, মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর। খানিকটা এগিয়ে টাঙ্গা একটা নতুন রাস্তা ধরল। ম্যানেজার বলল, "বড় রাস্তাটা উনা চলে গেল। আমরা চলেছি প্রভাসে, বর্তমান নাম প্রভাস-পাটন।"

এখন আমাদের পথের পাশে মাঝে মাঝেই বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ। কোথাও কোথাও ইট আর পাথরের ঢিবি। তাদের

ঘিরে ঝোপঝাড়। বড় বড় গাছপালাও গজিয়েছে দু-চার জায়গায়। মনে হচ্ছে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত জনপদের পথ চলেছি।

পথটা সামনের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। উৎরাই পথ পেয়ে আমাদের ঘোড়া জোর-কদমে ছুটেছে। এখন পথের পাশে নারকেল আর ঝাউগাছের সারি। ঝাউয়ের ডালে ডালে জোর হাওয়া লেগেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটা শুনলেই আমার কৈশোরকালের কথা মনে পড়ে। বরিশালে কীর্তনখোলার তীরে তীরে ঝাউয়ের সারিতে সারাদিন এমনি শব্দ হয়। সে-শব্দ শোনার সুযোগ জীবনে হয়তো আর হবে না আমার।

কিন্তু না বাংলাদেশের বরিশালের কথা থাক্, জন্মভূমি হলেও বরিশাল আমার কাছে এখন বিদেশ আর ভারত আমার স্বদেশ। আমি ভারতের প্রভাসের কথায় ফিরে আসি। ঢালু পথটি সমতলে এসে মিশল। আর সেখানেই টাঙ্গা থেকে নামতে হল আমাদের। আমরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের ত্রিবেণীতে পৌঁছে গিয়েছি।

ধূলিময় অপ্রশস্ত পথের ডানদিকে খানিকটা দূরে একটি মন্দির। বাঁদিকে কয়েকটি অস্থায়ী দোকানঘর। তারই দুটি দোকানের মাঝখান দিয়ে মাটির একটি পায়ে-চলা পথ নেমে গেছে নিচের দিকে। সেই পথ বেয়ে কয়েকটি পিপল গাছ ছাড়িয়ে আমরা একফালি বালিময় প্রান্তরে পৌঁছলাম।

পাণ্ডাজী বললেন, "এই হল প্রভাসের ত্রিবেণী সঙ্গম।"

না, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মতো মোটেই সুন্দর ও সুবিশাল নয়। বালিময় প্রান্তরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটি নাতিপ্রশস্ত অগভীর জলধারা—অনেকটা খাড়ির মতো। খানিকটা দূরে গিয়ে সেটি সাগরে মিশেছে।

কিন্তু একে ত্রিবেণী বলা হচ্ছে কেন? তিনটি নদী তো দেখতে পাচ্ছি না।

পাণ্ডাজী জানান, "এটিই সরস্বতী, কপিলা ও হিরণ্যর মিলিত-ধারা—পুণ্যতীর্থ প্রভাসের পুণ্যধারা।"

"কোন সরস্বতী? ভারতে যে সরস্বতী নামে অনেক নদী আছে।"

দাদার সংশয় দূর করার জন্য পাণ্ডাজী বলেন, "ঋগ্বেদ পরিশিষ্টে যে সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে।"

"কি বলা হয়েছে ঋগ্বেদে?"

"বলা হয়েছে হিমালয়ের প্লাক্ষা প্রস্রবণ থেকে সৃষ্ট হয়ে রাজস্থান ও গুজরাতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রভাসে এসে সমুদ্রে মিশেছে। ঋগ্বেদের ভাষায়—

'একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং
শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ'

স্কন্দপরাণের প্রভাস খণ্ডে আছে—প্রাচী সরস্বতী কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর ও প্রভাস দিয়ে প্রবাহিতা।"

একবারে থামেন পাণ্ডাজী তারপরে আবার বলতে থাকেন, "তবে বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—সরস্বতী নদী হিমালয় থেকে সৃষ্ট হয়ে রাজস্থানের মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছে। তারপরে আবার রাজস্থানেরই আবু পাহাড় থেকে তার চলা শুরু করে কচ্ছের মরপ্রান্তরে অদৃশ্য হয়েছে। অবশেষে গির জঙ্গলে দেখা দিয়ে প্রভাসে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সরস্বতীর পুণ্যধারা।"

পুণ্যধারা তো বটেই। যুগাতীত কাল ধরে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পুণ্যবারি স্পর্শ করবার জন্য ছুটে এসেছেন এই পুণ্যতীর্থে। এসেছেন শঙ্করাচায, বল্লভাচার্য ও বিবেকানন্দ এবং আরও কত যুগাবতার। তাঁদের প্রত্যেকের পদরেণুরঞ্জিত এই পুণ্যতীর্থ। আমি প্রণাম করি।

ঘাটে বসে স্নান তর্পণ করে আমরা ত্রিবেণী মন্দিরে এলাম। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা কেন, হিরণ্য ও কপিলা কোথায় গেলেন? কি জানি হয়তো গঙ্গা-যমুনাই এখানে হিরণ্য-কপিলা রূপে পরিচিতা।

রাম মন্দির ও মক্কেশ্বর মন্দির দর্শন করে আমরা আবার উঠে আসি পথে। কালো কাপড় পরে কয়েকজন মহিলা ত্রিবেণীতে চলেছেন।

বিউটি জিজ্ঞেস করে, "এরা সবাই কালো শাড়ী পরেছেন কেন?

কেউ মারা-টারা গিয়েছেন নাকি ?"

"হ্যাঁ।" ম্যানেজার উত্তর দেয়।

"কে ?"

"কৃষ্ণ।"

"ধ্যেৎ! আপনি বড্ড হেঁয়ালি করেন।"

ম্যানেজার মৃদু হাসে। বলে, "হেয়ালী নয়, সত্যি কথাই বলছি। এঁরা সবাই রাধাবংশজাত আহীর। শ্রীকৃষ্ণকে এঁরা পরমপতি বলে মনে করেন, তাই আজও এঁরা কৃষ্ণ বিরহিনী। হাজার-হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে কালো কাপড় পরে এঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোকপালন করছেন।"

বিউটির বোধহয় বিশ্বাস হয় নি এখনও। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

বলি, "ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। আমার কাছে Fodor's India বইটা আছে। গাড়িতে গিয়ে দেখো, তাতে লেখা রয়েছে—'The Ahir women of this area, members of the same clan of Radha, Krishna's consort, wear black in what must be the longest mourning in history.'

রাস্তার ওপারেই সূর্যমন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা মন্দিরে উঠে আসি। শুনেছি মহারাজা সাগরাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। এটি প্রভাসের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম। সম্ভবতঃ সোমনাথের মন্দির থেকে খানিকটা দূরে বলেই পরমধর্মদ্বেষীদের তেমন নজরে পড়ে নি, মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আজও টিকে আছে।

পাথরের ছোট মন্দির। প্রথমে নাট-মন্দির, তারপরে গর্ভ-গৃহ। গর্ভ-মন্দিরে পেছনের দেওয়ালটি সুচিত্রিত। ঠিক কেন্দ্রস্থলে একজোড়া চোখ, নাক ও মুখ আঁকা। পাণ্ডাজী বলেন, "সূর্যনারায়ণ।"

বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি দেখিয়ে ছোট-ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "তাইলে উনি কেডা ?"

পাণ্ডাজী প্রভাসের মানুষ। তাহলেও বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বেশ ভাল বাংলা বুঝতে পারেন। তাই তিনি

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "উনি সূর্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী।"

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের প্রথমা পত্নী। তাঁর গর্ভে সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু ও কন্যা যমুনার জন্ম হয়। কথিত আছে সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁর ছায়াকে কামিনীতে অরিণত করে তাঁকে স্বামীর কাছে রেখে পালিয়ে যান। ছায়ার ঔরসে সূর্যপুত্র শনি ও কন্যা তপতীর জন্ম হয়। পরে সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর আরও পুত্র হয় তাঁদের মধ্যে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দু'জন অন্যতম। আর সূর্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়েছিল।

পূজারী চরণামৃত ও আশীর্বাদ দিলেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করি। তারপরে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখি। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শঙ্করাচার্যকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে নেমে আসি সূর্যমন্দির থেকে। সূর্যকুণ্ড দর্শন করে পাণ্ডাজীর সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গের সামনে এসে দাঁড়াই। কাঁধের থলি থেকে টর্চ বের করে পাণ্ডাজীর পেছনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি। কয়েক পা হেঁটেই একখানি মাঝারী আকারের মাটির ঘরে পৌঁছই। সিঁদুর মাখানো কয়েকখানি ত্রিশূল ও একটি সূর্যমূর্তি রয়েছে।

পাণ্ডাজী বলেন, "এই পথে পঞ্চ-পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, মিসেস উকিল সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখদুটি করুণ। তিনি করুণকণ্ঠেই জিজ্ঞেস করেন আমাকে, "ভেতরে কি আছে বাবা?"

তিনি তাঁর সুবিশাল দেহ নিয়েও প্রায় প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে চলেছেন কিন্তু তাঁর পক্ষে এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

বলি, "তেমন কিছু নয়। কয়েকটি ত্রিশূল ও একটি সূর্যমূর্তি।"

"আচ্ছা পাণ্ডাজী যে বললেন, এটি পাণ্ডবদের গুহা! কথাটা কি সত্যি?"

"না। প্রথমতঃ এটি কোন গুহাপথ নয়। সুড়ঙ্গটা একটা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডবরা গোপন পথে প্রভাসে

আসবেন কেন ? তখনও তো তাঁদের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হয় নি।"

"তাহলে এটা কি ?"

"আমার মনে হয়, পরধর্মদ্বেষীদের কবল থেকে বিগ্রহকে রক্ষা করার জন্য সেবাইতরা মাটির নিচে এই ঘরটি তৈরি করেছিলেন। সুবিধাবাদীরা এখন তার সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণকে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন।"

"আরেকটা কথা···"

"বলুন।"

"আচ্ছা, আমি একখানি বইতে পড়েছি, এখানে নাকি পাঁচটা গুহা আছে, সেখানে পঞ্চ-পাণ্ডব তপস্যা করেছেন ?"

"গুহা থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের তপস্যার কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন ?"

"পাণ্ডবরা কখনও প্রভাসে কোন তপস্যা করেন নি। তাছাড়া পাঁচভাই একসঙ্গেও প্রভাস আসেন নি। আদিপর্ব এবং মৌষলপর্বে অর্জুন একা আর বনপর্বে চারভাই ও দ্রৌপদী প্রভাসে এসেছেন।"

মিসেস উকিল সন্তুষ্টচিত্তে সামনে এগিয়ে চলেন।

সূর্যনারায়ণ মন্দিরের ডানদিকে শ্রীসারদা মঠ। আমরা সেখানে এলাম। দেখে মনে হচ্ছে মঠটি নবনির্মিত। পাণ্ডাজী আমার অনুমান সমর্থন করেন।

প্রথম মন্দিরে শ্রীনাথজী, নৃসিংহদেব, দেবী ভগবতী ও গণপতির মূর্তি রয়েছে। আমরা দর্শন করে দ্বিতীয় মন্দিরে আসি। এটিকে মন্দির না বলে গদি বলাই উচিত হবে—শঙ্করাচার্যের গদি।

গদির ওপরে একজোড়া রুপোর খড়ম ও আদি-শঙ্করাচার্যের কাল্পনিক ছবি। চারদিকের দেওয়ালে আরও কয়েকজন আচার্যের ছবি। তাঁদের মধ্যে ত্রিবিক্রমানন্দ ও স্বরূপানন্দের ছবি দুখানি ভাল লাগে আমার।

প্রণাম করে বেরিয়ে আসি বাইরে। জনৈক দণ্ডীস্বামী এই মঠের অধ্যক্ষ। পাণ্ডাজী আলাপ করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গে। অমায়িক ও

ভক্ত সন্ন্যাসীকে ভাল লাগে আমার। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

কামনাথ ও ব্রাহ্মীস্বামী মন্দির দর্শন করে টাঙ্গায় ফিরে আসি। টাঙ্গা এগিয়ে চলে।

একটু বাদে দিদি বলেন, "এখানে আবার সারদা মঠ কেন? সারদা মঠ তো দ্বারকায়! আমরা দর্শন করেছি।*"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "এটি তার একটি শাখা। সেটি জগদ্গুরু আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত আর এটি হালে তৈরি।"

"তাই বল।" দিদির বিভ্রান্তি দূর হয়।

অমিয়বাবু ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, "এবারে আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন মশায়!"

"গীতা মন্দিরে।" ম্যানেজার উত্তর দেয়।

অমিয়বাবু আবার প্রশ্ন ছাড়েন, "কতগুলো গীতা মন্দির আছে এদেশে?"

"আপনি আবার কোথায় গীতা মন্দির দেখলেন?"

"কেন, ঋষিকেশে। মানে লছমনঝুলায়।"

"সে তো গীতা ভবন।" ম্যানেজার অমিয়বাবুর ভুল ধরিয়ে দেয়।

"ঐ হল আর কি। যা মন্দির, তাই ভবন।"

"যেমন যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ—কি বলেন?"

"তা যা বলেছেন।"

আমরা সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি। এবং অমিয়বাবুও সে হাসির সামিল হন।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাসবার সময় পাওয়া গেল না। টাঙ্গা থেমে গেল। আমরা গীতা মন্দিরের সামনে পৌঁছে গিয়েছি।

পথের পাশেই মন্দির-তোরণ। সুন্দর ও ঝকঝকে মন্দির। মাত্র বছর দশেক আগের তৈরি।

দেওয়ালঘেরা বেশ বড় এলাকা নিয়ে মন্দির। তোরণ থেকে কয়েক পা সামনে হেঁটে বাগান পেরিয়ে বাঁদিকে মন্দিরদ্বার। কারু-কার্যখচিত চারটি শ্বেতপাথরের গোল স্তম্ভে সুশোভিত। আমরা কয়েক

* লেখকের 'মন-দ্বারকায়' দ্রষ্টব্য।

ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সুবিশাল নাট-মন্দিরে উঠে আসি। শ্বেতপাথরের মেঝে ও দেওয়াল। দেওয়ালে অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার সমস্ত শ্লোক লেখা। জামনগরের মহারাজা দিগ্বিজয়সিংজী ১৯৬৩ সালের ২০শে এপ্রিল এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

নাট-মন্দিরের শেষে সুদৃশ্য গর্ভ-মন্দির। ভেতরে শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে শ্যামবর্ণ পাথরের ঘনশ্যাম। বংশীধারী নৃত্যরত কিশোর-কৃষ্ণ। পরণে ধুতি, কবজি বাহু ও গলায় মূল্যবান অলঙ্কার। ভারী সুন্দর প্রাণময় মূর্তি। আমার হৃদয় ও মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমি মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকি মুরলীধারীর দিকে।

গীতা মন্দিরের পাশেই বলদেও গুম্ফা বা বলরামের গুহা। পাণ্ডাজীর সঙ্গে সেখানে আসি। পাণ্ডাজী বলেন, "শ্রীবলদেব এই পথে পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন।"

এবারেও মিসেস উকিল আমাদের সঙ্গী হতে পারলেন না। কারণ এটিও মাটির নিচে একখানি ঘর। সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছন সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। তেমনি করুণচোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

আমরা নেমে এলাম নিচে। ছোট ঘর। প্রদীপের ম্লান আলোয় আঁধার কাটে নি। কিন্তু ধূপ আর ফুল-চন্দনের গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে।

এক পাশে একটি বেদির ওপরে শ্বেতপাথরের বলদেব। ভারী সুন্দর মূর্তি। পাণ্ডাজী বলেন, "১৯৬৭ সালের ১৯শে মে শ্রীজয়শুক-লাল হাতি এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন।"

বলদেবের পাশেই একটি ছোট লিঙ্গমূর্তি। ঠাকুরমারা বাবার মাথায় জল ঢাললেন। আমরা শুধু প্রণাম করে উঠে এলাম ওপরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ওঙ্কারেশ্বর মন্দির দর্শন করে পাণ্ডাজীর সঙ্গে ফিরে এলাম গীতা মন্দিরের সামনে। পাণ্ডাজী কিন্তু থামলেন না। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

কয়েক পা এগিয়েই দেওয়াল ঘেরা একফালি জায়গা। তার ঠিক মাঝখানে একটি গোড়া-বাঁধানো অশ্বত্থ গাছ। পাণ্ডাজী বলেন, "এই

হল শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎসর্গের স্থান। আপনারা জানেন জরা ব্যাধ যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করেছিলেন। সেটি ভাল্‌কাতীর্থ। আমরা পরে সেটি দর্শন করব। ভাল্‌কাতীর্থ থেকে আহত কৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। এখানেই তিনি মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। আর সামনের ঐ শুকনো নালাটাই হিরণ্য নদী।"

মহাভারতের সেই অধ্যায়টি মনে পড়ে আমার। আমি চোখ বুজে ভাবতে থাকি—

…'বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে ব'সে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমুখ মহানাগ নির্গত হ'য়ে সাগরে প্রবেশ করছেন।……

'অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণের পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দুর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে ক'রে তার পদতল শরবিদ্ধ করল। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে ঊর্দ্ধে স্বকীয় লোকে প্রয়াণ করলেন।…'*

শুধু আমি নই, আমার সহযাত্রীরা সবাই অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন এই পরম-পবিত্র ক্ষেত্রের দিকে। আমি এগিয়ে এসে একেবারে বেদির কোল ঘেঁষে দাঁড়াই। আনত হয়ে মাথা ঠেকাই মাটির সঙ্গে। তারপরে অশ্বত্থের পাদদেশ থেকে একমুঠো ধূলি তুলে মাথায় মাখি। মনে মনে বলি—মথুরায় তোমার জন্মভূমির রজঃ অঙ্গে মেখেছিলাম, আজ তোমার প্রয়াণতীর্থ প্রভাসের পরাগও দেহে ধারণ করলাম। আমি ধন্য হলাম, আমার জীবন কৃতার্থ হল। হে নরনারায়ণ! তুমি আমার সহায় হও। আমাকে আশীর্বাদ করো —আমি যেন তোমার মহাজীবনের মাঝে ভারত-আত্মার সন্ধান পাই।

* মহাভারত—(সারানুবাদ) রাজশেখর বসু

আবার টাঙ্গার শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা এখন সোমনাথে চলেছি।

বর্তমান প্রভাস ও সোমনাথে সব মিলিয়ে আটানব্বুইটি দর্শন। তার মধ্যে আমরা মোটে গুটিবারো দেখেছি। বিকেল হয়ে গিয়েছে। আজ রাতের ট্রেনেই বিদায় নেব প্রভাসের কাছ থেকে। সুতরাং সব তীর্থ দর্শন করা হয়ে উঠবে না আমাদের।

সেকালে নাকি এখানে আরও বেশি দর্শন ছিল। প্রভাসখণ্ডের (স্কন্দপুরাণের সপ্তম খণ্ড) প্রথম ৩৬৫টি অধ্যায়ে প্রভাসের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে প্রভাস ও সোমনাথে ১৩৫টি শিবমন্দির, ২৫টি দেবীমন্দির, ১৬টি সূর্যমন্দির, ৫টি করে বিষ্ণু ও গণপতির মন্দির এবং ১টি করে নাগ ও ক্ষেত্রপালের মন্দির অর্থাৎ মোট ১৮৮টি মন্দির ছিল। ছিল ১৯টি কুণ্ড, ৮টি তীর্থ, ৪টি বিবর, ৩টি ক্ষেত্র, ২টি বন, ১টি করে অরণ্য আশ্রম ও শ্মশান। আর ছিল ৯টি নদী ও ৫টি কুয়ো—তার দুটিতে সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামা যেত। সবচেয়ে বিস্ময়কর শত শত বছরের ধ্বংসলীলার পরেও তার কয়েকটি মন্দির এবং স্থান আজও পুণ্যার্থীদের পরম-সম্পদ রূপে বিরাজ করছে।

সোমনাথে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের ধ্বংসলীলার অনতিকাল পরেই প্রভাসে আবার একুশটি মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

সুলতান মাহ্‌মুদ চলে যাবার পরেই গুজরাতের রাজা ভীমদেও সোলাঙ্কি, মালবের রাজা ভোজরাজ পারমার, আজমীরের রাজা বিশালদেও চৌহান এবং জুনাগড়ের রাজা রা'নবঘন যৌথভাবে বিধ্বস্ত মন্দির সারিয়ে আবার লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তীর্থযাত্রা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজা-মহারাজারা এসে আবার সোমনাথকে সমৃদ্ধ করতে থাকলেন।

১১৪৩ থেকে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে গুজরাতের রাজা কুমারপাল প্রাচীন মন্দিরের আমূল সংস্কার সাধন করে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন। অনেকে বলেন 'সিদ্ধহেম' ও 'অভিধান-

চিন্তামণি' রচয়িতা প্রখ্যাত জৈন-পণ্ডিত হেমচন্দ্রাচার্যের পরামর্শে তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন। আবার অনেকের মতে তাঁর শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রী ভব বৃহস্পতির নির্দেশে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন। যাই হোক মন্দির নির্মিত হবার পরে ভব বৃহস্পতি প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে শহরকে সম্প্রসারিত করলেন। অনেক নতুন বাড়ি তৈরি করে সেগুলো ব্রাহ্মণদের দান করা হল।

১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের রাজা দ্বিতীয় ভীমদেও ধর্মাদিত্য সূর্য-মন্দিরটির সংস্কার সাধন করে ভীমেশ্বর ও লালেশ্বর মন্দির দুটি তৈরি করে দিলেন। সুবিখ্যাত দিলওয়ারা (মাউন্ট আবু) মন্দিরের নির্মাতা জৈনভক্ত বাস্তুপাল ও তেজপাল (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) সোমনাথে এসে অষ্টাদশপ্রসাদ মন্দির নির্মাণ করেন।

এইভাবে মাহ্‌মুদের তাণ্ডবলীলার দেড়শ' বছরের মধ্যে প্রভাস আবার এক সমৃদ্ধ মহানগরীতে পরিণত হয় এবং সোমনাথ আগের মতোই ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠেন।

কথাটা কানে গেল আলা-উদ্-দিনের—দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্-দিন খিলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)। তিনি তখন বোধহয় পদ্মিনীকে পাবার নেশায় মশগুল, চিতোর জয়ের (১৩০৩ খ্রীঃ) পরিকল্পনায় ব্যস্ত। তাঁর অনেক টাকা-পয়সার দরকার। কাজেই শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী দিয়ে ভাই উলঘ্ খানকে গুজরাতে পাঠিয়ে দিলেন। পথের সমস্ত হিন্দুরাজ্যে লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হত্যার তাণ্ডব চালিয়ে উলঘ্ ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসে পৌঁছল। স্থানীয় রাজা ও প্রভাসের মানুষ তাকে যথাসাধ্য বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁরা দিল্লীর বাহিনীকে রুখতে পারলেন না।

মাহ্‌মুদের মতোই উলঘ্ প্রথমে সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি সহ সমস্ত মন্দিরের সব বিগ্রহ চূর্ণ করল। তারপরে একইভাবে চলল লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হত্যা। যাবার সময় সে-ও শত শত যুবক-যুবতীকে বন্দী করে নিয়ে গেল। আলা-উদ্-দিনের সুযোগ্য সেনাপতি আরও একটি কাজ করেছিল। সে সোমনাথে বসে হাজার হাজার হিন্দুকে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিল, খসরু তাঁদেরই একজন। তিনি

১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্-দিনের ছেলে কুতুব-উদ্-দিন মুবারককে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। চার মাস পরে তাঁকে হত্যা করে গিয়াস-উদ্-দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। যাই হোক, উলঘ্ প্রভাসকে দ্বিতীয়বার শ্মশানে পরিণত করে দিল্লী ফিরে গেল।

মাহ্মুদ যা পারেন নি, আলা-উদ্-দিনও তা পারলেন না। তাঁর সেনাবাহিনীতে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে জুনাগড়ের রাজা চতুর্থ রা'নবঘন প্রভাস থেকে সুলতানের সৈন্যদের তাড়িয়ে দিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি বিধ্বস্ত মন্দির সাবিয়ে ১৩০৮ সালে সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা কব্লেন।

এবাবে গিয়াস-উদ্-দিন (১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ)। শুনেছি তিনি নাকি খুবই বিদ্যোৎসাহী ধার্মিক ছিলেন। তাই হয়তো তিনিও সোমনাথকে সইতে পারলেন না। তবে তিনি আর কষ্ট করে সোমনাথ পর্যন্ত এলেন না। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড় দুর্গ অধিকার করে তাঁব সৈন্যদের প্রভাসে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যথারীতি আবার সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত কবে লিঙ্গমূর্তি চূর্ণ করল।

ভক্তরা কিন্তু বেশিদিন সোমনাথের অদর্শন সইতে পারলেন না। জুনাগড়ের রাজা তৃতীয় রা'খেংগারেব সক্রিয় সহযোগীতায় প্রভাসের রাজা মেঘরাজ ভজো সুলতানের সৈন্যদের প্রভাস থেকে বিতাড়িত করলেন। তাবপবে নতুন লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবে সোমনাথের প্রকাশ্য পূজার প্রচলন করলেন।

একজন সামান্য সামন্তরাজার এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করলেন না তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ। তিনি গুজরাতের শাসক জাফর খানকে জুনাগড় ও সোমনাথ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ চতুর্থবার বিনষ্ট হল। মেঘরাজ শহীদ হলেন।

দশ বছর বাদে মালিক মুফারাহ্ গুজরাতের নতুন শাসক নিযুক্ত হলেন। তিনি স্বাধীন গুজরাতের স্বপ্ন দেখছিলেন। সুতরাং হিন্দুদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেন। মেঘরাজের ভাই ভার্মা তখন প্রভাসের রাজা। বুদ্ধিমান রাজা এই সুযোগে সোমনাথে লিঙ্গমূর্তি

প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। তিনি প্রভাস দুর্গটিরও সংস্কার সাধন করেছিলেন।

১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত ভক্তরা নির্বিঘ্নে সোমনাথের সেবা-পূজা করতে পেরেছেন। তারপরেই মালিককে হত্যা করে আরেক জাফর খান গুজরাতের শাসক হলেন। এই জাফর ছিলেন জনৈক ধর্মান্তরিত রাজপুতের পুত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তিনি সোমনাথের ওপর সবচেয়ে বেশিবার আঘাত হেনেছেন। ১৩৯৫, ১৪০২ ও ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত করে লিঙ্গমূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছেন। বলা বাহুল্য ভক্তরা বার বার মন্দির মেরামত করে লিঙ্গমূর্তি প্রাতষ্ঠা করেছেন বলেই, জাফরকেও বাব বার প্রভাসে আসতে হয়েছে।

কিন্তু জাফরের জীবদ্দশায় ভক্তরা আর মন্দিব সংস্কার কবেন নি। জাফরের মৃত্যুর পরে তার পৌত্র আহমেদশাহ গুজরাতের সুলতান হন। তিনি ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসে আসেন। তখন ভগ্ন সোমনাথ মন্দিরে কোন লিঙ্গমূর্তি ছিল না। তবু আহমেদশাহ পিতামহের 'ট্রাডিশন্' বজায় রাখলেন। প্রভাস ও সোমনাথের অভগ্ন এবং অর্ধভগ্ন সমস্ত মন্দিরগুলি তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেললেন। অসংখ্য নিরপরাধ অমুসলমানকে হত্যা কবে প্রভাসের পথে পথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন। তিনি প্রভাসে ইসলামী আইন বলবৎ করলেন।

আহমেদশাহের সুযোগ্য প্রতিনিধিরা তাবপরে বেশ কয়েক বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভাসে ধর্মান্তকরণ ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল। তারা বহু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করল এবং হাজার হাজার হিন্দু ও জৈনকে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিল।

এই অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও কিন্তু জুনাগড়ের রাজা তৃতীয় রা'মাণ্ডলিক ১৪৫১ থেকে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সোমনাথের মন্দির মেরামত করে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই অষ্টম মূর্তি বছর পঁচিশেক পুজো পেয়েছেন। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন গুজরাতের যাযাবর সুলতান মহম্মদ বেগড়া সসৈন্যে সোমনাথে এসে সেই মূর্তি সহ সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ফেলেন।

এই সময় হমীরজী গোহিল নামে জনৈক শৌর্যময় রাজপুত্র

সোমনাথকে বক্ষা কবাব জন্য নিজেব জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁব শ্বশুর বেগডা ভীলও তাঁব সঙ্গে শহীদ হযেছেন। তাঁদেব সেই মহান আত্মত্যাগ আজও গুজবাতে লোকগীতি হযে আছে। আব সোমনাথে রযেছে তাঁদের স্মৃতিমন্দিব। আমবা দর্শন কবব।

আহমেদশাহেব প্রতিনিধিদেব মতই মহম্মদেব প্রতিনিধিবাও তাবপবে প্রভাসে দীর্ঘকাল ধর্মান্ধকবণ ও ধ্বংসলীলা চালিযে গেল। ফলে সোমনাথে আব লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয নি। ভক্তবা তখন নিযমিত সরস্বতী নদীব তীবে সমবেত হযে সোমনাথেব পূজো কবতেন। আব প্রভাসেব বাতাসে শাসকদেব দীর্ঘশ্বাসে ভাবী হযে উঠত। কাবণ সবস্বতীকে যেমন ভাঙা যায না, তেমনি সঙ্গে কবেও নিযে যাওযা সম্ভব হয নি তাদেব পক্ষে

১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসেব ভাগ্যাকাশে আবাব দুযোগ ঘনিযে এলো। এবাবে কিন্তু কোনো সুলতান কিংবা সম্রাট নয। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ডি' কাস্ট্রো গুজবাতেব সুলতানী নৌবাহিনীকে পবাস্ত কবে প্রভাস ও ভেবাভলে আগুন লাগিযে দিযে লুণ্ঠন ধর্ষণ ও ধ্বংস-লীলাব এক নতুন নজীব স্থাপন কবলেন। তিনি হত্যাব সময়ে হিন্দু-মুসলমান বিচাব কবলেন না। মন্দিব ও মসজিদ দুই-ই তাঁব সৈন্যদেব লক্ষ্যবস্তুতে পবিণত হল। তাবা হিন্দু যুবতীদেব মতো মুসলমান মেযেদেব ওপবেও বলাৎকাব কবল।

প্রভাসেব পবধর্মদ্বেষীবা প্রথম ধর্মান্ধতাব কুফল উপলব্ধি কবাব সুযোগ পেল। ডি' কাস্ট্রো সেবাবে প্রভাস থেকে ধন-বত্ন ও নব-নাবীব সঙ্গে ত্রিপুবান্তক প্রশস্তি নামে একখানি মূল্যবান শিলালিপি নিযে গিযেছিলেন। সেটি এখনও পর্তুগালে বযেছে।

অপদার্থ সুলতানেব একজন উজীব সম্রাট আকববেব (১৫৫৬ ১৬০৫ খ্রীঃ) কাছে গুজবাত বক্ষা কবাব আবেদন জানালেন। বিচক্ষণ সম্রাট এ সুযোগ হাবালেন না। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে আমেদাবাদ অধিকাব কবে সুলতানকে বন্দী কবলেন। গুজবাত অধিকার কবাব সময আকবব তাঁর সেনাবাহিনী নিযে এগাবো দিনে ছ'শ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ্

আকবরের গুজরাত জয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন .
'The conquest of Gujrat marks an important epoch in Akbar's history. *

আকবরের গুজরাত বিজয় সোমনাথের ইতিহাসেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিন শ' বছর পরে প্রভাসের ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ১৫৮১ সালে নবম লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের প্রতিনিধি মির্জা আজিজ কোকা প্রভাস পরিদর্শনে এলেন। তিনি হিন্দুদের আশ্বাস দিলেন—সম্রাট অপরের ধর্মাচরণে বাধা দেবার পক্ষপাতী নন। তিনি হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন না। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তরা সোমনাথ মন্দিরে মহাসমারোহে মহারুদ্র যজ্ঞ সুসম্পন্ন করলেন।

তারপরে প্রায় সত্তর বছর ধরে সোমনাথের মন্দিরে প্রতি প্রত্যুষে মঙ্গলারতির ঘণ্টা বেজেছে, সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বলেছে। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানও আকবরের মতই সোমনাথের দিকে কুনজর দেন নি, স্থানীয় মুসলমান শাসকরাও সোমনাথকে কলঙ্কিত করার সাহস পায় নি। কিন্তু সিংহাসনে বসার বছর সাতেক পরেই আওরঙ্গজেব আদেশ জারি করলেন—কাফেরদের মূর্তিপূজা বন্ধ কর। হিন্দুদের সমস্ত মন্দির ও মঠ ভেঙে ফেলো। দেখো, সোমনাথের মন্দির যেন বাদ না যায়। ওটাই কাফেরদের সবচেয়ে বড় আড্ডা।

১৬৬৫ সালে নিষ্ঠুর ও ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) কালো থাবা পড়ল সোমনাথের ওপরে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় —"He (Aurangzeb) directed his officers to destroy the temple in 'such perfect a manner that it would never rise again.' He furher ordered them to expel all those who worshipped idols."*

স্থানীয় হিন্দুদের সকল বাধা জয় করে আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা প্রভাসের ওপরে চরম আঘাত হানল। সত্যই তারা 'পারফেক্ট

* 'Oxford History of india' by V. A. Smith.

* 'Prabhas and Somnath' bp S. H· Desai.

ম্যানার'-য়ে সোমনাথ ও অন্যান্য মন্দির ধ্বংস করল। এত আক্রমণের পরেও সোমনাথ মন্দিরের যে শিখরটি এতকাল অক্ষত ছিল, তারা সেটিকে পর্যন্ত ভেঙে ফেলল। ফলে পাঁচ শ' বছরের ঐতিহ্যের অবসান ঘটল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কুমারপাল নির্মিত সোমনাথের পঞ্চম মন্দিরটিকে আওরঙ্গজেব চিরকালের মতো অব্যবহার্য করে তুললেন। নবমবার সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি বিনষ্ট হল।

তারপরে প্রায় একশ' বছর সোমনাথ মন্দিরে সোমনাথের পূজো হয় নি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে সোমনাথ পূজা পান নি। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বিষ্ণুশর্মা (চাণক্য) কর্তৃক প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় এই আড়াই হাজার বছর ধরে, একটি দিনের জন্যও সোমনাথের সেবাপূজা বন্ধ হয় নি।

আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার পরে তাই সোমনাথের সেবকরা প্রভাসের শশিভূষণ মন্দিরের লিঙ্গমূর্তিতে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই একশ' বছর ধরে সোমনাথের সেবা-পূজা চলে। তারপরে অহল্যাবাঈ···ইন্দোরের ধর্মপ্রাণা মহারাণী অহল্যাবাঈ।

মনে মনে তাঁরই কথা ভেবে চলি। তিনি আহমদ্‌নগরের মেয়ে। তাঁর বাবার নাম আনন্দ রাও সিন্ধিয়া। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের যুবরাজ খণ্ডে রাও হোলকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী এবং একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকেই ইন্দোরের সিংহাসনে বসতে হয়। বলাবাহুল্য, সে সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল না। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের সাহায্যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দোরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক স্যার জন ম্যাল্‌কম লিখে গিয়েছেন—অহল্যাবাঈ সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ও সুশাসক ছিলেন। যেমন ছিলেন দয়ালু, তেমনি কঠোর। শান্তিরক্ষার জন্য একবার তিনি বহু ভীলসর্দারকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈ সারা ভারতে বহু বিধ্বস্ত মন্দিরের সংস্কার-সাধন করেন। তিনি অসংখ্য ধর্মশালা ও তীর্থপথ তৈরি করে দিয়েছেন। নর্মদাতীরে মহেশ্বর ছিল তার প্রিয়তম স্থান। পূর্বে পুরী,

পশ্চিমে দ্বারকা ও প্রভাস, উত্তরে কেদার-বদ্রী ও দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় প্রতিটি প্রধান তীর্থে অহল্যাবাঈ কিছু-না-কিছু কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে এই ধর্মপ্রাণা মহারাণী মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাঈ ভারতের বিভিন্ন বিধ্বস্ত মন্দিরের সঙ্গে সোমনাথ মন্দির সংস্কার-সাধনের জন্যেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা এতই নিখুঁতভাবে সম্রাটের আদেশ পালন করেছে যে প্রচীন মন্দিরের আর সংস্কার-সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং অহল্যাবাঈকে বাধ্য হয়ে প্রাচীন মন্দিরের কাছেই একটি নতুন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করতে হল।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই নতুন সোমনাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হল। শেষ হতে পাঁচ বছর সময় লাগল।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভদিনে সেই নতুন মন্দিরে মহাসমারোহে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে কাজ শুরু করেছিলেন, আড়াই হাজার বছর পরে মহারাণী অহল্যাবাঈ তা শেষ করলেন। একটি মাত্র মন্দিরকে কেন্দ্র করে এমন স্বর্গীয় আত্মত্যাগ এবং এত নারকীয় স্বার্থপরতার নজীর আর নেই মানুষের ইতিহাসে। সোমনাথের ইতিহাস শুধু শাশ্বত ভারতের ইতিহাস নয়, বিশ্বইতিহাসে আদর্শ ও নিষ্ঠার মহত্তম অধ্যায়।

সোমনাথ মন্দির আজও আছে, চিরকাল থাকবে। প্রভাস দর্শনের পরে আমরা এখন সেই চিরকালের সোমনাথ মন্দির দর্শন করতে চলেছি।

॥ আট ॥

'জয় প্রভাস, জয় সোমনাথ। জয়…'

যাঁর কথা ভাবছি, তাঁরই জয়ধ্বনিতে ভাবনা থেমে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। সামনে তাকাই।

হ্যাঁ, ঐতো সামনে, সামান্য দূরে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের কোল ঘেঁষে

দাঁড়িয়ে আছেন সোমনাথ—সোমনাথের নবনির্মিত মন্দির।

যে মন্দিরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য দানবীয় শক্তির পাশব উল্লাসে বার বার কেঁপে উঠেছেন বসুন্ধরা, সেই মন্দির আরও সুন্দর আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আমার সামনে। অগণিত ভক্ত-বৃন্দের জয়ধ্বনিতে আজও সে তেমনি মুখরিত।

আমরাও সোমনাথের জয়ধ্বনি করে নেমে পড়ি টাঙ্গা থেকে। নতুন মন্দিরে পরে যাবো, আগে পুরণো মন্দির দর্শন করে নিই—রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত সোমনাথ মন্দির। তারই সামনে এসে টাঙ্গা থেমেছে।

চারিদিকে দেওয়াল। একতলা মন্দির। ছাদে রেলিং ঘেরা। শ্বেতপাথরের গোলাকার শিখর। 'ওঁ' লেখা গৈরিক কাপড়ের পতাকা উড়ছে।

একপাশে মন্দির তোরণ। সামনে হিন্দী ও ইংরেজীতে লেখা—

'Temple of Somnath

Built by Rani Ahalyabai in A. D. 1783

Old Monument protected by Shri Somnath Trust.'

১১৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল। ১১৯৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী ধরে লিঙ্গমূর্তি অক্ষত রয়েছেন।

ছোট হলেও খুবই মজবুত মন্দির। তোরণের বাদিকে মূল-মন্দির, ডানদিকে একফালি বাঁধানো অঙ্গন। অঙ্গনের শেষে গণপতি, অন্ন-পূর্ণা ও কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির। আমরা দর্শন করি।

মন্দির এলাকার ভেতরেই একটি ছোট ও একটি মাঝারী দোতলা বাড়ি রয়েছে। পাণ্ডাজী বলেন, "এর একটা সেবাইতদের বাসগৃহ, আরেকটি সংস্কৃত টোল। কিছুক্ষণ আগে এলেই ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে পেতেন।"

আমরা অঙ্গন থেকে বারান্দায় উঠে আসি। বারান্দার পরেই গর্ভ-মন্দির। ঠিক কেন্দ্রস্থলে লিঙ্গমূর্তি। ভারতের দ্বাদশ জ্যোতি-র্লিঙ্গের প্রথম এই সোমনাথ। বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যের মতে অপর

এগারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ হল—শ্রীশৈলর মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীর মহাকাল, নর্মদাতীরের অমরেশ্বরে ওঙ্কারনাথ, গাড়োয়ালের কেদারনাথ, ডাকিনীর ভীমশঙ্কর, বারাণসীর বিশ্বেশ্বর, নাসিকের ত্র্যম্বক, দেওঘরে (অনেকের মতে পাঞ্জাবে) বৈদ্যনাথ, দ্বারকায় নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে ঘৃষ্ণেশ্বর।

এই সেই প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ। আড়াই হাজার বছর ধরে কোটি কোটি ভক্ত যাকে একবার দর্শন করবার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে এসেছেন, যাঁর জন্য শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন, তারই সামনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। আবেগ ও উত্তেজনায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমি পুজোর কথা ভুলে গেছি, ভুলে গিয়েছি প্রণাম করতে। শুধু সোমনাথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি অপলক নয়নে

সহসা পাশ থেকে পাণ্ডাজী বলে ওঠেন, "ইনি কিন্তু সোমনাথ নন।"

চমকে উঠি। পাণ্ডাজীর দিকে তাকাই। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "তাহলে?"

"ইনি অহল্যেশ্বর। সোমনাথ রয়েছেন নিচের মন্দিরে। প্রণাম করে চলুন সেখানে।"

আগ্রহের আতিশয্যে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মহারানী অহল্যাবাঈ যখন এ-মন্দির নির্মাণ করেন, তখন পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের নাভিশ্বাস উঠেছে, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহ নিরাপদ হন নি। সোমনাথের নিরাপত্তা আসে নি পরবর্তী পৌনে দু'শ বছরে। এমন কি ভারত স্বাধীন হবার পরেও জুনাগড়ের নবাবের প্ররোচনায় প্রভাসে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা বলবৎ হয়েছিল।

তাই মহারানীকে কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। মাটির ওপরে লোক-দেখানো মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক লিঙ্গমূর্তি। আমরা এখন তাঁকেই বলছি অহল্যেশ্বর।

অহল্যাবাঈ আসল মন্দির নির্মাণ করেছেন মাটির নিচে। সেখানেই

বিরাজ করছেন আমাদের সেই পরম বাঞ্ছিত দেবাদিদেব—চিরমঙ্গলময় সোমনাথ।

বারান্দার বাঁদিকে একটি ছোট দরজা। সেটি পেরিয়ে আমরা মন্দিরের পাশে আসি। এক সারি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচে। না, মোটেই সংকীর্ণ নয়। মিসেস উকিল নামতে পারবেন কষ্ট করে, একটু ধরতে হবে—এই যা। তা সেজন্য তো পাণ্ডাজী, ম্যানেজার ও বাণেশ্বর রয়েছেই।

রয়েছেন উকিলবাবুও, তবে তিনি যথারীতি টাঙ্গায় বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে, সেই একই উত্তর দিয়ে চলেছেন—"সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, নহিলে ঝামেলা বাড়ে।"

বাইশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে। এ-যেন আরেক জগৎ। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত শ্বেতপাথরের ঝক্‌ঝকে মন্দির। মাটির নিচে হলেও মোটেই গুমোট নয়, বেশ হাওয়া খেলছে।

সিঁড়ির শেষে দরজা—রুপোর পাতে মোড়া মজবুত দরজা, এটি মন্দিরের উত্তর দিক। আমরা দরজা পেরিয়ে ভেতরে আসি।

ছাদ থেকে ঘণ্টা ঝুলছে। সামন্তবাবুর দুই কিশোর পুত্র এবং বিউটি ঘণ্টা বাজায়। ঠাকুরমারাও তাদের সঙ্গী হলেন। প্রভাসের মানুষের কাছে এই ঘণ্টাধ্বনিটি বড়ই মধুর, বড়ই প্রিয়। আমারও বড় ভাল লাগছে। আমিও ঘণ্টার দিকে হাত বাড়াই।

মন্দিরের পুবদিকে শ্বেতপাথরের নন্দীমূর্তি। পশ্চিমে কষ্টিপাথরের অপরূপা পার্বতী—যেন স্বয়ং জগজ্জননী দণ্ডায়মানা। দক্ষিণে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর স্নিগ্ধা মূর্তি। আর মাঝখানে···

ঠিক কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত বেদির ওপরে সোমনাথ—ভারতের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ। এই মন-মন্দিরে তিনি সোমনাথ রূপে বিরাজ করছেন।

এমন মসৃণ, এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর শিবলিঙ্গ আমি এর আগে কোথাও দেখি নি। একটি রুপোর সাপ তাঁকে চারবার পাক খেয়ে মাথার ওপরে ফণা ধরে আছে।

আমি প্রণাম করি। প্রণাম করি সর্বমঙ্গলময় সোমনাথকে।

প্রণাম করি প্রাতঃস্মরণীয়া রানী অহল্যাবাঈকে। প্রণাম করি শত-সহস্র শহীদের মৃত্যুহীন প্রাণকে। তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর—আমরা যেন তোমাদের জ্বালিয়ে যাওয়া সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার প্রদীপটিকে অনির্বাণ রাখতে পারি। হে বীরবৃন্দ! তোমরা আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ কর।

অঘোরেশ্বর ও ভৈরবেশ্বরকে দর্শন করে বেরিয়ে আসি অহল্যাবাঈ মন্দির থেকে। সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার একপাশে এই পুরণো মন্দির, আরেকপাশে সাগরতীরে নতুন মন্দির। আমরা এখন ওখানেই চলেছি।

সামান্য দূর, তাই আমি টাঙ্গায় উঠি নি, হেঁটেই চলেছি। তাছাড়া এটি তো কোন সাধারণ প্রান্তর নয়, শত-সহস্র শহীদের রক্তে রাঙা মুক্তিতীর্থ। এখানে দু দণ্ড দাঁড়াতে পারা পরম সৌভাগ্যের।

প্রান্তরের দুই প্রান্তে দুটি মন্দির। বাঁয়ে ও সামনে সীমাহীন সাগর, ডাইনে ও পেছনে শহর।

প্রান্তরের শেষপ্রান্তে, নতুন মন্দিরের সামনে চমৎকার একটি গোলাকার বাগান। তারই মাঝে শ্বেতপাথরের সুউচ্চ বেদির ওপরে বল্লভভাই প্যাটেলের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃত—বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা চলা বন্ধ করি। সর্দারজীর চারিপাশে সারিবেঁধে দাঁড়াই।

প্রতিমূর্তির বেদির ওপরে লেখা রয়েছে—

'Vikramaditya

The Architect and Welder of Bharat

Strong and Great

The Rebuilder and Restorer

Of

SOMNATH

The Shrine Eternal

SARDAR BALLAVBHAI

31st October, 1875—15th December, 1950'

আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

ভারত স্বাধীন হবার পরে সর্দারজী মাত্র সোয়া তিন বছর বেঁচেছিলেন। তারই মধ্যে তিনি 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষতার সুমধুর বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতো কোমল ও কঠিন মানুষ সেদিন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না হলে, হয়তো আজ আমার আসা হত না এই সোমনাথে, দেখা হত না পুণ্যতীর্থ-প্রভাস। হয়তো আমার জন্মভূমির মতো সেও আমার কাছে চিরদিনের জন্য বিদেশ হয়ে যেতো।

বৃটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে ছ'শ'র মতো দেশীয় রাজ্য ছিল, তাদের মধ্যে দু'শ' আঠারটি ছিল শুধু এই সৌরাষ্ট্রে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি।

স্বাধীনতা হস্তান্তরিত করবার আগে বৃটিশ সরকার বললেন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলো আইনসঙ্গতভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। রাজন্যবর্গ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে কিংবা স্বাধীন থাকতে পারবেন।

অনিচ্ছায় হলেও তিনজন রাজা ও নবাব ছাড়া আর সকলেই ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করলেন। কেবল যোগ দিলেন না—কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং, হায়দাবাবাদের নিজাম উসমান আলি খাঁ ও জুনাগড়ের নবাব মহব্বৎ খাঁ রসুলখাঞ্জি। কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের কথা থাক্, জুনাগড়ের কথাই ভাবা যাক্।

জুনাগড় ছিল চৌদসামা বংশীয় রাজপুতদের রাজ্য। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের সুলতান মহম্মদ বেগড়া জুনাগড় অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের গুজরাত জয়ের (১৫৭৩ খ্রীঃ) পরে জুনাগড় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আওরঙ্গজেবের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জুনাগড়ের মোগল শাসক শেরখাঁ বাবি ১৭২৭ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁরই বংশের শেষ নবাব এই মহব্বৎ খাঁ।

নবাবের প্রধান শখ ছিল কুকুর ও শিকার। তাঁর দেড়শ' কুকুর ছিল। প্রত্যেকটির জন্য ছিল পৃথক পরিচালক, শোবার ঘর ও টয়লেট, ডাইনিং টেবল ও খাট-বিছানা। কুকুরের বিয়েতে তিনি [illegible] লক্ষ

টাকা খরচ করতেন।

কিন্তু তিনি খেয়ালী হলেও নির্বোধ ছিলেন না। লর্ড মাউন্টব্যাটন, জাতীয় কংগ্রেস ও কাথিওয়াড়ের রাজন্যবর্গকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই জিন্নাসাহেবের সঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু করে দিয়েছিলেন।

জিন্না জানতেন জুনাগড়ে শতকরা আশিজন অমুসলমান। এবং রাজ্যের চারিপাশেই ভারত। জলপথে করাচী থেকে ভেরাভল প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল। তবু তিনি নবাবকে মদত দিতে থাকলেন। কারণ তিনি জুনাগড়কে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্যের মুসলমান নবাব পাকিস্তানে যোগ দিলে যদি ভারত আপত্তি করে, তাহলে মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দুরাজাও ভারতে যোগদান করতে পারবেন না। আর ভারত যদি কাশ্মীরের স্বার্থে জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি মেনে নেয়, তাহলে হায়দারাবাদের নিজামও পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবেন। তাই করাচী মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা স্যার শাহনাওয়াজ ভুট্টোকে তিনি জুনাগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নবাব তাঁকে দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করলেন।

রাজ্যের জনসাধারণ, বৃটিশ ও ভারত সরকারকে বিস্মিত করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এক প্রেসনোটের মাধ্যমে জুনাগড় সরকার তথা নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি কথা ঘোষণা করলেন। প্রেসনোটে বলা হল—'...After anxious consideration and the careful balancing of the factors, Govt of the state has decided to accede to Pakistan and hereby announces its decision to that effect'. *

১৩ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এই অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করলেন।

ভারত সরকার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। কারণ জুনাগড় শুধু হিন্দু অধ্যুষিত নয়, হিন্দু ও জৈনদের পরম পবিত্র তীর্থ প্রভাস ও গির্ণার জুনাগড় রাজ্যে অবস্থিত। তার ওপরে জুনাগড়

* 'রাজা গেল রাজ্য গেল'—সুনীলকুমার ঘোষ।

পাকিস্তানের মাটি হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তবু ভারত সরকার ধৈর্য ধারণ করলেন।

কিন্তু ধৈর্য ধরলেন না নবাব। তার চেলা-চামুণ্ডারা ও পাইক-বরকন্দাজের দল অকারণে অমুসলমানদের ওপর চড়াও হল। মন্দির মঠ ও গির্জা কলুষিত হল। লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যার তাণ্ডব শুরু হল সারা রাজ্যে। সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও হিন্দুরা ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ আরম্ভ করলেন। তারা সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকলেন।

নবনগরের জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংজী ছুটে গেলেন দিল্লীতে। তিনি ভারত সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—জুনাগড়ের হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলেছে। ভারত সরকার এখনও যদি এর একটা বিহিত না করে, তাহলে সারা কাথিওয়াড়ে মুসলমান নিধন শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত সরকার নবাবকে অনুরোধ করলেন—মানবতার মুখ চেয়ে ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাপালন করুন।

অবিমৃষ্যকারী নবাব সেই অনুরোধকে দুর্বলের আবেদন বলে ভেবে নিলেন। দম্ভভরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন—জুনাগড় মুসলমান রাজ্য, এখানে ইসলামী শাসন বলবৎ হবে।

এ ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করলেন না বল্লভভাই। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জুনাগড় অধিকার করার নির্দেশ দিলেন।

বাদশাজাদার তন্দ্রা গেল ছুটে, খোয়াব গেল টুটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বার গতিবেগের পরিচয় পেয়ে তিনি পরিণাম বুঝতে পারলেন। দেওয়ান স্যার শাহনাওয়াজ ভুট্টোর হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়ে অজস্র ধনরত্ন, চারজন বেগম ও প্রিয়তম কুকুরগুলো নিয়ে বিমান বন্দরে চলে গেলেন। বিমানে সব কুকুরগুলোর জায়গা হবে না শুনে নবাব খুবই দুঃখিত হলেন। এমন সময় একজন বেগম তাঁকে জানালেন—শাহানশাহ ! আসার সময় তাড়াতাড়িতে আপনার শিশুপুত্রকে প্রাসাদে ফেলে এসেছি।

নবাব খুবই বিরক্ত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বেগমকে গালাগালি করলেন। তারপরে কি যেন ভাবলেন একটুকাল। অপেক্ষাকৃত

শান্ত স্বরে বেগমকে বললেন—কি আর করব। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যাও প্রাসাদে, নিয়ে এসো ছেলেটাকে। তাড়াতাড়ি এসো, তোমরা ফিরে আসা মাত্র বিমান ছাড়ব।

খুশিতে ভেঙে পড়লেন বেগমসাহেবা। তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন 'টারমিনাল বিল্ডিংস' থেকে। নবাবজাদা তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে। বেগমসাহেবা গাড়িতে উঠলেন গাড়িটা তীব্রবেগে বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গেল।

নবাব ঘুরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন পরিত্যক্ত কুকুরগুলোর কাছে। দুটি কুকুর দেখিয়ে জনৈক পরিচালককে বললেন—এই কুকুর দুটোকে বিমানে নিয়ে চল্। বেগমের সিটে বসিয়ে দে

বিস্মিত পরিচারক সুলতানের আদেশ পালন করল। সুলতানও সেই সঙ্গে বিমানে উঠলেন। কুকুর দুটিকে একবার আদর করে পায়লটকে বিমান ছাড়ার আদেশ দিলেন। হয়তো বা মনে মনে তখন তিনি নিজের বুদ্ধির তারিফ করে থাকবেন—বেগম পাকিস্তানেও পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে শিশু-পুত্র। কিন্তু কুকুর? তোবা তোবা! এমন কুকুর তিনি কোথায় পাবেন?

পরিত্যক্তা বেগমসাহেবা কিছুক্ষণ বাদে তার শিশু-পুত্রকে নিয়ে নিশ্চয় হাসিমুখেই ফিরে এসেছিলেন বিমানবন্দরে। কিন্তু তিনি নবাব-জাদার সারমেয় প্রীতির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে কি করেছিলেন, তা জানা নেই আমার।

১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী জুনাগড়ে পৌঁছল। স্যার ভুট্টো ভারতীয় সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। জুনাগড় শহরের ঐতিহাসিক 'আপারকোটে' পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে অশোকচক্র-মুদ্রিত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা প্রোথিত হল। সাড়ে ন'শ' বছরের ধর্মান্ধতার অবসান হল। পুণ্যতীর্থ-প্রভাস ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অঙ্গীভূত হল।

মাত্র পাঁচ দিন পরে জামসাহেব দ্বিগ্বিজয় সিংজীকে সঙ্গে করে সর্দারজী প্রভাসে এলেন। প্রভাসের মানুষ আজও ১৯৪৭ সালের

সেই ১৫ই নভেম্বরের কথা ভুলতে পারেন নি। কারণ তার আগে প্রভাস আর কোনদিন অমন প্রাণস্পর্শী উল্লাসে ফেটে পড়ে নি।

সেদিন এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে উচ্ছসিত জনতার প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্দারজী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'The Government of India will rebuild the Temple of Somnath anew. '

তার তিন দিন আগে, দেওয়ালী উপলক্ষে অয়োজিত জুনাগড়ের এক জনসভায় তিনি এই কথা বলেছিলেন—'On this auspicious day of new year, we have decided that Somnath should be reconstructed. You, people of Saurashtra, should do your best. This is a holy task in which all participate.'

তাই প্রভাসের কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা সর্দার প্যাটেল মেমোরিয়াল হল কমিটির সহায়তায় ১৯৭০ সালের ৭ঠা এপ্রিল এই প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন।

সর্দারজীকে প্রণাম করে আমরা সোমনাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। এই মন্দিরের সঙ্গে সর্দারজীর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে, চিরকাল থাকবে।

জামসাহেবকে সভাপতি করে সর্দারজী 'সোমনাথ ট্রাস্ট' গঠন করলেন। তাঁরা প্রথমে কুমারপালের বিধ্বস্ত মন্দিরটি ভেঙে ফেললেন। ১৯৫০ সালের ১৯শে এপ্রিল তৎকালীন সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইউ সি. ধেবর খননকার্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সেই খননকার্য পরিচালনা করেন। তাঁরা প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের আদি-ব্রহ্মশীলা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। সেই ব্রহ্মশিলার ওপরেই বর্তমান জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঐ বছর (১৯৫০) ৮ই মে জামসাহেব মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছর (১৯৫১) ১১ই মে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করলেন। ১৯৬৫ সালের মে মাসে জামসাহেব মন্দিরের কলস প্রতিষ্ঠা ও পতাকা উত্তোলন উৎসব সুসম্পন্ন করেন। বলাবাহুল্য সেই শুভদিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কারণ সেদিন অসংখ্য শহীদের আত্মদান সার্থক হয়েছে, তাঁদের স্বর্গগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করেছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, সেদিন সর্দারজীও ছিলেন না এ-জগতে। কিন্তু সোমনাথের শহীদদের সঙ্গে সেদিন বল্লভভাইয়ের অমর আত্মাও শান্তিলাভ করেছেন।

প্রান্তর পেরিয়ে আমরা মন্দিরদ্বারে আসি। নাম—শ্রীদিগ্বিজয় দ্বার। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের গোপুরমকে স্মরণ করে নির্মিত হলেও আধুনিক শৈলী এর সারা অঙ্গে। তিনটি চূড়াযুক্ত একটি ছোট দু-তলা বাড়ি। মূল্যবান পাথরে তৈরি। চূড়াগুলো চৌচালা, ওপরে শিখর-কলস। নিচের তলার ঠিক মাঝখানে দরজা। দু-পাশে কারুকার্যময় গোলাকার স্তম্ভ। কবাট জোড়া কাঠের। সুলতান মাহ্মুদ যে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, তারও কবাট ছিল কাঠের তৈরি।

তোরণটি লম্বায় ৫৪ ফুট, চওড়ায় ৩১ ফুট এবং ৫১ ফুট উঁচু। নিচের তলায় দরজার দু-পাশে দুটি অলিন্দযুক্ত জানলা। দোতলায় এবং পাশেও এমনি জানলা রয়েছে। দরজার ঠিক ওপরেই হিন্দীতে লেখা—শ্রীদিগ্বিজয় দ্বার।

নতুন সোমনাথ মন্দির নির্মাণের জন্য সর্দারজীর পরেই যাঁর নাম নিতে হয়, তিনি জামনগরের মহারাজা জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংজী। তিনিই নতুন সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরদ্বার।

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী মহারানী গুলাব-কুঁঅরবা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই মন্দিরদ্বার তৈরি করে দিয়েছেন। ১৯৭০ সালের ১৭ই মে শ্রীসত্য সাঁই বাবা এই দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

দিগ্বিজয় দ্বারের শেষে ডানদিকে আরেকটি তোরণ। বোধকরি বিশিষ্ট অতিথিদের গাড়ি চড়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করার জন্য। আমরা যেমন বিশিষ্ট নই, তেমনি আমাদের গাড়ি নেই। আমরা পায়ে হেঁটে দিগ্বিজয় দ্বার পেরিয়েই মন্দির চত্বরে আসি।

প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝখানে মন্দির—সোমনাথের মন্দির। পোষাকী

নাম—মহামেরু প্রাসাদ। প্রাসাদই বটে। যেমন গড়ন, তেমনি অবস্থান। সীমাহীন সাগরসৈকতে দাঁড়িয়ে সহাস্যে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের।

সারা মন্দির এলাকাটি দেওয়ালে ঘেরা। প্রচুর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে ভেতরে। এমন ফাঁকা অবশ্য থাকবে না চিরকাল। এখানে তৈরি হবে নৃত্য-মণ্ডপ বা উপাসনা গৃহ তৈরি হবে আরও অনেক ছোট-বড় মন্দির। নৃত্য-মণ্ডপটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে ৭৫ ফুট আর উচ্চতা ৫৫ ফুট। শ্রীসোমনাথের কৃপায় সোমনাথ ট্রাস্টের পরিবর্ধন পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠবে। ভাবীকালের পুণ্যার্থীদের সেই বৃহত্তর মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হবে।

দিগ্বিজয় দ্বার পেরিয়েই প্রশস্ত অঙ্গন। তারই মাঝে, মন্দিরের সামনে, অর্ধচন্দ্রাকারে কয়েকখানি পাথরের বেঞ্চি—যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য। তারপর মন্দিরের সিঁড়ি।

সামনে তিনতলা নাট-মন্দির, পেছনে উচ্চতর গর্ভ-মন্দির। মন্দিরশীর্ষে শিখর কলস, ত্রিশূল ও পতাকা—জয় পতাকা। অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় ঘোষণা করছে।

কয়েক পা হেঁটে সিঁড়ির সামনে আসি। আমি এসেছি সেই পুণ্যভূমিতে, যেখানে পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষ মহাদেবের পূজা করেছে, যেখানে ব্রহ্মার নির্দেশে চন্দ্র ডিম্বাকৃতি স্বয়ম্ভু স্পর্শলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মা নিজেই নাকি ব্রহ্মশিলার ওপরে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। তার আগে এখানে ভৈরবনাথের লিঙ্গমূর্তি পুজো করা হত।

সেই ব্রহ্মশিলাকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্ট জন্মের বহু আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম মন্দির। হাজার খানেক বছর ধরে সে মন্দিরে সোমনাথের পূজা হয়েছে। তারপরে তার ধ্বংসাবশেষের ওপরেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় এবং লাল পাথরের তৃতীয় সোমনাথ মন্দির। ১০২৬ সালে সুলতান মাহমুদ সে মন্দির ধ্বংস করেন।

সিন্ধুর সংস্কৃতিবান পর্যটক ও ঐতিহাসিক আল বিরুণি সেবারে

মাহ্‌মুদের সঙ্গে সোমনাথে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা সেই ধ্বংসলীলার বর্ণনা পাই। বিরুণি লিখেছেন, 'মাহ্‌মুদ আদেশ দিলেন—লিঙ্গমূর্তির উপরাংশ ভেঙে ফেল। কাসার পাতে মোড়া মধ্যাংশের কাঁসা খুলে নিয়ে অশ্ববাহিনীর সামনে ফেলে দাও, যাতে কাফেরদের ঐ মূর্তি আমার ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়। আর সোনার পাতে মোড়া মূর্তির শেষাংশ গজনীতে নিয়ে চল। সোনা খুলে নিয়ে আমি ঐ পাথরটাকে আমার মসজিদ দ্বারে রেখে দেব।'

আল বিরুণির বিবরণ থেকে আমরা সেকালের লিঙ্গমূর্তি ও তাঁর পূজার কথাও জানতে পারি। তিনি লিখে গিয়েছেন—'সোমনাথ মন্দিরে মূর্তির স্নান ও পূজার জন্য প্রতিদিন গঙ্গা (অর্থাৎ প্রয়াগ) থেকে এক কলসী গঙ্গাজল এবং কাশ্মীর থেকে এক ঝুড়ি ফুল আসত।' সেই অশ্বযানের যুগে এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি হতে পারে?

আল বিরুণি মাহ্‌মুদের সঙ্গে সোমনাথে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর লুণ্ঠনের সহযোগী ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। তাই মাহ্‌মুদ যখন হিন্দু নিধন ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি তখন কোন হিন্দু পণ্ডিতের কাছে বসে সংস্কৃত-সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র ও বেদান্ত প্রভৃতির পাঠ নিতেন। মাহ্‌মুদ কখনও তার কথা শোনেন নি, তার বই পড়েন নি। উপরন্তু এই মানবতাবোধের জন্য তাঁকে মাহ্‌মুদের অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে। তাহলেও এই সুপণ্ডিত এবং সত্যদ্রষ্টা পর্যটক লিখে গিয়েছেন, 'হিন্দুরা বিশ্বাস করে, সোমনাথের পূজা করলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়, সব আশা পূর্ণ হয়।'

এ-বিশ্বাস আজও আছে। আর তাই আমার অধিকাংশ সহযাত্রী আজ এসেছেন এখানে। কিন্তু আমি সোমনাথকে বিশ্বাস করলেও কোন প্রত্যাশা নিয়ে আসি নি। আমি এসেছি তাঁকে দর্শন করতে, আমার ভক্তি নিবেদন করতে।

সহযাত্রীরা সবাই তাই এগিয়ে গিয়েছেন সামনে, তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। আর আমি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কথাই ভেবে চলেছি।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চালুক্য রাজারা সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে চতুর্থ মন্দির নির্মাণ করেন। মহারাজা কুমারপাল দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি এখানে সেই একই জায়গায় পঞ্চম মন্দির নির্মাণ করেন।

কুমারপালের মন্দিরই মেরু-প্রাসাদ নামে সুপরিচিত হয়। সেই মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী পর্যটক লিখেছেন—'August like unto Mount Kailasa.' শিবালয় কৈলাস পর্বতের গড়নেই নাকি তৈরি করা হয়েছিল মন্দিরটি। চূড়াটি ছিল সোনার পাতে মোড়া। মন্দিরের সঙ্গে ছিল সুবিরাট নাট-মন্দির। সুন্দর ও মজবুত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটি। অশ্বখুরাকৃতি একটি বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি।

শুধু সোমনাথের মন্দির নয়, মহারাজা কুমারপাল সেই মন্দির এলাকার মধ্যেই নির্মাণ করেছিলেন গৌরী, ভীমেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পাপমোচনের মন্দির। সেগুলির শিখরও সোনার পাতে মোড়া ছিল। পাপমোচনের মূর্তিটি ছিল তিন মানুষ উঁচু। কুমারপাল এখানে একটি মিঠে জলের সরোবর খনন করিয়েছিলেন।

পরধর্মদ্বেষী হানাদারের দল যুগে যুগে সে দেবালয়ের দ্বারে চড়াও হয়েছে। নানা ভাবে তারা সে মন্দিরকে আঘাত করেছে, বার বার ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারে নি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সোমনাথ মন্দির লক্ষ লক্ষ হানাদারদের সকল আঘাত সয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—ভক্তি ভারতের আত্মা এবং আত্মা অবিনশ্বর।

সেই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই সর্দারজী সেদিন নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই ভগ্ন মেরু প্রাসাদকে ভেঙে ফেলেই তৈরি করা হয়েছে এই মন্দির—মহামেরু প্রাসাদ। এ যেন সেই রূপকথার পাখি 'ফীনিক্স' (Phoenix), যে নিজে-নিজে পুড়ে মরত। তারপরে নিজের ভস্ম থেকেই নবদেহ ধারণ করে আবার বেঁচে উঠত।

কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের কথা আর নয়, এবারে নতুন মন্দির দর্শন

করা যাক্। আমি এগিয়ে চলি। শুধু সুরম্য নয়, সুবিশালও বটে। পূর্বমুখী মন্দির। ১২৫ ফুট দীর্ঘ ও ১১৫ ফুট প্রশস্ত। শিখর সহ গর্ভ-মন্দিরের উচ্চতা ১৫৫ ফুট আর সভামণ্ডপটি ৭৫ ফুট উঁচু। মন্দির নির্মাণ করতে পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি সভামণ্ডপে। সাদা ও কালো মর্মর পাথরে বাঁধানো মসৃণ মেঝে। মাঝখানে শ্বেতপাথরের পূর্ণাবয়ব নন্দীমূর্তি।

"সেকি! ঘোষদা, আপনি এখনও এখানে! আমাদের তো দর্শন হয়ে গেল। আমরা ওপরে যাচ্ছি।"

সাহাবাবুর ডাকে ফিরে তাকাই। বলি, "ওপরে যাচ্ছেন কেন? সেখানে কি আছে?"

'History of Somnath through the ages in Pictures.' অমিয়বাবু মাঝখান থেকে উত্তর দেন।

বলি, "বেশ তো যান।"

"আপনি যাবেন না মামু?" বিউটি জিজ্ঞেস করে আমাকে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ যাবো, একটু বাদে। আগে সোমনাথজীকে দর্শন করে নিই।"

ওরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়, আমি এসে দাঁড়াই গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে। সামনে কারুকার্যময় শ্বেতপাথরের রেলিং, তারপরে দরজা—রুপোর পাতে মোড়া।

দরজার সোজাসুজি মন্দিরের মাঝখানে গোলাকার সুদৃশ্য বেদির ওপরে সোমনাথ—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম মূর্তি। সুবিশাল ও সুন্দর শিবলিঙ্গ। এতবড় শিবলিঙ্গ এর আগে আমি কোথাও দেখি নি। ভারতের আর কোথাও আছে বলেও শুনি নি। জানি না এটি বিশ্বের বৃহত্তম লিঙ্গমূর্তি কিনা?

সোমনাথের মাথার ওপরে রুপোর ছত্র এবং জলপাত্র। ফোটা ফোটা জল পড়ছে শিবের মাথায়। একটি রুপোর সাপ চারবার পাক খেয়ে সোমনাথকে বেষ্টন করে পেছন থেকে তাঁর মাথার ওপরে ফণা তুলে আছে।

লিঙ্গমূর্তির গায়ে 'ওঁ' লেখা। বেদির ওপরে ফুল-বেলপাতার

সমারোহ। প্রতি মুহূর্তে দলে দলে নতুন ভক্ত আসছেন। তাঁরা তাঁদের অন্তরের নৈবেদ্যের সঙ্গে ফুল-বেলপাতার ডালি নিয়ে আসছেন। নিয়ে আসছেন দুধ এবং গঙ্গাজল। তারা সোমনাথকে স্নান করাচ্ছেন, সোমনাথের পুজো করছেন। শিবের মতো এমন উদার দেবতা যে আর নেই ত্রিভুবনে। যে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, যেভাবে ইচ্ছে তাঁর পুজো করা যায়। তার কাছে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল কোন পার্থক্য নেই। ভক্তি ভরে একবার ডাকলেই তিনি তাকে কৃপা করেন।

সোমনাথের ঠিক পেছনে দেওয়ালের ধারে গেরুয়া রঙের কাপড় পরা শ্বেতপাথরের আনন্দ্যসুন্দর বিষ্ণুমূর্তি। তাঁর দু'পাশে দু'খানি কাঠের চৌকির ওপরে শিবের দু'টি আবক্ষমূর্তি। পেছনের দেওয়ালে ব্রহ্মা ও পার্বতী প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি টাঙানো রয়েছে।

মানুষের ভগবান বলেই বোধহয় ভক্তদের জন্য এ মন্দিরের দ্বার সারাদিনই উন্মুক্ত। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দু'টো, বিকেল তিনটে থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত, যে-কোন সময় দর্শন করা যায় সোমনাথকে। প্রতিদিন সকাল সাতটা ও দুপুর বারোটায় সোমনাথের আরতি হয়।

দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণের পরে আমি বেরিয়ে আসি সোমনাথ মন্দির থেকে। সহযাত্রীরা এখনও ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইতিহাসের সোমনাথকে দেখছেন। আমারও সেখানে যাবার কথা। কিন্তু আমি হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের পেছনে সাগরতীরে এসে দাঁড়াই। তাকিয়ে থাকি বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের দিকে। অনন্তকালের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আমি ইতিহাসের সোমনাথকে স্মরণ করি।

মহাসাগর মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। এই তরঙ্গসঙ্কুল সাগর বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে প্রতিদিন সোমনাথকে দেখেছে। মহাপণ্ডিত চাণক্য থেকে মহানায়ক বল্লভভাই পর্যন্ত সবাই তার সুপরিচিত। সোমনাথের সমস্ত ভাঙা-গড়ার কাহিনীকে বুকে নিয়ে সে নির্বিকার রয়েছে। একই ভাবে বয়ে চলেছে। সে চির-প্রবহমান। একটি দিনের তরেও তার চলা বন্ধ হয় নি। দুঃখে সে যেমন ভেঙে পড়ে নি, তেমনি সুখের দিনেও কর্তব্য বিস্মৃত হয় নি।

সর্বদা তার তরঙ্গবাহু দিয়ে সোমনাথের পা ধুয়ে দিচ্ছে।

সাগর নির্বিকার। কারণ সে জানে সোমনাথ সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। তিনি চিরবিরাজমান এই পুণ্যতীর্থে। এই মন্দির বা লিঙ্গমূর্তি উপলক্ষ্য মাত্র। দেবালয় বা বিগ্রহ চূর্ণ করলেই এ ভূমি কলুষিত হয় না।

সাগর জানত শত মাহ্‌মুদের সাধ্য ছিল না সোমনাথকে ধ্বংস করে, সহস্র আওরঙ্গজেবের শক্তি ছিল না সোমনাথকে মুছে ফেলে। সে জানত সোমনাথ ঠাই নিয়েছেন কোটি কোটি মানুষের মনে। তাঁর ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত নেই। তাঁর ইহকাল ও পরকাল নেই। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।

তাই তো আড়াই হাজার বছর পরে পূব-সমুদ্রের তীরভূমি থেকে আমি ছুটে এসেছি এই পশ্চিম সমুদ্র-সৈকতে।

এসেছি চিরকালের সোমনাথকে দর্শন করতে। এসেছি ভক্তের ভগবানকে প্রণাম জানাতে। এসেছি শাশ্বত ভারতের আত্মাকে আমার প্রাণের নৈবেদ্য নিবেদন করতে।

॥ নয় ॥

সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্বতীর মন্দিরে আসি। সাহা-বাবুদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তাঁরাও পার্বতী মন্দির দর্শন করতে এসেছেন।

ছোট হলেও সুপ্রাচীন মন্দির। পাণ্ডাজী বললেন, "দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কুমারপাল সোমনাথ মন্দিরের সঙ্গে এ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি আজ সেকালের স্মৃতি-মন্দির।"

ছোট বলেই হয়তো পরধর্মবিদ্বেষীদের তেমন নজর পড়ে নি এই মন্দিরের দিকে। শাশ্বত ভারতের প্রতিনিধিরূপে আজও সে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সোমনাথ ট্রাস্ট কেন এ মন্দিরটির সংস্কার সাধন করছেন না, বুঝতে পারছি না।

হনুমানজী, মহাকালী ও বিনায়ক মন্দির দর্শন করে সহযাত্রীদের

সঙ্গে বীর হমীরজীর স্মৃতি-মন্দিরে আসি। স্থানীয় নাম 'হমীরজী লাঠিয়ার দেরী'। লাঠি গ্রামের মানুষ বলে তাঁকে লাঠিয়া বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন গোহিল বংশীয় রাজপুত। গুজরাতী 'দেরী' শব্দের অর্থ স্মৃতি-মন্দির। কৃতজ্ঞ প্রভাসবাসীরা প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে সেই অমর শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন। সোমনাথ মন্দিরের আঙ্গিনায় হনুমান মন্দিরের পাশে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর স্মৃতি-মন্দির। আমার মতো শত শত দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে দাঁড়িয়ে হমীরজীর প্রতি তাদের অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করে যায়।

সোমনাথের সেই সুমহান ভক্ত ও দেশপ্রেমিকের কথা মনে পড়ছে আমার। সশ্রদ্ধচিত্তে আমি সেই আত্মত্যাগের কাহিনী ভেবে চলি—

সৌরাষ্ট্রে খবর এসে পৌঁছল নিষ্ঠুর ও পরধর্মদ্বেষী মহম্মদ বেগড়া সোমনাথ লুঠ করতে আসছেন। বেগড়া ও বেগড়ো মানে যাযাবর। মহম্মদ আমেদাবাদের সুলতান হলেও ছিলেন একজন যাযাবর দস্যু।

লাঠি গ্রামের ভীমজী গোহিলের ছোট ছেলে হমীরজী তখন বাড়িতেই ছিলেন। কথাটা কানে এলো তার। তিনি বিচলিত হলেন। কিন্তু ভাবলেন দুর্দান্ত দস্যু মহম্মদের বিরুদ্ধে তিনি কীই-বা করতে পারেন?

খেতে বসে তিনি বৌদিকে বললেন কথাটা। বৌদি চমকে উঠলেন। বললেন—যবনরা আবার সোমনাথকে কলুষিত করতে আসছে শুনেও তুমি চুপ-চাপ বসে রয়েছো! তুমি না রাজপুত, তুমি না ক্ষত্রিয়!

হমীরের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নতমস্তকে বসে রইলেন। তারপরে বৌদির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—দুর্ধর্ষ মহম্মদের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি বলো?

সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুত রমণী গর্জে উঠলেন—তুমি নিজের প্রাণের বিনিময়ে সেই যবনটাকে বধ করে ভূভার লাঘব করতে পারো।

—কিন্তু আমি যে দুর্বল?

—বাহুবল তুচ্ছ, মনোবলই মানুষের মূল শক্তি। তুমি যাচ্ছ শহীদ হতে আর সে আসছে লুঠ করতে। ওরা তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে

কেন?

উত্তেজিত হমীর খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। বৌদি তাঁর হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। সস্নেহে বললেন—এখুনি যাচ্ছ কোথায়? রওনা তো হবে কাল সকালে। আমি তোমার দাদাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে পথের খাবার যোগাড় করে আনছি। কাল সকালে স্নান ও পূজো করে প্রসাদ নিয়ে রওনা হবে প্রভাসের পথে। সারাদিন হাঁটতে হবে। এখন খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়।

তাই করলেন হমীর। পরদিন সকালে তার গোত্র ও গ্রামের মানুষ, তাঁর দাদা ও বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি রওনা হলেন প্রভাসের পথে। না, একা নয়, লাঠি গ্রামের আরও দু শ' জন যুবক তার সঙ্গী হলেন। হমীরের বৌদির মত, তাদের মা বোন-স্ত্রী ও কন্যারাও হাসি মুখে বিদায় দিলেন সে বীর রাজপুতদের। চোখের জল ফেলে কেউ তাদের যাত্রাপথকে পিচ্ছিল করে তুললেন না।

সারাদিন হেঁটে সেদিন সন্ধ্যায় তারা সরোড পাহাড়ের পাদদেশে শিহোর গ্রামে পৌঁছলেন। যাযাবর গ্রামবাসীদের সর্দার বেগড়া ভীল তাদের আতিথ্য দান করলেন। রাতে খেতে বসে কথায় কথায় ভীল হমীরকে জিজ্ঞেস করলেন—তা তোমরা এমন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সোমনাথ চলেছো কেন?

হমীর তার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারলেন, তিনি মহম্মদ বেগড়ার সোমনাথ আক্রমণের খবর পান নি। তিনি তাকে সবকথা খুলে বললেন।

দিলখোলা ও হাসিখুশি মানুষটি সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটুকাল চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—সেই শয়তানটা বুঝি সোমনাথেও আসছে। ভালই হল, সেও বেগড়া আমিও বেগড়া। দুই যাযাবর একবার মুখোমুখি হওয়া যাক্।

—আপনি যাবেন? আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন হমীর। পরিবেশনরতা ভীলের কিশোরী কন্যার হাত থেকে হাতাখানি মাটিতে খসে পড়ে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের জন্য লজ্জা পেলেন হমীর।

শান্তকণ্ঠে সর্দার বললেন—হ্যাঁ, আমিও যেতে চাই তোমার সঙ্গে। শুধু যাওয়া নয়, প্রাণপণ করে সেই পাষণ্ডটার সঙ্গে লড়াই করতে চাই। কিন্তু আমার যে হাত-পা বাঁধা।

—কেন? প্রশ্ন করলেন হমীর।

মেয়েকে দেখিয়ে সর্দার উত্তর দিলেন—আমি যে ওর মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাকে কথা দিয়েছি, ওর বিয়ে না দিয়ে আমি আর কখনও যুদ্ধে যাবো না।

বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবারে সেই কিশোরী রাজপুতানী কথা বলে। হমীরকে লক্ষ্য করে সে তার বাবাকে বলে—ওনাকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাকে পায়ে ঠাঁই দেবেন কিনা?

সর্দার চমকে ওঠেন। বিস্মিত হমীর কিশোরীর দিকে তাকান। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ে।

হমীর চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু কিশোরী এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। করুণ কণ্ঠে বলে—বাবার হয়ে আমিই জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, আপনি কি আমাকে পায়ে ঠাঁই দেবেন না?

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় হমীর। বলে—পায়ে নয়, তোমার স্থান আমার মনে। কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যাচ্ছি। হয়তো আর ফিরে আসব না সোমনাথ থেকে।

—কেন আসবে? তুমি যে সোমনাথেই থাকবে—যুগ থেকে যুগান্তরে। তাই তো আমি তোমার গলায় মালা দিতে চাইছি। তোমার পুণ্যে আমিও অমর হব।

সেদিন রাতেই বিয়ে হল তাদের। সামাজিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে সূর্যোদয়ের সামান্যই দেরি ছিল। সেই সময়টুকু কিশোরী তার স্বামীর বুকে মাথা রেখে বাসর জাগল।

ভোরের পাখি ডেকে উঠতেই কিশোরী উঠে বসল। স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

না, সে কাঁদল না। উদীয়মান সূর্যের কাছে করজোড়ে কামনা করল—তোমার কিরণরশ্মির মতো আমার স্বামীর বীরগাঁথায় বসুন্ধরা

উদ্ভাসিত হোক্।

তারপরে সে নিজের হাতে স্বামীকে বীরের পোষাক পরালো। হাসিমুখে পিতা ও পতিকে প্রভাসের পথে বিদায় দিল—শেষ বিদায়।

হমীর ও ভীল তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় প্রভাস দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হলেন। দুর্গের প্রহরীরা পরম সমাদরে তাঁদের বরণ করলেন। হমীর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ভীল বললেন—আমি বেগড়া, আমি যাযাবর। তোদের পাথুরে ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি দুর্গের বাইরেই থাকব।

—কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, মহম্মদ এসে গিয়েছে। আজ রাতেই সে আমাদের আক্রমণ করবে।

হাসতে হাসতে ভীল বললেন—তাই তো আমি বাইরে থাকতে চাই। তোমাদের আগেই আমি তার সঙ্গে মোলাকাত করব। সেও বেগড়া, আমিও বেগড়া। আগে দুই বেগড়ায় বোঝাপড়াটা হয়ে যাক্।

প্রহরীদের অনুমান সত্য হল। শেষ রাতেই মহম্মদের সৈন্যরা প্রভাস দুর্গ আক্রমণ করল। ভীল ও হমীর তাঁদের সঙ্গীদের সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন।

তাঁরা সোমনাথকে রক্ষা করতে পারলেন না। কিন্তু কিশোরীর কামনা পূর্ণ হল। আজও লোক-গায়করা গুজরাতের পথে পথে হমীরজীর বীরগাথা গেয়ে চলেছেন। প্রভাত-সূর্যের কিরণরশ্মির মতই হমীরজী গোহিলের বীরগাথায় বসুন্ধরা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। বীর হমীরের সঙ্গে তাঁর কিশোরী কুলবধূও অমর হয়ে রয়েছে গুজরাতের ইতিহাসে।

হমীরজীর স্মৃতিমন্দিরে প্রণাম রেখে আমরা হাঁটতে থাকি দিগ্বিজয় দ্বারের দিকে। চলতে চলতে বিউটি জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা মামু, বেগড়া ভীলের কোন শহীদস্তম্ভ নেই এখানে?"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই পাণ্ডাজী উত্তর দেন, "আছে। একটু দূরে, ঐ ভাটিয়া ধর্মশালার কাছে।"

"আরেকটা কথা…" বিউটি আমার দিকে তাকায়।

"বল।"

"হমীরজীর সেই কিশোরী বধূর কি হল?"

বিউটি কলেজে পড়া আধুনিকা তরুণী। স্বাভাবিক ভাবেই সেই কিশোরীর জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার সম্পর্কে লোক গায়করা যে একেবারেই নীরব। আমার যে কিছুই জানা নেই তার কথা। আমি চুপ করে থাকি।

বিউটি বোধহয় বুঝতে পারে আমার অসহায় অবস্থা। সে নিজেই বলে, 'হমীরজীর বীরত্ব নিয়ে রচিত হয়েছে লোকগীত। তার বাবার আত্মোৎসর্গের কথাও ঠাই পেয়েছে সেই গানে। মাতৃহারা সেই কিশোরীর আত্মত্যাগও কিছু কম নয়। বরং বেশিই বলা চলে। জীবনে সে মাত্র ক'ঘণ্টা স্বামীসঙ্গ লাভ করেছে। পিতা ও স্বামীকে সে অঞ্জলি দিয়েছে সোমনাথের পায়ে। তারপরে সেই শোকস্মৃতি বুকে নিয়ে সারাজীবন চোখের জল ফেলেছে। অথচ গীতিকাররা তার সম্পর্কে বোধহয় অখণ্ড নীরবতা পালন করে গিয়েছেন। কেবল কাব্যে উপেক্ষিতাদের দলে কিশোরীর নাম যুক্ত হয়েছে।" শেষ করে বিউটি তার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আমি চুপ করে থাকি। শুধু আমি নই, আমার সহযাত্রীরা সবাই নীরবে পথ চলছেন। বিউটির অভিযোগ খণ্ডন করার মতো কোন যুক্তি জানা নেই তাঁদের।

একটু বাদে বোধহয় অস্বস্তিকর নীরবতার অবসান করবার জন্য ম্যানেজার কথা বলে, "সোমনাথে প্রতিদিনই শত শত যাত্রী আসেন। তবে এখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় কার্তিকী পূর্ণিমাতে। সেদিন মেলা বসে এই মন্দির চত্বরে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার যাত্রী আসেন এই পুণ্যতীর্থে।"

মন্দির এলাকার বাইরে বেরিয়ে আসি। ইচ্ছে ছিল একবার সোমনাথ ট্রাস্টের অফিসে যাবো। দেখা করব এস্টেট ম্যানেজারের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের ম্যানেজার জানালো, "এখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া সেখানে আবার আপনার কি দরকার?"

হেসে বলি, "ভাবছিলাম একবার এস্টেট ম্যানেজারকে বলব, আপনারা আগ্রাদুর্গ থেকে প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের দরজাজোড়া

নিয়ে আসুন। সেই অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনকে এখানেই সংরক্ষণ করুন, তাতে এই মন্দিরের মূল্য যাবে বেড়ে।"

"সাধু প্রস্তাব।" ম্যানেজার মন্তব্য করে। "তবে এ-সব কথা এস্টেট ম্যানেজারকে বলে তেমন লাভ হতো না। তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে জামনগরের ট্রাস্টের হেড-অফিসে চিঠি লিখবেন।"

"আজকাল সোমনাথ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কে?"

"শ্রীমোরারজীভাই দেশাই।"

সহসা সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়তে আমার স্থানীয় যাদুঘর দেখতে যাবো। নিমন্ত্রণ দিয়েছে তারা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি, "আর কতক্ষণ আমরা আছি এখানে?"

"কেন মিউজিয়ামে যাবেন?"

"একবারটি দেখে এলে হতো।"

"বেশ তো চট করে ঘুরে আসুন। দেখবেন, বেশি দেরি করবেন না যেন।" সে ইশারা করে রাস্তাটি দেখিয়ে আবার বলে, "কয়েকপা' হেঁটেই একটা চৌরাস্তা। বাজার ছাড়িয়েই মিউজিয়াম। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসবেন কিন্তু। সন্ধের আগেই ভালকাতীর্থে পৌঁছতে হবে।"

'কণ্ডাক্টেড ট্যুর'। সুতরাং নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবার অধিকার যেমন নেই, তেমনি ক্ষমতা নেই ম্যানেজারের নির্দেশ অমান্য করবার। অতএব মাথা নেড়ে জোর কদমে এগিয়ে চলি।

দোকান-পাট ও বাড়ি-ঘরের গা ছুঁয়ে পথ। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

থামতে হয়। পথের ডানদিকে বাড়ি-ঘরের পেছনে ঝকঝকে একটি উঁচু মন্দির। জৈন শিল্পরীতিতে তৈরি। কার মন্দির? একবার দেখে গেলে হতো। আমি ঘড়ির দিকে তাকাই।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক প্রৌঢ় এগিয়ে আসেন আমার কাছে। হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, "যাবেন নাকি দর্শন করতে?"

আমি আবার ঘড়ির দিকে তাকাই।

ভদ্রলোক বলেন, "বেশি সময় লাগবে না। চলুন, চট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাকে একটা টাকা দেবেন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সময় কম, অথচ দর্শন করতেও ইচ্ছে করছে। একে সঙ্গে নিলে সুবিধাই হবে। বলি, "চলুন, চট করে দেখিয়ে দেবেন।"

"তাই দেবো, আসুন।"

আমি পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করি।

ভদ্রলোক চলতে চলতে বলতে থাকেন, "এই মন্দিরের নাম—গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ। ১৯৫২ সালে নির্মিত। এটি প্রভাসের বৃহত্তম জৈন মন্দির। চন্দ্রপ্রভ প্রভুর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

"প্রভাস হিন্দুদের মতো জৈনদের কাছেও পুণ্যতীর্থ। জৈন ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে বহুবার প্রভাসের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর পুত্র ভরতরাজ প্রভাস দর্শনে এসেছিলেন। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে অষ্টম জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীচন্দ্রপ্রভ প্রভু এখানেই জন্মগ্রহণ করবেন। তাই ভরতরাজ এখানে এসে জনপদের পত্তন করে একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

"দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ প্রভুর নির্দেশে সম্রাট সগরও এখানে এসেছিলেন। যথাসময়ে এক পৌষ ত্রয়োদশী তিথিতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা মহাসেনের ঔরসে রানী লক্ষ্মণার গর্ভে প্রভাসের চন্দ্রপুরী নগরীতে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর জন্ম হয়। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি তৎকালীন প্রভাসের রাজা চন্দ্রযশাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন।

"মহারাজা চন্দ্রযশা চন্দ্রপ্রভ প্রভুকে খুবই ভক্তি করতেন। তাই দীক্ষা নেবার আগেই তিনি তার প্রাসাদে চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর একটি মণিময় মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রাজর্ষি চন্দ্রশঙ্কর রাজা চন্দ্রযশাকে বলেছিলেন—যেহেতু ভগবান চন্দ্রপ্রভ এখানে বিরাজ করছেন, সেইহেতু এই পুণ্যতীর্থ জগতে চন্দ্রপ্রভাস নামে বিখ্যাত হবে।

"আর সেই দীক্ষান্ত ভাষণে চন্দ্রপ্রভ প্রভু ঘোষণা করেছিলেন—সকল তীর্থের সেরা এই তীর্থ।

"ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ প্রভুও প্রভাসকে পুণ্যতীর্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাই প্রত্যেক যুগে বিশিষ্ট জৈনভক্তরা প্রভাস দর্শনে এসেছেন। এবং সে আসা যাওয়া আজও চলেছে, চিরকাল চলবে।"

আমরা মন্দির তোরণে আসি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে অঙ্গন পেরিয়ে উঠে আসি মন্দিরে। তিনটি অংশে বিভক্ত, তিনতলা মন্দির। পথপ্রদর্শক দাবী করেন, 'ভরতরাজ এখানেই প্রথম মন্দির নিমাণ করেছিলেন। একই জায়গায় ১৯৫১ সালে এই নতুন মন্দির তৈরি করা হয়েছে। তিনটি শিখরযুক্ত এই মন্দিরটি লম্বা ও চওড়ায় ১০০ ফুট এবং ৮৫ ফুট উঁচু।"

পথপ্রদর্শকের সঙ্গে মূল-মন্দিরে আসি। মহাস্থানে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। আমার প্রশ্নের উত্তরে পথপ্রদর্শক বলেন, "মূর্তিটির উচ্চতা পৌনে চার ফুট।"

মূল-নায়কের ডানদিকে শ্রীশীতলনাথজী, শ্রীসুবিধিনাথজী, শ্রীসম্ভবনাথজী ও শ্রীচিন্তামণি পার্শ্বনাথজীর মূর্তি। আর তার বাঁয়ে রয়েছেন শ্রীমল্লনাথজী, শ্রীচন্দ্রপ্রভজী এবং শ্রীপার্শ্বনাথজীর প্রতিমূর্তি। আমি দর্শন করি।

নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, এই মন্দিরটি দর্শন না করলে যে পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের অনেকখানিই অদেখা রয়ে যেত। ভাগ্যিস ভদ্রলোক পেটের দায়ে পথে দাঁড়িয়েছিলেন।

গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ তথা চন্দ্রপ্রভ মন্দির থেকে নেমে আসি নিচে। পথপ্রদর্শকের সঙ্গে দর্শন করি মল্লীনাথজী, মহাবীরজী, অজিতনাথজী ও ঋষভদেবের মন্দির।

পথপ্রদর্শক বলেন, "আপনার সময় নেই, নইলে আপনাকে নিয়ে যেতাম মেরীয়াকাকায়।"

"সে আবার কোথায়!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"হিরণ্য নদীর তীরে একটি রমণীয় স্থান মেরীয়াকাকা—জৈনদের এক পরম-পবিত্র ক্ষেত্র।"

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে আসি পথে। এবারে পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাঁকে দিতে হবে দর্শনী।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখানি দু'টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিই। একটুকাল চুপ করে থেকে তিনি নোটখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেন।

বিরক্ত হই। এক টাকার জায়গায় দু'টাকা দিলাম, তাও নিতে চাইছে না। লোকটা তো ভারী মতলববাজ। কর্কশ স্বরে বলি, "টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর দেন ভদ্রলোক, "আমার কাছে যে এক টাকা নেই।"

নিজের মানসিকতার জন্য মনে মনে লজ্জা পাই। ছি ছি! এই সরল ও সৎ মানুষটিকে আমি মতলববাজ বলে ভেবে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তার হাতখানি ধরে বলি, "আপনাকে একটাকা আর ফেরৎ দিতে হবে না। আপনি এই দু'টাকাই নিন।"

"কিন্তু⋯ ."

"কোন কিন্তু নয়। আমি খুশি হয়েই আপনাকে এক টাকা বেশি দিলাম।"

প্রৌঢ়ের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তবু তিনি হাতখানি কপালে ঠেকিয়ে অব্যক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "সুখী হও বাবা। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।"

আমারও চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি তাকে নমস্কার করে আমি এগিয়ে চলি আপন পথে। আমি যে পথিক। পথের মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হবার অবকাশ নেই আমার। আমাকে অবিচলিত মনে ও ক্লান্তিহীন চরণে পথ চলতে হবে।

জৈন-মন্দির ছাড়িয়ে কয়েকপা এগিয়েই পথের বাঁদিকে প্রভাসের যাদুঘর—'Prabhaspatan Museum, Dept. of Museum, Gujrat State'.

ভেতরে ঢুকে চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা একফালি ফাঁকা জায়গা, তারই একাংশে টালির ছাউনির নিচে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পড়ে আছে। ছাউনির মেঝে এবং দেওয়াল নেই।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই দেখবার জন্য এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে

এসেছি! নিদর্শনগুলিতে কিছু লেখা পর্যন্ত নেই। সুতরাং সময় নষ্ট না করে ফিরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু ফিরতে পারি না। কয়েকজন যুবক এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন করছিল, তাদেরই একজন এগিয়ে আসে আমার কাছে। ইংরেজিতে বলে, "মিউজিয়ম দেখতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তো, যান না। সামনের ঐ বাড়িটা হল মিউজিয়াম।"

"এগুলো কি তাহলে?" আমি চারিপাশের নিদর্শনগুলো দেখাই।

"এগুলোর এখনও কালনির্ণয় কিংবা শ্রেণীবিভাগ শেষ হয় নি।"

ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি মিউজিয়ামের দিকে চলা শুরু করি।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

ছেলেটির কথায় আবার থামতে হয় আমাকে। আমি তার দিকে ফিরে দাঁড়াই। সে বলে, "আপনি কি কলকাতা থেকে এসেছেন, আপনি কি বাঙালী?"

হেসে বলি, "হ্যাঁ। কিন্তু বুঝলেন কেমন করে?"

"আপনার পোশাক ও চেহারা দেখে।" একবার একটু থামে সে। তারপরে আবার বলে, "জানেন কলকাতা আমার জন্মভূমি।"

আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "সত্যি বলছি, মহাত্মা গান্ধীর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কলকাতায় আমার জন্ম হয়েছে। এবং এটা আমার একটা মস্ত গৌরব।"

"আপনার বাবা-মা বুঝি কলকাতায় থাকতেন?"

"হ্যাঁ। বাবা তখন কলকাতায় 'পোস্টেড্'। তারপরেও তিনি দশ বছর ওখানে ছিলেন। আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত কলকাতায় পড়াশুনা করেছি। তখন বেশ ভাল বাংলা বলতে পারতাম। এখন আর পারি না ঠিকমত, তবে বুঝতে পারি মোটামুটি। কিন্তু হিন্দী স্কুলে পড়তাম বলে আমার আর বাংলা লেখা ও পড়া শেখা হয়ে ওঠে নি। বড্ড আপশোষ হয় এখন। জানেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক। অথচ দুর্ভাগ্য, আমি বাংলা পড়তে পারি না।" হঠাৎ থেমে যায় ছেলেটি। বলে, "আপনার বোধহয় দেরি করিয়ে দিলাম!"

"না, না। ঠিক আছে।" ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয় আমাকে।

সে বলে, "চলুন, আপনাকে মিউজিয়াম দেখিয়ে দিই।"

"না, না, তার কোন দরকার নেই আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।" প্রতিবাদ করি।

"তা পারবেন। কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে আপনার সুবিধা হবে।"

আর আপত্তি করি না, কারণ তাতে কোন লাভ হবে না। এরা কথা বেচে খায়। কি আর করা যাবে? অদৃষ্টে দণ্ড ছিল, আবার গোটা পাঁচেক টাকা খসল আর কি? মিউজিয়ামে সাধারণতঃ গাইডদের ফি একটু বেশি হয়।

এবারে আর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নয়। সে চলতে চলতে গাইডের নিয়ম-মাফিক বক্তৃতা শুরু করে দেয়, "এই যাদুঘরটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য-শিল্পের কিছু দুর্লভ নিদর্শন দেখতে পাবেন। এখানকার সমস্ত মূর্তি মন্দিরগাত্রের অংশ এবং শিলালিপি সোমনাথের প্রাচীন মন্দির ও প্রভাসের অন্যান্য ভগ্ন মন্দির থেকে সংগৃহীত। অবশ্য প্রভাসে প্রাপ্ত নিদর্শনের অধিকাংশই চলে গিয়েছে জুনাগড়, জামনগর, বম্বে ও কলকাতার মিউজিয়ামে।"

টাকা যখন দিতেই হবে, তখন প্রশ্ন করা যাক্। জিজ্ঞেস করি, "প্রভাসে মোট কতগুলো শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে?"

"উনআশিটি।"

"কোন্ কোন্ সময়ের?"

"সেগুলো সবই ১১২০ থেকে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।"

"কোন্ কোন্ ভাষায় লেখা?"

"ব্রাহ্মী অথবা সংস্কৃতে তিপান্নখানি আর আরবী, পার্শী অথবা উর্দুতে ছাব্বিশখানি। বারোখানিতে কোন তারিখ লেখা নেই, তার মধ্যে সাতখানি সংস্কৃত।"

"এই শিলালিপি ক'খানাই তো প্রভাসের প্রাচীন ইতিহাসের বনিয়াদ?"

"তা বলতে পারেন।"

"আচ্ছা, মহারাজা কুমারপালের মন্দিরের আগে সোমনাথে ক'টি মন্দির তৈরি হয়েছিল ?"

"তিনটি।"

"কবে এবং কারা সেগুলো তৈরি করেছিলেন ?"

"দেখুন, সবই আনুমানিক সিদ্ধান্ত। তবে একদল ঐতিহাসিকের মতে—সোমনাথে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সোম নামে জনৈক যাদববংশীয় রাজা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। সে মন্দিরটি নাকি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল।

"তাদের মতে—দ্বিতীয় মন্দিরটি তৈরি করেন রাজা কৃষ্ণরাজ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। আর সম্রাট দ্বিতীয় নাগভট্ট ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সেটি ছিল পাথরের।

"তাঁদের এই সিদ্ধান্তের মূলে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি 'ভদ্রকালী' শিলালিপি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি সোনা ও রূপার মন্দির বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা সে-দুটি সোনালী ও রূপোলী রঙের মন্দির ছিল।"

"একটা কথা..." আমি বাধা দিই।

গাইড বলে, "বেশ, বলুন।"

"আপনি বললেন, প্রথম মন্দিরটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল কিন্তু আমি শুনেছি সোমনাথে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ ও মন্দির নির্মাণ করেন চাণক্য। তিনি তো খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মানুষ।"

"হ্যাঁ। একদল ঐতিহাসিক তাই বলেন। এবং তাদের মত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য! তাঁরা বলেন—দ্বিতীয় মন্দির তৈরি হয় ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় মন্দির নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ৮০০ সালে আর চতুর্থ ৯৫৫ থেকে ১০৭৫ সালের মধ্যে কোন সময়ে। সুলতান মাহ্‌মুদ সেই মন্দির ধ্বংস করেন। পঞ্চম মন্দির তৈরি করেন কুমারপাল ১১৬৯ সালে এবং পরবর্তী কালের সম্রাট সুলতানরা বার-বার সেটির ওপর হামলা চালিয়েছেন। রানী অহল্যাবাঈ ষষ্ঠ মন্দির তৈরি করেন ১৭৮৩ সালে। আর ১৯৬৫ সালের মে মাসে নির্মিত হয়েছে ভারত সরকারের মহামেরু প্রাসাদ—সোমনাথের সপ্তম মন্দির।" গাইড থামে একবার। বলে,

"চলুন, এবারে মিউজিয়াম দেখা যাক্।"

তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকি। ছোট যাদুঘর। দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকটি টেবিল ও আলমারীতে কয়েকপ্রস্ত নিদর্শন এবং কোনটিই অক্ষত নয়।

প্রথম প্রস্তের সামনে এসে গাইড বলে, "এগুলো চালুক্যরাজ শ্রীমূলরাজদেব সোলাঙ্কি কর্তৃক পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর নিদর্শন।"

দেখা শেষ করে গাইডের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রস্তের সামনে আসি। একই ধরনের নিদর্শন। গাইড বলে, "এগুলো সবই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত প্রভাসের বিভিন্ন জৈন-মন্দির ও সপ্ত-মাতৃকা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ···আর ঐযে ওপাশে নিদর্শনগুলো দেখছেন, ওগুলিও একাদশ শতাব্দীর—দৈত্যসূদন মহাবিষ্ণু মন্দিরের অংশ।"

কয়েকপা হেঁটে আমরা পরের সারির সামনে আসি। গাইড জানায়, "একাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ ভীমদেব ও অন্যান্য রাজাদের দ্বারা পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাংশ।"

দেখা শেষ হলে তার সঙ্গে শেষ প্রস্তের সামনে আসি। সে বলে, "এই নিদর্শনগুলো একটু ভাল করে দেখবেন। এগুলো ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কুমারপালের সোমনাথ মন্দির থেকে সংগৃহীত।"

ভাল করে দেখার অবকাশ কোথায় আমার? আমি যে কণ্ডাক্টেড্ ট্যুরে এসেছি। ম্যানেজারের মঞ্জুর করা আধঘণ্টা সময় বিগত হয়েছে বহুক্ষণ। এতক্ষণে টাঙ্গাওয়ালারা তাগিদ দিচ্ছে, ম্যানেজার অধীর আগ্রহে পায়চারি করছে আর সহযাত্রীরা ···

থাক্, তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি তাদের কাছেই ফিরে যাওয়া যাক্।

বেরিয়ে আসি মিউজিয়াম থেকে। গাইডও আমার সঙ্গে পথে নামে। তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নি, এবারে দিতে হবে।

কিন্তু কত দেবো? ছেলেটি বেশ অমায়িক ও বুদ্ধিমান। বেশ লেখা-পড়া জানে। অনেক কিছু জানতে পারলাম ওর কাছে। ওকে না পেলে এত অল্প সময়ে এভাবে মিউজিয়াম দেখা সম্ভব হতো না

আমার পক্ষে। পাঁচ-টাকা বোধহয় একটু কম হয়ে যাবে। তাহলেও তাই দেওয়া যাক্। আপত্তি করলে, দেখা যাবে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচটাকার একখানি নোট বের করে আমি গাইডের দিকে হাত বাড়াই। মুখে বলি, "অনেক ধন্যবাদ।"

"টাকা!" ছেলেটি ধমক দিয়ে ওঠে, "টাকা দিচ্ছেন কেন?"

রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তবু কোনমতে বলি, "মানে আপনার পারিশ্রমিক।"

"পারিশ্রমিক!"

"হ্যাঁ। মানে গাইডের ফি।"

"গাইড..." শেষ করে না সে। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, "আপনি বুঝি আমাকে 'প্রফেশনাল গাইড' ভেবেছেন। না, স্যার! আমি গাইড নই, আমি এই মিউজিয়ামের একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটার।"

"মাফ করবেন আমাকে।" আমি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি আমার হাত দু'খানি ধরে নিজের দু'হাতের মধ্যে নেয়। সবিনয়ে বলে, "আমাকে অপরাধী করবেন না।"

আমি বলি, "নিতান্ত অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আজ আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম, তা বহুদিন মনে থাকবে। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পাচ্ছি না।"

"অপরিচিত হলেও আপনি যে আমার জন্মভূমি কলকাতা থেকে এসেছেন। আপনি আমার আত্মীয়, আমার দাদা। তাই তো হাতের কাজ ফেলে আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলাম। ধন্যবাদ নয়, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন দাদা।"

আমি কিছু বুঝতে পারার আগেই ছেলেটি সহসা নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

দু'হাতে তাকে টেনে তুলে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরি।

॥ দশ ॥

ভালকা তীর্থের সামনে এসে টাঙ্গা থামল। ভেরাভল ও প্রভাসের মধ্যপথে অবস্থিত এই তীর্থ। এটি প্রভাসের পূর্বাঞ্চল। প্রভাস যাবার পথে আমরা টাঙ্গায় বসে দেখেছি এই তীর্থ। তখন ভেতরে যাই নি, এখন যাবো।

রোদ পড়ে এসেছে, একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে। সুতরাং টাঙ্গা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তোরণের দিকে এগিয়ে চলি। আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার পর থেকে এই পুণ্যক্ষেত্র মন্দিরহীন হয়ে ছিল। মাত্র বছর সাতেক আগে সোমনাথ ট্রাস্ট মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন।

তোরণ ছাড়িয়েই বাঁদিকে বাঁধানো জলাশয়—ভাল্কা কুণ্ড। শুক্লা দ্বাদশীতে এই কুণ্ডে অবগাহন করলে নাকি অক্ষয় স্বর্গবাস। আজ যেমন শুক্লা দ্বাদশী নয়, তেমনি এখন নেই অবগাহনের অবকাশ। সুতরাং আমার পুণ্যকামী সহযাত্রীদের পুণ্যকুণ্ডের পুণ্যবারি স্পর্শ করেই পুণ্যতৃষ্ণা মেটাতে হয়।

কুণ্ড পেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে মন্দির। আধুনিক ডিজাইনের সুদৃশ্য মন্দির। সামনে স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা। সিঁড়ির দু'পাশের স্তম্ভ দুটি শ্বেতপাথরের। তাদের গায়ে খোদাই কাজ। সিঁড়ির অংশটা অনেকটা গাড়ি-বারান্দার মতো। চূড়াটি মেট্রো ডিজাইনের। সেখানে একটি সূর্য অঙ্কিত। তার নিচে গুজরাতীতে লেখা রয়েছে—

'২০২৩* শ্রীভাল্কা তীর্থ মন্দির ১৯. ৫. ৬৭

শ্রীসোমনাথ ট্রাস্ট।'

কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠে আসি। শ্বেতপাথরের মসৃণ মেঝে। আমরা এগিয়ে চলি। মন্দিরের মধ্যে একটি ছোট অশ্বত্থ গাছ। তারই পাশে দেয়ালের সঙ্গে এক সুদৃশ্য মঞ্চে অর্ধ-শায়িত শ্রীকৃষ্ণ। শ্বেতপাথরের মানুষ-সমান মূর্তি। ভারী সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্তি। পরনে পীতবাস। মণিবন্ধ ও বাহুতে অলঙ্কার। গলায় মালা, মাথায় মুকুট আর চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ—

* বিক্রম সংবৎ

যেমন জীবন্ত তেমনি অপরূপ, চোখ ফেরানো যায় না। শ্রীমোরারজী দেশাই এই কৃষ্ণ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন।

কৃষ্ণের পদতল বাণবিদ্ধ। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে নেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন। বরং তার মুখমণ্ডল পরম প্রশান্ত। চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি। তিনি সহাস্য বদনে তাকিয়ে রয়েছেন জরা ব্যাধের দিকে।

নরনারায়ণের পায়ের কাছে, একটু নিচে জরা ব্যাধ হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। তার মাথায় পাগড়ি বাঁধা, পিঠে তূণ, পাশে ধনুক। দু'হাত জোড় করে সে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করছে। আমিও কৃপা প্রার্থনা করি তাঁকে প্রণাম করি। তারপর আবার স্মরণ করি সেই পুণ্যকাহিনী—

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব লীলা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে মৌষল লীলায় যদুনাথ নিজেই যদুবংশ ধ্বংস করলেন। গান্ধারীর অভিশাপ সত্য হল। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন সাগরতীরে। দেখলেন ধ্যানমগ্ন বলরাম আত্মাতে আত্মা সংযোগ করে মর্ত্যলোক ত্যাগ করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন পাশের বনে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পায়চারী করার পরে তিনি এলেন এখানে। একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বসে পড়লেন। ধারণ করলেন চতুর্ভুজ মূর্তি। তার রূপের ছটায় দশদিক উদ্ভাসিত হল

জরা নামে জনৈক ব্যাধ দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে তাঁর পা দু'খানি দেখতে পেল। সে হরিণ ভেবে শরসন্ধান করল। শ্রীকৃষ্ণের পদতল বাণবিদ্ধ হল। দুর্বাসার আদেশ অমান্য করবার জন্যই ঘটল এই দুর্ঘটনা। মহামুনি দুর্বাসা একবার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণ করে রুক্মিণীকে পরমান্ন রাঁধতে বলেছিলেন। কিন্তু রান্না হয়ে যাবার পরে, দুর্বাসা সে পরমান্ন নিজে না খেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে গায়ে মাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতিথিবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্ভুত আদেশ পালন করেও পায়ের পাতায় পরমান্ন মাখেন নি। আর তা মাখেন নি বলেই ব্যাধ তাঁর পদতলে বাণবিদ্ধ করতে সমর্থ হল।

ব্যাধ ছুটে এলো শিকারের কাছে। সবিস্ময়ে দেখল হরিণ নয়,

শ্রীহরি। সে পুরাণপুরুষকে বাণবিদ্ধ করেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে ব্যাধ, সে পতিতপাবনের রক্তাক্ত পদযুগল বুকে জড়িয়ে ধরে।

স্নিগ্ধস্বরে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিলেন—ব্যাধ তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছো—'কাম এষ কৃতো হি মে।' তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কারণ তুমি আমারই মায়ায় আমাকে শরাঘাত করেছো। পূর্ব অবতারে তুমি ছিলে বালিপুত্র অঙ্গদ। তোমার বীর পিতাকে আমি চোরাবাণে বধ করেছিলাম। তারপরে তুমি আমার কাছে পিতৃহন্তাকে হত্যা করবার বর প্রার্থনা করেছিলে। আমি বলেছিলাম—'তথাস্তু'।

—আমার সেই বরে তুমি আজ চোরাবাণে আমাকে বধ করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করলে। তাই আজ আমি আবার তোমাকে বরদান করছি—তুমি সুকৃতিদের প্রাপ্যস্থান স্বর্গে গমন কর—'যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতং স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্'।

আজ্ঞা লাভ করে জরা ব্যাধ তিনবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপরে বিমানযোগে সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।

আর ঠিক তখুনি স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা, শিব এবং দুর্গার সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীরা এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারা আহত কৃষ্ণকে এখান থেকে প্রভাসে অর্থাৎ সরস্বতী-সাগর সঙ্গমে বয়ে নিয়ে গেলেন

প্রভাসে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে মনঃসংযোগ করলেন—'সংযোজ্যাত্মানি চাত্মানং।' তিনি তাঁর পদ্মনয়ন দুটি নিমীলিত করে ধ্যানস্থ হলেন। অনতিকাল পরেই শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর সেই স্বর্গারোহণ লীলা দেব-দেবীরা পর্যন্ত দেখতে পেলেন না।

সেই পুণ্যকাহিনীর প্রেক্ষাপটে এই পুণ্যক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে মন্দির—ভালকা তীর্থ মন্দির। এই তীর্থ দর্শন করে আজ আমার জীবন ধন্য হল।

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস পরিক্রমাও পূর্ণ হল আমার। এতো শুধু প্রভাস পরিক্রমা নয়, বিশ্ব ইতিহাসের মহত্তম মহামানবের মহাজীবন পরিক্রমা। পাঁচ বছর আগে এক শীতের সকালে মথুরা থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ এই বাসন্তী বিকেলে প্রভাসে তা শেষ হল।* সেদিন

* লেখকের 'মধু-বৃন্দাবনে' ও 'মন-দ্বারকায়' দ্রষ্টব্য।

ভাবতে পারি নি আমার স্বপ্ন সফল হবে। আজ বুঝতে পারছি তাঁরই করুণায় আমার এ কামনা পূর্ণ হল। সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাই করুণাময় কৃষ্ণকে পুনরায় প্রণাম করি।

পুণ্যার্থীদের সঙ্গে বেরিয়ে আসি ভাল্‌কা তীর্থ থেকে। টাঙ্গার কাছে আসতেই বিউটির গলা কানে আসে। সে সরকারদার পাশে বসে ডাকছে আমাকে। বলছে, "মামু! আপনি এই টাঙ্গায় আসুন।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই দাদা বলে ওঠেন, "তাই ভাল। মামু ঐ টাঙ্গায় থাক্ আর তুমি আমার টাঙ্গায় এসো।"

"দাদু! ভাল হবে না বলছি।"

"তুমি আমার পাশে না এলে, ভাল হবে কেমন করে?"

এবারে আর হাসি চাপা সম্ভব হয় না। আমরা সোচ্চারস্বরে হেসে উঠি। দাদা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন কিন্তু বিউটি গম্ভীর।

একটু বাদে দাদা বলেন, "থাক্গে ভাই। তুমি ঐ টাঙ্গাতেই যাও, নইলে আবার আমার গিন্নী ক্ষেপে যাবে। দাম্পত্য কলহ বড়ই কষ্টকর।"

আমি হাসতে হাসতে বিউটির টাঙ্গায় উঠে আসি। টাঙ্গা এগিয়ে চলে— পুণ্যতীর্থ-প্রভাস থেকে ভেরাভলের পথে।

গোধূলি নেমে এসেছে প্রভাসের পথে পথে। সেদিনও বোধকরি প্রভাস এমনি আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল, যেদিন কৃষ্ণ সাঙ্গ করেছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলা। তারপরে বিষাদের আঁধারে ঢাকা প্রভাসে এসেছিলেন অর্জুন। আর এই কাহিনী শোনাবার জন্যই বিউটি আমাকে সরকারদার টাঙ্গায় তুলেছে। মহাভারতের সেই কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নিচ্ছি প্রভাসের কাছ থেকে।

সরকারদা বলে চলেছেন, "সকালে আমি মৌষল পর্বের শেষাংশ খুব সংক্ষেপে বলেছি। এবারে বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "দেহত্যাগের আগে অর্জুনকে নিয়ে আসবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় পাঠিয়ে

দিয়েছিলেন। দারুকের সঙ্গে সব্যসাচী ছুটে এলেন দ্বারকায়। অপরূপা দ্বারাবতীকে তাঁর অনাথা রমণীর মতো মনে হল। অর্জুনকে দেখতে পেয়েই শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা হাহাকার করতে থাকলেন। পতি-পুত্রহীনা নারীদের আর্তনাদ শুনে অর্জুনের চোখদুটিও জলে ভরে উঠল। তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। বীরশূন্যা দ্বারাবতীকে তাঁর যমালয়ের বৈতরণী নদী বলে মনে হতে থাকল। কৃষ্ণের মহিষীরা যেন সেই নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে হেমন্তের ম্লান পদ্মের মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন। অর্জুন দ্বারকার দুর্দশা আর বেশিক্ষণ সইতে পারলেন না। তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতীসহ শ্রীকৃষ্ণের রানীরা তাঁকে ঘিরে কান্না জুড়ে দিলেন।

"কিছুক্ষণ বাদে অর্জুনের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি মনে মনে বসুদেবের স্তব করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। তারপরে রুক্মিণীদের সান্ত্বনা দিয়ে বসুদেবের কাছে এলেন। বসুদেব অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ধনঞ্জয়, যারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবদের পরাজিত করেছিল, তাদের না দেখেও আমি আজ জীবিত রয়েছি। যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে তুমি প্রিয় শিষ্য বলে সর্বদা প্রশংসা করতে, তাদেরই দুর্নীতির ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য তাদের আর কি দোষ বল, সতীশাপ ও ব্রহ্মশাপের জন্যই এমনটি হয়েছে। যে কৃষ্ণ কেশীদৈত্য, কংস ও শিশুপালকে অক্লেশে বধ করেছে, সে সচক্ষে জ্ঞাতিবধ দেখেও কোন প্রতিকার করে নি।

"পুত্র ও পৌত্র শোকাতুর বসুদেব সেদিন অর্জুনের কাছে আরও অনেক বিলাপ করেছিলেন। বলেছিলেন—যে কৃষ্ণ তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎকে পুনর্জীবিত করেছিল, সে তার নিজের পৌত্রদের রক্ষা করে নি। সে কেবল আমার কাছে এসে বলল—বাবা, আজ যদুকুল নিঃশেষিত হল। আমি অর্জুনকে আনবার জন্য দারুককে পাঠিয়েছি। অর্জুন ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সে-ই আপনাদের শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করবে। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের রক্ষা করবে। সে এখান থেকে চলে যাওয়ামাত্র দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হবে।

"একটু থেমে বসুদেব আবার অর্জুনকে বললেন—এই রাজ্য

রাজভাণ্ডার ও যাদবনারীরা সবই এখন তোমার। তুমি তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা কর।

"অর্জ্জুন তখন দারুকের সঙ্গে বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদের কাছে এলেন। তিনি তাঁদের বললেন--আমি অন্ধকদের পরিবারবর্গকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাচ্ছি। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ এই রাজ্যের রাজা হবে। সাতদিন পরে দ্বারকা প্লাবিত হবে। সুতরাং সপ্তম-দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্বারকা ত্যাগ করব। তোমরা ধনরত্ন ও নারীদের নিয়ে প্রস্তুত হও।

"পরদিন প্রভাতে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলেন। অর্জ্জুনের নির্দেশে শাস্ত্রানুসারে সহকারে তাঁর মৃতদেহ মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। বসুদেবের চার স্ত্রী—দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা দিব্য অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ বরণ করলেন।

"তারপরে অর্জ্জুন এলেন এখানে—এই প্রভাসে। তিনি বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ খুঁজে বের করে শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করলেন। আপনাদের আগেই বলেছি, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই স্বর্গে গমন করেন কিন্তু মহাভারতে বলা হয়েছে—রাম-কৃষ্ণের মৃতদেহ খুঁজে বের করে অর্জুন সৎকার করেছিলেন।"

"আমরা কোন মতটি বিশ্বাস করব?" উমাদি প্রশ্ন করেন।

সরকারদা বোধহয় মুশকিলে পড়েছেন। তিনি একটুকাল চুপ করে থেকে বলেন, "ভক্তরা ভাগবতের মত মেনে নেবেন। আর যাঁরা ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা মানবেন মহাভারতের কথা।"

"আরেকটা কথা", বৌদি বলেন, "কৃষ্ণ কত বছর বয়সে মর্ত্তলীলা সংবরণ করেছেন?"

সরকারদার আগে আমি উত্তর দিই, "আধুনিক গবেষকদের মতে কৃষ্ণের বয়স তখন তিরানব্বই।"

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাহলে কৃষ্ণার্জুনের বয়স ছিল সাতান্ন বছর!"

আমি মাথা নাড়ি।

"ও কাকু! তারপরে কি হল?" বিউটি গবেষণায় উৎসাহী নয়, সে গল্প শুনতে চায়। সুতরাং ষোড়শী শ্রোতৃ ধৈর্যহীনা।

সবকারদা শুরু করেন, "তারপরে অর্জুন রথ, গরুর গাড়ি ও উটের পিঠে দ্বারকার সমস্ত শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রওনা হলেন। তাঁরা দ্বারকা ত্যাগ করা মাত্র সমুদ্র সেই সুরম্য মহানগরীকে গ্রাস করে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। দ্বারকাধীশের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল।

"কয়েকদিন পরে অর্জুন সদলবলে পঞ্চনদের দেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে আভীর দস্যুরা লাঠি হাতে তাঁদের আক্রমণ করল। সব্যসাচী অতিকষ্টে শরাসনে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কিছুতেই দিব্যাস্ত্রদের নাম মনে করতে পারলেন না। ফলে ধনঞ্জয়ের সামনেই তারা ধনরত্ন ও সুন্দরী যুবতীদের লুঠ করতে থাকল। কোন কোন যুবতী আবার স্বেচ্ছায় দস্যুদের কণ্ঠলগ্না হল।

"অবশিষ্ট ধনরত্ন ও নর-নারীদের নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি সাত্যকির ছেলেকে সরস্বতী নগরে এবং ভোজবংশীয়দের মার্তিকাবত নগরে পাঠিয়ে দিলেন। বজ্রনাভসহ অন্যান্যদের নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। অক্রুরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমা ও জাম্ববতী প্রভৃতি জহর-ব্রত পালন করলেন। সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীরা তপস্যা করবার জন্য হিমালয় অতিক্রম করে কলাপগ্রামে চলে গেলেন।

"তারপরে অর্জুন বজ্রনাভকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ব্যাসদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়ের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বৎস, তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? তুমি কি ব্রহ্মহত্যা কিংবা রজঃস্বলাগমন করেছ? অথবা কেউ তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে?

"পার্থ উত্তর দিলেন—ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীল-কলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর এবং বলদেব মর্তলীলা সাঙ্গ করে স্বর্গে গমন করেছেন। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। যে পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্যামতনু পরমপুরুষ আমার রথের সামনে বসে থাকতেন, আমি

আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারছি না, তার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। তাঁকে ছাড়া যে আমার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

"মহর্ষি বেদব্যাস অর্জুনকে সান্ত্বনা দান করে শান্তস্বরে বললেন—অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়রা নিজেদের পাপে ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেন। কাজেই তাঁদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তাঁদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলেই বসুদেব তাঁদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি। নইলে তিনি ইচ্ছে করলে ব্রহ্মশাপ খণ্ডন তো দূরের কথা, এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্বসংসারকে অন্যরূপে তৈরি করতে পারেন। ভূভার লাঘবের জন্যই তিনি বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তোমাকে ভালবাসতেন বলেই তিনি তোমার সারথি হয়েছিলেন। এখন পৃথিবী পাপীমুক্ত, ধর্মযুদ্ধে ধর্ম হয়েছে জয়যুক্ত, তাই তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছেন।

"—তুমি এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে এতকাল কৃষ্ণের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করেছ। অতএব তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। তোমাদেরও এখন ইহলোক ত্যাগ করা উচিত।

"একবার থামলেন ব্যাসদেব। অর্জুন তাকালেন তাঁর দিকে। কিন্তু তিনি কোন কথা বলতে পারার আগেই ব্যাসদেব আবার তাঁকে বলতে থাকলেন—মানুষের সময় ভাল হলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তেজ ও সুবুদ্ধি—সবই তার সহায় হয়, আবার সময় খারাপ হলে সে দুর্বুদ্ধির তাড়নায় দুর্বল ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। কারণ কালই জগতের বীজস্বরূপ। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকালও শেষ হয়েছে। তারা যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গিয়েছে। তাই সেদিন তুমি সামান্য দস্যুদের দমন করতে পারো নি।

"—কেবল তোমার অস্ত্রশস্ত্র নয়, তোমার এবং তোমার ভাইদের কার্যকালও শেষ হয়ে গিয়েছে, স্বর্গারোহণের সময় হয়েছে সমাগত। সুতরাং তুমি হস্তিনাপুরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব কথা বল। তারপরে

পরীক্ষিতের হাতে রাজদণ্ড দিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে তোমরা পাঁচভাই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করো।"

। এগারো ।

'হরিগুণ গায়ত নাচুংগী ॥
অপনে মংদিরমেঁ বৈঠ বৈঠকর
গীতা ভাগবত বাচুংগী ॥
গ্যান ধ্যানকী গঠরী বাঁধ কর
হরিজন সংগ মৈঁ লাগুংগী ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
সদা প্রেমরস চাখুংগী ॥'

উমাদির গানে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর গোপালকে ঘুম থেকে তুলছেন আর মীরার ভজন গাইছেন। হয়তো বা মনে মনে মীরার মতই ভাবছেন—আমি এবার হরিগুণ গেয়ে গেয়ে নাচব আর আমার মন্দিরে বসে গীতা ও ভাগবত পাঠ করব। জ্ঞান ও ধ্যান হবে আমার সম্পদ আর হরিজন হবে আমার সঙ্গী। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, আমি প্রতিদিন তোমার প্রেমরস আস্বাদন করব।

গানের রেশ কেটে যেতেই উঠে বসি। জানলা খুলি। এযে দেখছি গাড়ি সাইডিংয়ে ফেলে রেখেছে। তাই তো রাখবে। ভেরাভল থেকে আমেদাবাদ যাবার মাত্র একখানি থ্রু ট্রেন—সোমনাথ মেল। বিকেল সাড়ে তিনটায় ভেরাভল থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকাল সওয়া ছ'টায় আমেদাবাদ পৌছয়। আবার রাত সাড়ে ন'টায় আমেদাবাদ ছেড়ে পরদিন বেলা সাড়ে বারোটায় ভেরাভল আসে।

কিন্তু সে-ট্রেন আমাদের জন্য নয়। সোমনাথ মেল-য়ের সঙ্গে ট্যুরিষ্ট কোচ্ জুড়বার নিয়ম নেই। অতএব দু'জায়গায় ট্রেন বদল করে আমাদের আমেদাবাদে পৌছতে হবে।

গতকাল সন্ধ্যের পরে আমাদের ট্রেন ছেড়েছে ভেরাভল থেকে। রাত বারোটা নাগাদ আমরা জীতলসর জংশনে এসেছি। সেখানে

ওখা-ভবনগর প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে আমাদের গাড়ি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাত সাড়ে বারোটায় ট্রেন ছেড়েছে। ভোর সাড়ে চারটায় এই ঢোলা জংশনে এসেছি। সেই থেকে গাড়ি ফেলে রেখেছে এখানে। বেলা এগারোটার আগে এখান থেকে আমেদাবাদের কোন ট্রেন নেই।

বেড-টি পরিবেশন করার পরেই ঠাকুর তার দলবল ও বাসনপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে চলে গেল—কাছেই প্লাটফর্ম। সেখানে গাছের ছায়া ও জলের কল আছে সুতরাং ওখানে বসে রান্না ও খাবারের হাঙ্গামা মেটানো সহজতর। ম্যানেজার বলেছে, গাড়ি ছাড়ার আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলবে।

এখান থেকে বেলা এগারোটায় গাড়ি ছাড়লে আমরা বিকেল ছ'টায় আমেদাবাদে পৌঁছব। অর্থাৎ ভেরাভল থেকে আমেদাবাদ এই ৪৫৯ কিলোমিটার পথ যেতে আমাদের মোট তেইশ ঘণ্টা সময় লাগবে। অথচ এই পথটুকু অতিক্রম করতে সোমনাথ মেল-য়ের মাত্র পনেরো ঘণ্টা সময় লাগে। আর রাজধানী এক্সপ্রেসের?…থাক্ সে কথা মনে না করাই ভাল।

আজ তীর্থদর্শনের তাগিদ নেই। সুতরাং সহযাত্রীরা অনেকেই বেড-টি খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার এসে শুয়ে পড়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁদের তালিকায় যেমন উমাদির নাম নেই, তেমন নেই ঠাকুরমাদের নাম। তাঁরা যথারীতি বাস-কাপড়ের বালতি নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছেন।

শুয়ে থাকার উপায় নেই আমারও। গতকাল সারাদিনে ডায়েরী লেখা হয় নি। আজ লিখে ফেলতে হবে এবং সহযাত্রীরা মজলিশ শুরু করবার আগেই কাজটা সেরে ফেলা উচিত হবে। ম্যানেজার আমার লেখক পরিচয় জেনে ফেলেছে। কিন্তু সে কথা রেখেছে, কাউকে প্রকাশ করে নি। তাহলেও অনেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন, যেমন উমাদি, কল্পনাদি, সত্যেনদা ও সরকারদা। ডায়েরী লিখতে বসলেই ওঁরা আড়চোখে আমার দিকে নজর রাখেন। কাজেই যতটা আড়ালে কাজ সারা যায়, ততই ভাল।

লিখতে বসেই ওর কথা মনে পড়ে আমার—মানসীর কথা। তার

কাছেও একখানি চিঠি লিখে রাখতে হবে, আমেদাবাদ পৌঁছে ডাকে দিয়ে দেব।

আচ্ছা, লিখি নি লিখি নি করেও তো গত দু'সপ্তাহে আমি ওর কাছে খানচারেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু আমি যে ওর একখানা চিঠিও পেলাম না। অথচ সেদিন আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে সে বলে গিয়েছিল— পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমাকে সে বিয়ের তারিখ জানিয়ে দেবে মাউন্ট-আবু কিংবা দ্বারকার ঠিকানায়।

সামনে চৈত্র মাস। ফাল্গুন মাসের আর ক'দিনই বা বাকী আছে। তাহলে কি কোন কারণে শেষ পর্যন্ত খুকুর বিয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তাই মানসী এমন নীরব।

কিন্তু আমি এখন কি করি? আমাদের গাড়ি আমেদাবাদ থেকে ডাকোর যাবে। সেখান থেকে বম্বে, নাসিক ও অজন্তা-ইলোরা হয়ে কলকাতায় ফিরবে। কাজেই ফাল্গুন মাসে খুকুর বিয়ে হলে আমাকে আমেদাবাদেই সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, রওনা দিতে হবে বৃন্দাবনের পথে।

আচ্ছা, আজ কত তারিখ? পনেরো নয়? ডায়েরী দেখি। হ্যাঁ আজ যে পনেরো তারিখ। কিন্তু শঙ্করীদের তো ষোল তারিখে আমেদাবাদে আসতে বলা হয়েছে। এই যে আমার ডায়েরীতে স্পষ্ট লেখা আছে, আমরা আগামীকাল আমেদাবাদে পৌঁছব। শঙ্করীরা কাল সকালে আবু-রোড থেকে রওনা হয়ে বিকেলে আমেদাবাদে আসবে। ম্যানেজার নিজে হিসেব করে ওদের সব বলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা ওদের নিয়ে কাল রাতেই ডাকোর রওনা হব।

ম্যানেজার আমার ওপরের বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করি কথাটা।

কথাটা তারও খেয়াল হয়েছে। তাই সে চিন্তিত কণ্ঠে বলে, "সত্যই সেদিন হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে ঘোষদা। যেভাবে ট্রেন লেট হচ্ছিল, তাতে ভাবতেই পারি নি ষোল তারিখের আগে আমেদাবাদ পৌঁছতে পারব। তাই আমি ওনাদের ষোল তারিখে আসতে বলেছিলাম।"

"আচ্ছা, আমরা কি আমেদাবাদে একটা দিন অপেক্ষা করতে পারি না?"

"না। আমেদাবাদে 'ব্রেক জার্নি' নেই। রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের থাকতে দেবেন না সেখানে।"

পাঁচু আমার শেষ আশা নির্মূল করে দেয়, তবু বলি, "কিন্তু ওরা যে কাল এসে বড়ই মুশকিলে পড়বে তাহলে।"

"মুশকিলে পড়বেন কেন?" ম্যানেজার মুশকিল আসান করে, "প্রথম কথা ওনারা যে আসবেনই, তার কোন মানে নেই। আবু-রোড থেকেও কলকাতায় চলে যেতে পারেন। যদি তা না গিয়ে থাকেন এবং যদি তাঁরা কাল এখানে আসেন, তাহলে যাতে ওঁরা নির্বিঘ্নে বম্বে চলে যেতে পারেন, আমি আমেদাবাদে সে-ব্যবস্থা করে যাবো। বম্বে ছাড়তে এখনও আমাদের চারদিন বাকী। তার মধ্যে নিশ্চয়ই ওঁরা বম্বে পৌঁছে যাবেন।"

ম্যানেজার মিথ্যে বলে নি। শ্রীর সুস্থ হতে দেরি হলে, পূর্ণিমা তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে। কিন্তু তাহলে তো অন্তত একখানি চিঠি আসা উচিত ছিল। তাছাড়া শ্রীই বা সুস্থ হয়ে উঠবে না কেন? বড় ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন। পূর্ণিমা ও শঙ্করী রয়েছে। রয়েছে অহীন, বিমলবাবু ও সরোজবাবু।

না, না! শ্রী নিশ্চয়ই অনেক আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে। আর কৃষ্ণ করুণা করলে তারা দু'এক দিন আগেও আমেদাবাদে চলে আসতে পারে।

তাই যেন হয়। হে বিপদভঞ্জন রাধামাধব! আমরা যেন ওদের নিয়ে একসঙ্গে কলকাতায় ফিরতে পারি।

কিন্তু আমি তো ওদের সঙ্গী হতে পারব না। আমেদাবাদে গিয়ে মানসীর চিঠি পেলে আমাকে হয়তো তীর্থযাত্রায় যতি টানতে হবে। ডাকোর না গিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হতে হবে।

তাই ভাল। আমি আজ আমেদাবাদ পৌঁছে নেমে পড়ব কুণ্ডু স্পেশালের গাড়ি থেকে। একটা দিন থেকে যাব সেখানে। কাল বিকেলে ওরা এলে ওদের বম্বে রওনা করে দেব। তারপরে আমি

রওনা হব বৃন্দাবনের পথে—আমার মানসীর কাছে।

"নাতি! ও নাতি। একবার এট্টু নিচে আও না দাদা।"

তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে গলা বাড়াই। মেজঠাকুরমা রেল লাইনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। বলি, "কি হয়েছে?"

"একবার এট্টু নিচে আও না।"

বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। কাঁদো কাঁদো স্বরে ঠাকুরমা বলেন, "বড়ই বিপদে পড়ছি দাদা। তুমি ছাড়া কে আমাগো এই বিপদ থিকা উদ্ধার করবে?"

"কিন্তু বিপদটা কি?"

"বড় বিপদ দাদা। ঐ দেখো।"

তাকিয়ে দেখি, প্লাটফর্মের ওধারে আমাদের যেখানে রান্না হচ্ছে, তার কাছেই রয়েছে ছোট একটি বাগান। ফুল-টুল তেমন নেই, তবে জায়গাটা গলা-সমান লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটি দরজা আছে কিন্তু সেটি এখন তালাবন্ধ। আর সেই বাগানেই বন্দী হয়েছেন ছোট-ঠাকুরমা।

"ত উনি ওখানে গেলেন কেমন করে আর কেনই বা গেলেন?"

"গ্যাছে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতে। ঢোকছে বেড ডিঙ্গাইয়া। কিন্তু এখন আর বাইর হইতে পারতেছে না।"

তাড়াতাড়ি সেই বাগানের কাছে আসি, দরজাটার দিকে নজর দিতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। লোহার পাতের দরজা। বাইরের দিকে কতগুলো লোহার 'অ্যাংগ্‌ল' অর্থাৎ বাতা লাগানো আছে, কিন্তু ভেতরের দিকটায় মসৃণ লোহার পাত। যাবার সময় সেই বাতার ওপরে পা দিয়ে দরজা পেরিয়েছেন ঠাকুরমা কিন্তু বের হবার সময় ওপাশটা মসৃণ বলে দরজার ওপরে উঠতে পারছেন না। দরজাটা পাঁচ ফুটের মতো উঁচু।

আমাকে দেখতে পেয়েই ছোট-ঠাকুরমা ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দাদাগো, আমারে বাঁচাও। আমার অবস্থা যে এখন ঠিক অভিমন্যুর মতো—ঢোকতে পারছি, বাইর হইতে পারতেছি না।"

হাসি পেলেও গম্ভীর থাকতে হয়। গম্ভীর স্বরেই সান্ত্বনা দিই,

"আপনি বন্দী হয়েছেন, কিন্তু আপনাকে তো সপ্তরথী বেষ্টন করেন নি। কাজেই এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ঘাবড়াবেন না। আমি ভেতরে আসছি।"

বাগানের ভেতরে ঢুকে কোলে করে ঠাকুরমাকে বসিয়ে দিই দরজার ওপরে। বাণেশ্বর ও মতির হাত ধরে তিনি অনায়াসে নেমে আসেন নিচে। তারপরে আমি বেরিয়ে আসি বাগান থেকে। সমবেত স্বরে ঠাকুরমারা আশীর্বাদ করেন, "সোমনাথ তোমার মঙ্গল করুন দাদা।"

সরকারদা সহসা বলে ওঠেন, "মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

আর আমি? আমি মনে মনে সোমনাথকে বলি—ঠাকুর তোমার যদি আমার মঙ্গল করার একান্তই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে আমেদাবাদে আমাকে মানসার একখানি চিঠি দিও আর সেখানে পৌঁছে আমাদের যেন দেখা হয় শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর সঙ্গে।

ঢোলা জংশন থেকে ঠিক সময়েই ট্রেন ছাড়ল—এখন বেলা ঠিক এগারোটা। ভালই হল সন্ধ্যের আগেই আমেদাবাদে পৌঁছে যাবো।

তবে তার যে এখনও অনেক দেরি। সারাটা দিন পড়ে আছে। যাঁরা তাস খেলছেন কিংবা বই পড়ছেন, তাদের কথা আলাদা। তাঁরা টেরই পাবেন না কিভাবে ট্রেন আমেদাবাদে পৌঁছল। কিন্তু আমরা এখন কি করব?

কৃষ্ণকথার আসর শেষ হয়েছে। সরকারদা যে অন্য কোন প্রসঙ্গে কিছু বললেন, তারও উপায় নেই। বৌদির শরীরটা ভাল নেই আজ। খাবার পরেই সবাই এসে ভিড় করেছেন আমাদের খোপে।

শেষ পর্যন্ত দাদাকেই আজকের আড্ডার 'কন্ভীনর' হতে হল। দাদা তার স্কুল জীবনের গল্প বলতে শুরু করে দিলেন।

দাদার স্কুল জীবন কেটেছে পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহরে। তাঁদের স্কুলের পেছনেই ছিল নদী। বর্ষাকালে নদীর জল প্রায় স্কুলদালানের গা ছুঁয়ে বয়ে যেত।

বুড়ো পণ্ডিতমশাই বড়ই ফাঁকি দিতেন। প্রায় প্রতিদিনই তিনি ক্লাশে এসে চটি জোড়া খুলে রেখে চেয়ারে পা তুলে ঘুমোতে থাকতেন। ঘণ্টা পড়া পর্যন্ত চলত তাঁর দিবানিদ্রা।

ক্লাশের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ছিল রমেন। একদিন সে বলে বসল —তোরা যদি আমার নাম না বলে দিস, তাহলে আমি পণ্ডিত মশাইয়ের ঘুম বন্ধ করে দিতে পারি।

ছেলেরা সবাই একযোগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল।

পরদিন পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসে যথারীতি চটি খুলে রেখে নিদ্রাভিভূত হলেন। আর তারপরেই রমেন ঠোঁটের ওপরে আঙুল তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল। পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। তাঁর সখের বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া তুলে নিল দু'হাতে। পাশের জানলা দিয়ে ফেলে দিল নদীর জলে। সহাস্য বদনে এসে বসল নিজের জায়গায়। কিন্তু তার সহপাঠীরা শঙ্কিত বক্ষে বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা করতে থাকল।

সেদিন কেন যেন ঘণ্টা পড়ার আগেই ঘুম ভেঙে গেল পণ্ডিত-মশায়ের। তিনি পা-দুখানি নিচে নামিয়ে চটি পরতে চাইলেন। পায়ে জুতোর স্পর্শ না পেয়ে নিচের দিকে তাকালেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সাধের চটি অদৃশ্য হয়েছে। বলে উঠলেন—আমার চটি, চটি কোথায় গেল ?

কিন্তু কে তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দেবে। নেতা রমেনের নির্দেশ মতো ছেলেরা সবাই শব্দহীন।

পণ্ডিতমশাই ছেলেদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টি দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছে। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—আমার চটি কে সরিয়েছো ?

শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো রমেন উঠে দাঁড়ায়। বলে—তাই তো, ভারী মজার ব্যাপার। আপনার চটি কোথায় গেল ? একবার থামল সে। তারপরে আবার বলল—চটি এখান থেকে কোথায় যাবে ? আপনি বোধহয় এ-ক্লাশে চটি আনেন নি স্যার, আগের ক্লাশে ফেলে এসেছেন।

—না, না। চটি আনব না কেন ? চটি এনেছি। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এখানে রেখেছি। তোরাই কেউ আমার চটি সরিয়েছিস।

—না স্যার! আমরা সরাবো কেন ? আপনিই আগের ক্লাশে

ফেলে এসেছেন।

খোঁজা হল সে ক্লাশ-রুম, খোঁজা হল টিচার্স-রুম কিন্তু পাওয়া গেল না চটি।

এলেন হেডমাষ্টারমশাই। তিনি ছেলেদের চটি বের করে দিতে বললেন। বলা বাহুল্য কোন ফল হল না। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন—আজ ছুটির পরে তোরা কেউ বাড়ি যেতে পারবি না। আমি তোদের সন্ধ্যে পর্যন্ত 'ডিটেইন' করলাম।

পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে হেডমাষ্টারমশায় ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়ল—জয়ের উল্লাস। চটির মায়ায় পণ্ডিত-মশাই আর কখনও ক্লাশে ঘুমাবেন না।

কিন্তু সে বিজয়োল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিছুক্ষণ বাদেই তাদের ক্ষিদে পেয়ে গেল। তারা নেতা রমেনকে বলল—একটা কিছু উপায় কর ভাই! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেন কি যেন একটু ভাবল। তারপরে বলল—তোরা চুপচাপ বসে থাক, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

স্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরেই হেডমাষ্টারমশায়ের কোয়ার্টার। রমেন সোজা এসে হাজির হল সেখানে। মাষ্টারমশাই তখনও স্কুল থেকে বাড়ি ফেরেন নি। তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী তখন সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত। সহসা তাঁর কানে এলো—মা! মা বাড়ি আছেন? মা……

কোমল কিশোর কণ্ঠের মাতৃ সম্বোধন সন্তানহীনা রমণীর মনকে বাৎসল্যের স্নেহরসে সিঞ্চিত করে তুলল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কে?

—আমি আপনার ছেলে মা, আপনার স্কুলের ছাত্র।

—তা মাষ্টারমশায় তো এখন বাড়ি নেই বাবা!

—আমি আপনার কাছেই এসেছি মা!

—কেন বাবা?

জুতো চুরি ছাড়া রমেন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল তাঁকে।

—বেশ। আমি এখুনি ওনাকে খবর পাঠাচ্ছি তোমাদের ছেড়ে দেবার জন্য। মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী বললেন।

—ইচ্ছে করলে তা আপনি পাঠাতে পারেন মা। রমেন বলল —তবে আমি এখন আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে।

—কি কারণ বাবা?

—আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে মা। আপনি এক টিন মুড়ি, কিছু বাতাসা আর গোটা দুয়েক নারকেল দিন আমরা খাবো।

স্নেহশীলা পত্নী রমেনের আবেদন মঞ্জুর করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুড়ি, বাতাসা ও নারকেলের সঙ্গে কিছু সন্দেশও পাঠিয়ে দিলেন চাকরকে দিয়ে। বিজয় গৌরবে রমেন ফিরে এলো সহপাঠীদের কাছে। সমবেত উল্লাসে ক্লাশ-রুম মুখরিত হতে থাকে।

হেডমাস্টারমশাই বিস্মিত হলেন। 'ডিটেইন' করে রাখার পরেও ছেলেগুলো হুল্লোড় করছে। তিনি বেত হাতে নিয়ে আবার এলেন সেই ক্লাশে।

এসে তো চক্ষু স্থির। তার বাড়ির চাকর ছেলেদের খাবার পরিবেশন করছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেন সবিনয়ে বলে —স্যার, মা আমাদের খাবার পাঠিয়েছেন।

—মা! কোন মা?

—আমাদের মা, বাবু! মাষ্টারমশায়ের চাকর জবাব দেয়। বলে —বাবু! মা বলে দিয়েছেন, খাওয়া হয়ে গেলে এই ছেলেদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

মাষ্টারমশাই নিঃশব্দে বেরিয়ে যান ঘর থেকে

রমেন সহাস্যে বলে ওঠে—'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'।

ছেলেদের অট্টহাসিতে আবার চারদিক মুখরিত হয়।

আমরাও অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি।

দাদার গল্প শেষ হয়। কিন্তু তিনি থামতেই বিউটি বলে ওঠে, "আরেকটা গল্প বলুন না দাদু।"

"আরেকটা?" দাদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" বিউটি মাথা নাড়ায়। তার বেণী দুলে ওঠে।

"বেশ শোনো।" দাদা বলেন, "তবে এটাও রমেনেরই গল্প।"

"বেশ, বলুন।"

"গল্প হলেও সত্যি। ঘটনাটা ঘটেছে তার পরে।"

"কি ঘটেছে, তাই বলে ফেলুন না।" বিউটি ধৈর্যহীনা।

দাদা বলতে থাকেন—পর পর কয়েকদিন ভূগোল পড়া না পারায় ভূগোলের মাষ্টারমশাই রমেনের পাঁচ টাকা ফাইন করলেন। কাল দেব, পরশু নিয়ে আসব বলে রমেন মাস দুয়েক কাটিয়ে দিল। অবশেষে একদিন ক্ষেপে গিয়ে মাষ্টারমশায় বললেন—আজ টিফিনের পরে তুই যদি ফাইন না দিস, তাহলে আমি তোর নাম কেটে দেব।

—ঠিক আছে স্যার। আমি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসছি।

রমেন সুবোধ বালকের মতো বেরিয়ে গেল স্কুল থেকে। তবে সে তার নিজের বাড়িতে গেল না, গেল ভূগোলের মাষ্টারমশায়ের বাড়িতে।

তেমনি মা! মা! বলে ডাক দিতেই মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। রমেন তাকে প্রণাম করে বলল—মা! স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন, পাঁচটা টাকা দিতে বলেছেন আপনাকে।

—পাঁচ টাকা! কেন?

—আজ্ঞে উনি একটা পাঁঠা কিনেছেন।

—পাঁচ টাকায় পাঁঠা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব বড় পাঁঠা, প্রায় খাসির মতো। টাকাটা দিন। স্যার আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন।

—কিন্তু বাড়িতে এসেছো, একটু কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবে বাবা!

—বেশ তো, চারটি মোয়া দিন।

মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী যত্ন করে রমেনকে খাইয়ে তার হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তা পাঁঠা কখন নিয়ে আসবে বাবা?

—পাঁঠা? আমি নয়, মাষ্টারমশায়। তিনি পাঁঠা নিয়ে আসবেন।

স্কুলে ফিরে এসেই রমেন মাষ্টারমশায়ের হাতে সেই পাঁচ টাকার নোটখানি দিয়ে বলল—এই যে স্যার, আপনার ফাইন।

দুষ্টু ছেলেটাকে জব্দ করতে পেরেছেন ভেবে মাষ্টারমশাই খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তিনি টাকাটা স্কুলফাণ্ডে জমা করে দিলেন।

যথাসময়ে মাষ্টারমশাই বাড়ি ফিরলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তাঁরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে। তিনি বিস্মিত হলেন। বিয়ের পরে স্ত্রী তাঁর জন্য ঠিক এমনি দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু ছেলেপুলে হবার পরে তো সে প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে বহুদিন।

তাহলে বোধহয় কোন সুখবর আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে সে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? মাষ্টারমশাই তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

আর তাঁর স্ত্রী? তিনি ভাবছেন—মানুষটা খালি হাতে আসছে কেন? পাঁঠাটা কোথায় গেল?

মাষ্টারমশাই কাছে আসতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গা, পাঁঠাটা কোথায়?

—পাঁঠা! মাষ্টারমশাই আকাশ থেকে পড়েন।—পাঁঠা, কোন পাঁঠা?

—ঐ যে ছেলেটা এসে বলল—তুমি একটা পাঁঠা কিনেছো।

—পাঁঠা কিনেছি! কেন?

—তা তো জানি না। ছেলেটা এসে তো তাই বলে আমার কাছে থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেলো।

স্ত্রী স্বামীকে খুলে বললেন সব কথা।

মাষ্টারমশাই বুঝতে পারলেন, তিনি নিজেই নিজের ফাইন দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি রমেনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন—আমরা দুজনেই দুটি আস্ত পাঁঠা। দুষ্টু ছেলেটা তাই জানিয়ে দিয়ে গেছে আজ।

॥ বারো ॥

গল্প-গুজবে সময়টা কেটে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ট্রেন বড্ড আস্তে চলেছে। কেবলই দাঁড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই আমরা নির্দিষ্ট সময় থেকে ঘণ্টাদুয়েক পেছিয়ে পড়েছি। আর লেট না হলেও রাত আটটার আগে আমেদাবাদ পৌঁছতে পারছি না।

খাওয়া-দাওয়া করছি, হাসি-ঠাট্টা করছি, গল্প-গুজব করছি কিন্তু কখনওই ওদের কথা ভুলতে পারছি না—শ্রী ও মানসীর কথা।

কেন যে মানসীর একখানিও চিঠি পেলাম না, বুঝে উঠতে পারছি না। খুকুর বিয়ে ভেঙে গেলেও তো সেকথা তার আমাকে একবার জানানো উচিত ছিল। তাছাড়া এতে তার এমন অখণ্ড নীরবতা পালন করারই বা কি থাকতে পারে? খুকুকে সে মেয়ের মতো মানুষ করেছে! খুকু দেখতে সুশ্রী, স্কুল ফাইন্যাল পাশ। তার বিয়েতে মানসী টাকা-পয়সাও খরচ করবে। এ সম্বন্ধ ভেঙে গেলে কি আর পাত্র জুটবে না?

কিন্তু আমি এখন কি করি? যদি বৃন্দাবনে যেতে হয়, তাহলে আমেদাবাদ থেকেই যাওয়া ভাল। হাতে আর কয়েকঘণ্টা সময় আছে। এরই মধ্যে আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাছাড়া শ্রীরা না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার পক্ষে আমেদাবাদ ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাদের জন্যই আমাকে আজ আমেদাবাদে থেকে যেতে হবে।

সহযাত্রীদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভাবলে অবশ্য মনটা ভারী হয়ে উঠছে। হাওড়ায় গাড়িতে ওঠার আগে আমি এঁদের কাউকেই চিনতাম না। কিন্তু আজ এঁরা সবাই আমার আপনজন। গত তিন সপ্তাহের ওপর যাত্রাপথের সমস্ত সুখ-দুঃখ আনন্দ ও বেদনা, এঁদের সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছি। আজ এঁদের সবাইকে বিদায় দিয়ে আমাকে একা আমেদাবাদে থেকে যেতে হবে।

কিন্তু আমি যে নিরুপায়। আর এতে এত বিষণ্ণ বোধ করারই বা কি আছে? পথের পরিচয়কে যে পথেই শেষ করে দিতে হয়। পথ চলতে গিয়ে জীবনে তো এমন কতজনের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু কেবল মানসী ছাড়া আর সবাই যে হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

বিদায় যখন একদিন নিতেই হবে, তখন আজ নিতে আপত্তি কেন? বরং আজ যদি আমেদাবাদে থেকে যাই, তাহলে শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর খুবই উপকার হবে। কাল রাতে কিংবা পরশু সকালে ওদের বম্বের ট্রেনে তুলে দিয়ে আমিও নিশ্চিন্ত মনে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করতে পারি।

তাছাড়া আমেদাবাদে আমার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আছেন। কাল সারাদিন তাদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াবো। সময়টা ভালই কাটবে।

তবে কথাটা এখন গোপন রাখাই উচিত হবে। মা দাদা দিদি উমাদি কল্পনাদি সরকারদা সত্যেনদা ঠাকুরমারা ম্যানেজার বিউটি অমিয়বাবু সাহাবাবু ও সামন্তবাবুসহ সবাই আপত্তি করবেন। আমি যে এখন এঁদের সবার আত্মীয়—পরমাত্মীয়। স্বজন বিরহ সর্বদাই বেদনাদায়ক। কাজেই একেবারে শেষ সময়ে কথাটা বলতে হবে তাঁদের।

"খিড়্কি বন্ধ্ কিজীয়ে, শাট্-আপ দা উইন্ডোজ প্লীজ!"

তাকিয়ে দেখি একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। কালো কোট পরা জনৈক রেলকর্মচারী গাড়ির জানলা বন্ধ করে দিতে বলছেন। কিন্তু কেন?

ভদ্রলোক বলেন—আজ সারা গুজরাতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রেল চলেছে বলে কোথাও কোথাও দুষ্কৃতকারীরা পাথর ছুঁড়ে মারছে। দুপুরে এই স্টেশনে গোলমাল হয়েছে। আমেদাবাদে কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

আমরা যে সেই আমেদাবাদেই যাচ্ছি। যেতে পারব কি? অত্যন্ত মন্থর গতিতে গাড়ি চলেছে। ক্রমেই 'লেট' বাড়ছে।

ওদেরই বা কি হবে—ঐ, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর। ওদেরও তো আবু-রোড থেকে আমেদাবাদে আসতে হবে। পারবে কি? কে জানে সোমনাথজীর মনে কি আছে?

যথাসময়ে বৈকালীন চা ও জলখাবার এলো। বন্ধ গাড়ির ভেতরে বসে আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করছি। গাড়ির বাইরে বোধহয় সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে। বসুন্ধরা হয়ে উঠেছে মোহময়ী। কিন্তু সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ নেই। জানলা খোলা যাবে না—কারা নাকি পাথর ছুঁড়তে পারে।

ঠাকুরমারা কিন্তু মাঝে মাঝেই সে আদেশ অমান্য করছেন। তাঁরা জানলা ফাঁক করে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু রেললাইনের ধারে লোকজন দেখতে পেলেই তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিচ্ছেন। বলা

বাহুল্য এখন পর্যন্ত আমাদের গাড়িতে কোন ঢিল পড়ে নি।

গাড়ির ভেতরে আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ, এখন নিশ্চয়ই বাইরের জগতেও আঁধার নেমেছে। সে আঁধার শুধু আলোর স্বল্পতা নয়, সেই সঙ্গে অবিশ্বাস আর হিংসার আঁধার। দুর্নীতি আর উচ্ছৃঙ্খলতার আঁধার, লোভ মোহ কাম আর ক্রোধের আঁধার। লাভ-অলাভ, কার্য-কারণ, ন্যায় ও নীতির কথা চিন্তা না করে মানুষ মানুষকে মারছে। এ যেন মহাভারতের সেই মৌষলপর্ব, ভগবান নিজেই ভ্রাতৃহত্যার সামিল হয়েছেন।

"মা দিদিমা মাসিমা পিসীমা জ্যাঠা ও কাকারা! একটু বাদেই গাড়ি সবরমতী পুলের ওপরে উঠবে। পুল পেরিয়েই আমেদাবাদ।"

ম্যানেজারের কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। ম্যানেজার বলে চলেছে, "হাওড়া থেকে, আমরা যে ব্রড্‌গেজ স্পেশাল টুরিস্ট কোচ্‌-এ রওনা হয়েছিলাম, সেই কোচ্‌টি আগ্রাফোর্ট থেকে সোজা আমেদাবাদে চলে এসেছে। কাজেই এখানে আমরা এই মিটারগেজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেই ব্রডগেজ গাড়ির সওয়ার হব। আপনারা জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিজেদের বার্থের ওপরে রেখে দিন, আমরা সব নতুন গাড়িতে তুলে দেব। আরেকটা কথা······"

ম্যানেজার একবার থামে। তারপরে গলার স্বর আরও কোমল করে বলে, "একটা রাত একটু কষ্ট করতে হবে আপনাদের···।"

শেষ করে না ম্যানেজার। আমরা তার মুখের দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "আজ রাতে আমি আপনাদের ভাত খাওয়াতে পারব না। আমেদাবাদে কার্ফু চলেছে। কাজেই স্টেশনের বাইরে গিয়ে বাজার করা সম্ভব নয়। আজ তাই লুচি বেগুনভাজা ও মিষ্টি খাওয়াবো।"

"মিষ্টি কোথায় পাবে ম্যানেজার, আমেদাবাদে যে কার্ফু চলেছে?" দাদা প্রশ্ন করেন।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "আজ্ঞে। ঢোলা থেকে নিয়ে এসেছি।"

"সাবাস ম্যানেজার, সাবাস!"

নির্দিষ্ট সময়ের তিনঘণ্টা পরে, তার মানে রাত ন'টার সময় আমরা আমেদাবাদ পৌঁছলাম। প্লাটফর্মে পা রাখতেই আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। যাঁদের সঙ্গে এইমাত্র এখানে এলাম, কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের সবাইকে আমার বিদায় জানাতে হবে। ওঁরা চলে যাবেন ডাকোরের পথে, আমি থাকব এখানে। চলে যাবো বৃন্দাবন।

কথাটা এখনও বলি নি কাউকে। বলতে হবে একটু বাদেই। কিন্তু তার আগে একবার স্টেশনমাষ্টারের অফিসে গিয়ে চিঠিপত্র দেখা দরকার, যাওয়া দরকার ফার্স্ট'ক্লাস ওয়েটিং রুমে। দেখতে হবে মানসীর কোনো চিঠি আছে কিনা আর শঙ্করীরা এসে পৌঁচেছে কিনা ?

দুটোরই সম্ভাবনা কম। তাহলেও যেতে হবে।

মাসিমা করুণকণ্ঠে আবার বলেন, "একবার গিয়ে দেখে এসো বাবা, ওরা এসেছে কিনা ?"

তাঁর ব্যাকুলতা খুবই স্বাভাবিক। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই তিনি সেদিন দুটি যুবতী মেয়ে ও একটি অবুঝ নাতনীকে ফেলে দ্বারকার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। এতদিন মনের আকুলতা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু আজ আর স্থির থাকতে পারছেন না।

তাকে আশ্বস্ত করে সাহাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিন্তু এগোবার কি উপায় আছে! সারা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। শহরে কার্ফু। কার্ফু পাশ দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আগন্তুকই রাতখানা স্টেশনে কাটাতে মনস্থ করেছেন। যে যেখানে পেরেছেন, বিছানা বিছিয়েছেন।

ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে এগিয়ে চলি। ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের প্রধান অংশে আসি। সামনেই স্টেশন-মাষ্টারের অফিস। তাঁর 'কেয়ার'-এ আসা যাত্রীদের চিঠিপত্রের বাস্কেট পড়ে আছে একপাশে। আমরা দুজনে চিঠি খুঁজতে শুরু কার।

পেয়ে যাই। একখানি ইনল্যাণ্ড লেটার পেয়ে যাই আমি। হ্যাঁ, মানসী! আমার মানসীর চিঠি। কি খবর কে জানে? কম্পিত হাতে কোনমতে খুলে ফেলি চিঠিটা। মানসী লিখেছে—

বৃন্দাবন।

সখা,

রাজভূমি-রাজস্থান ও মন-দ্বারকা দর্শন করে তুমি এখন পুণ্যতীর্থ প্রভাসের পথে যাত্রা করেছো। আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন তোমার প্রভাস পরিক্রমাও পূর্ণ হয়েছে।

আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় এবারে তোমার শরীর সুস্থ আছে জেনে শান্তিতে দিন কাটাতে পারছি।

তুমি আমার চিঠি না পেয়ে বোধকরি অশান্ত হয়ে পড়েছো। হও গে। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যই আমি তোমাকে চিঠি দিই নি এতদিন। কেমন শাস্তি! এবারে তো বুঝতে পারলে চিঠি না পেলে মনের অবস্থাটা কি রকম হয়? আশাকরি কথাটা চিরকাল মনে থাকবে এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত চিঠি লিখবে।

তোমার অসুবিধে হবে ভেবে শেষ পর্যন্ত ৫ই বৈশাখ খুকুর বিয়ের দিন ঠিক করলাম। ফাল্গুনে বিয়ে হলে যে তোমাকে ডাকোর, নাসিক ও অজন্তা-ইলোরা না দেখেই বৃন্দাবন চলে আসতে হয়। সেটা আমার কাছে বড়ই দুঃখের হবে।

তার চেয়ে এই ভাল হল। সব দেখে শুনে তুমি সহযাত্রীদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাও। ২রা রওনা হয়ে ৩রা বৈশাখ বৃন্দাবনে এসো। দেখো, আবার সংক্রান্তি কিংবা নববর্ষে রওনা হয়ো না যেন!

কিন্তু খুকুর বিয়ের পরে তোমাকে এবারে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে বৃন্দাবনে। তুমি তো জানো, খুকু চলে যাবার পরে বাড়িতে আমি একেবারেই একা হয়ে যাবো। তুমি

ছাড়া আর কে আমার সেই নিঃসঙ্গ জীবনের অবসাদ ঘোচাতে পারে সখা ?

সাবধানে থেকো। চিঠি লিখো। প্রণাম নিও।

তোমার মানসী

"চলুন, ঘোষদা !"

সাহাবাবুর ডাকে আমার চমক ভাঙে। নিজের স্বার্থপরতার জন্য লজ্জা পাই। মানসীর চিঠি পেয়ে আমি শ্রীর কথা একেবারে ভুলে বসে আছি। অথচ আমারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শ্রী অমন অসুস্থ হয়ে পড়ল। পূর্ণিমা ও শঙ্করীর দ্বারকা ও প্রভাস দর্শন হল না।

মানসীর চিঠিটা পকেটে রেখে সাহাবাবুর সঙ্গে এগিয়ে চলি। মনে মনে বলি--রণছোড়জী, সোমনাথজী ! তোমাদের অশেষ করুণা। আমি মানসীর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো ইচ্ছে করলে আমার শ্রীকেও আজ দিতে পারো ফিরিয়ে। তোমরা তাকে এনে দাও প্রভু !

"এইতো ওয়েটিং রুম। এখানেই ওদের থাকার কথা।"

তাকিয়ে দেখি, সাহাবাবু ঠিকই বলেছেন। সামনেই 'ফাস্ট ক্লাশ লেডিজ ওয়েটিং রুম'। ওরা যদি এসে থাকে, এখানেই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলি। মেয়েদের বিশ্রামালয় জেনেও একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ি। বিশ্রামরত মহিলারা সবাই বিরক্তভাবে আমাদের দিকে তাকান।

না। নেই। ওরা কেউ নেই এখানে। নেই ওদের মালপত্র। নেই শঙ্করী পূর্ণিমা ও অহীন। নেই শ্রী। সে আসে নি আমেদাবাদ। কেন আসবে ? তাদের যে আগামীকাল আসতে বলা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি বাইরে। কিন্তু তারপরে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ি। এবারে কোথায় যাবো ? কেমন করে মুখ দেখাবো মাসিমার কাছে। তিনি যে ওদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন। ফিরে গিয়ে কি বলব তাঁকে ?

সাহাবাবুর মুখখানিও শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁরও চোখ দুটি অশ্রু-সিক্ত। করুণকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, "কি হবে ঘোষদা! ওরা যে আসে নি এখানে।"

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার। আমি চুপ করে থাকি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার সেই সাতবছরের ভাগনীর রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি। কানে আসে সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—মামু, তুমি দিদিমাকে নিয়ে দ্বারকা ও প্রভাসে যাও। দেখে এসো রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। আমি তো তাঁদের কাছে যেতে পারছি না। তুমি না গেলে, কে ফিরে এসে আমাকে তাদের গল্প বলবে?

ওর কথামত আমি দর্শন করে এসেছি রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। কিন্তু আজ কার কাছে আমি তাঁদের গল্প বলব?

"আমার স্ত্রী ও শাশুড়ীকে এখন আমি কি কৈফিয়ৎ দিই? ভগবান না করুন, ওদের যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে থাকে, তাহলে আমি শ্রীর বাবাকেই বা কি বলব? আমিই যে তাকে বলে শ্রীকে নিয়ে এসেছিলাম।" সাহাবাবুর স্বরে অনুতাপ।

অতিকষ্টে খানিকটা সামলে নিই নিজেকে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলি, "আগে সে খবরটাই নেওয়া দরকার আবু-রোড থেকে—ওরা কেমন আছে, কোথায় আছে?"

"তাহলে তো ম্যানেজারবাবুর কাছে একবার যাওয়া দরকার। তিনি যদি রেলওয়ে কণ্টেলের মারফত খবরটা নিতে পারেন।"

"তার আগে চলুন, জেণ্ট্‌স ওয়েটিং রুমটাও দেখে নিই।"

"কোন লাভ হবে কি?"

"হয়তো হবে না। তাহলেও চলুন, একবার দেখা যাক্‌।"

"বেশ চলুন।"

লেডিজ ওয়েটিং-রুমের পাশেই 'ফার্স্ট ক্লাশ জেণ্ট্‌স ওয়েটিং-রুম'। একই ভাবে দরজা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ি। আর ঠিক তখুনি—

"মামু!"

"কে?"

"আমি। আমরা। মা, মাসি, অহীনদা। মামু এসেছে, মেসো এসেছে।"

সেই উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধ-মধুর স্বর। কতদিন পরে শুনছি।

এসেছে, আমার শ্রী ফিরে এসেছে।

সাহাবাবুও একই কথা বলেন, "ঘোষদা। ওরা এসে গেছে।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাথা নাড়ি।

শঙ্করী, পূর্ণিমা ও অহীন উঠে দাঁড়ায়।

শঙ্করী বলে, "ঘোষদা, বসুন। বসুন জামাইবাবু।"

"আপনারাও তাহলে আজই এসে গিয়েছেন। ভালই হল।" পূর্ণিমার স্বরে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দ।

শঙ্করী বলে, "ভাগ্যিস বিমলদা ও সরোজদা আজই পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। বললেন—শ্রী যখন ভাল হয়ে গিয়েছে, তোমরা একদিন আগেই আমেদাবাদে চলে যাও। বড় জায়গা, ভালই লাগবে।"

"সত্যই ঘোষদা।" অহীন যোগ করে, "বিমলবাবু ও সরোজ-বাবুর তুলনা হয় না। কোন অচেনা মানুষ যে কারও জন্য এতখানি করতে পারে, এর আগে জানা ছিল না আমার।"

কিন্তু বিমলবাবু ও সরোজবাবুর উদারতার কথা পরে শোনা যাবে। শঙ্করী পূর্ণিমা ও অহীনের খবর নেবার সময়ও এখন নয়।

আমি এগিয়ে চলি শ্রীর কাছে। সে-ও ইতিমধ্যে সোফা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি নিচু হয়ে হাত দুটি বাড়িয়ে দিই। সে ছুটে এসে ধরা দেয় আমাকে। আমি তাকে কোলে তুলে নিই।

ছোট হাত-দুখানি দিয়ে শ্রী আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমার কাঁধে মাথা রাখে। আদুরে স্বরে বলে, "মামু! আমি তোমার সঙ্গে ডাকোর, বম্বে···আর যেন কোথায় যাবো আমরা?"

মুচকি হেসে উত্তর দিই, "নাসিক, অজন্তা-ইলোরা।"

"হ্যাঁ, নাসিক, অজন্তা আর ইলোরা যাবো আমরা। যেতে যেতে দ্বারকা ও প্রভাসের গল্প শুনব। বলবে না মামু?" শ্রী মাথা তোলে।

সে আমার মুখের দিকে তাকায়।

"বলব বৈকি মা! আমি তোমাকে অনেক গল্প বলব।"

"ইস! কি মজাই হবে তাহলে!" শ্রী আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপরেই সে আমার বুকে মুখ লুকোয়।

মনে মনে বলি—ঠাকুর। পুণ্যতীর্থ-প্রভাস পরিক্রমার পুণ্যফল আমি হাতে হাতে পেয়ে গেলাম। অসুস্থ শ্রীকে সুস্থ করে তুমি ফিরিয়ে দিলে আমাকে। হে মানুষের ভগবান, হে করুণাময় কৃষ্ণ! তুমি আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো—

'শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥...'

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

প্রভাসের প্রধান দর্শনীয় স্থান

১। **ভালকাতীর্থ**--ভেরাভল আর প্রভাস-পাটনের মধ্যপথে অবস্থিত। কথিত আছে জরা ব্যাধ এখানেই শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করেছিলেন।

২। **শশীভূষণ-মহাদেবের মন্দির**—ভেরাভল ও প্রভাসের মাঝে সাগরতীরে অবস্থিত। কথিত আছে চন্দ্র নাকি এখানেই তপস্যা করে আংশিক ক্ষয়মুক্ত হয়েছেন।

৩। **ত্রিবেণী-সঙ্গম**—হিরণা, কপিলা ও সরস্বতীর সঙ্গম। মিলিতধারা আরব সাগরে পড়েছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ। এখানে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। কাছেই মহাকালিকা মন্দির।

৪। **সূর্য-নারায়ণ মন্দির**-ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছে অবস্থিত। পাশে শ্রীনারদামঠ।

৫। **গীতা মন্দির**—ত্রিবেণী সঙ্গমের অনতিদূরে সোমনাথ ট্রাস্ট-এর নবনির্মিত মন্দির। মন্দিরগাত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা লিখিত। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মূর্তি মন্দিরের মূল-বিগ্রহ। পাশে বলরামের গুহা।

৬। **দেহোৎসর্গ**—গীতা মন্দিরের কাছে অবস্থিত। কথিত আছে অর্জুন এখানেই কৃষ্ণ ও বলরামের মরদেহ সৎকার করেছিলেন। পাশেই হিরণ্যনদী।

৭। **শ্রীবল্লভাচার্যের বৈঠক**—দেহোৎসর্গের কাছে অবস্থিত। কথিত আছে শ্রীবল্লভাচার্য প্রভাস পরিক্রমার সময়ে এখানে বাস করেছেন। পাশে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

৮। **রুদ্রেশ্বর-মহাদেবের মন্দির**-ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে সোমনাথ মন্দিরে যাবার পথে অবস্থিত।

৯। **দৈত্যসূদন-মহাবিষ্ণু মন্দির**—প্রভাসের প্রধান বাজারে অবস্থিত। গুপ্তযুগের (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) মন্দির। মুসলমান আমলে বার বার বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ধর্মান্ধ শাসকরা দুটি প্রাচীন বিগ্রহকে ধ্বংস করতে পারে নি। এই বিগ্রহ দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের অবশ্য দর্শনীয়। বর্তমান মূল-বিগ্রহটি গত শতাব্দীতে নির্মিত।

১০। **গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ**—সোমনাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত প্রভাসের প্রধান জৈনমন্দির।

১১। রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত সোমনাথের মন্দির।

১২। সোমনাথের নতুন মন্দির।

ছোট ও বড় মিলিয়ে প্রভাসে প্রায় শ'খানেক দর্শন আছে। ভেরাভল থেকে টাঙ্গা নিয়ে দর্শন করতে হয়। সব দেখতে হলে অন্তত দু'টি রাত থাকতে হয়। নিচের যেকোন আশ্রয়ে রাত্রিবাস করা যায়—

১। **রেলওয়ে রিয়াটারিং রুম**—ভেরাভল

২। **শ্রীরামনিবাস ধর্মশালা**—ভেরাভল। রেলস্টেশনের কাছে শেঠ বনমালী বীরজী নির্মিত মনোরম বিশ্রামগৃহ তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের রাত্রিবাসের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

৩। **রাজেন্দ্র ভবন**—ভেরাভল। নির্মাণ বিভাগের ধর্মশালা। ডেপুটি ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডাবুল. ডি., ভেরাভল- এই ঠিকানায় আগে চিঠি লিখে ঘর ঠিক করতে হয়। খাবার কিনতে পাওয়া যায়।

৪। **শ্রীভাটিয়া ধর্মশালা**—প্রভাস-পাটন।

৫। **শ্রীসিংঘানিয়া ধর্মশালা**— প্রভাস-পাটন।

৬। **গোবর্ধন ভবন (ধর্মশালা)** প্রভাস-পাটন।

৭। **বিশ্রাম ভবন**—নতুন সোমনাথ মন্দির। সোমনাথ মন্দিরের এস্টেট ম্যানেজারকে আগে চিঠি লিখলে তিনি ঘর রেখে দেন। সঙ্গে মহিলা-মণ্ডলের ক্যান্টিন রয়েছে। সেখানে সবরকম খাবার পাওয়া যায়।

যাত্রাকাল—অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি—

লেখক	গ্রন্থ
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণচরিত্র
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	বীরাঙ্গনা কাব্য
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কর্ণ-কুন্তী সংবাদ
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ (অনুবাদক)	মহাভারত
,, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনুবাদক)	মহাভারতম্
,, রাজশেখর বসু (অনুবাদ)	মহাভারত
,, দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদক)	কাশীদাসী মহাভারত
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বকোষ
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃত্রসংহার কাব্য
,, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (অনুবাদক	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ)
,, স্বামী দিব্যাত্মানন্দ	পুণ্যতীর্থ-ভারত
,, ,, ধ্রুবানন্দ গিরি	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
,, বিমানবিহারী মজুমদার	চণ্ডীদাসের পদাবলী
,, সুনীলকুমার ঘোষ	রাজা গেল রাজা গেল
,, অনাথনাথ বসু	মীরাবাঈ
,, কল্যাণরায় জোশী	দ্বারকা-অসইনা পুরাণা অবশেষো (গুজরাতী)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (প্রকাশক)	ভারতকোষ
Shree N. L. Dey	The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India
,, B. C. Law	Holy places of India
,, J. H. Dave	Immortal India, vols. II & IV
,, E. W. Hopkins	The Great Epic of India
,, ,,	Epic Mythology
,, R. C. Majumdar & Ors	Advanced History of India
,, S. H. Desai	Probhas & Somnath
,,	Junagdh & Girnar
,, D. Chatterjee	Handbook of India